৩

১ গবেষণা পত্র
২ ইতিহাস
৩ রাজনীতি
৪ চুক্তি ও ভূমি সমস্যা
৫ শান্তি সূত্র
৬ প্রতিবেদন গুচ্ছ
৭ অনুসন্ধান
৮ নির্বাচিত রচনাবলী
৯ তথ্য উপাদান
১০ রচনা সমগ্র

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক

বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক

মরহুম আতিকূর রহমান

লিখিত 'পার্বত্য তথ্যকোষ'

০১ সেট বই তাঁর ছেলে

ফয়জুর রহমান ফয়েজ এর

পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ।

প্রয়োজনে মোঃ ০১৬১২-২৮০৮০২

পার্বত্য তথ্য কোষ -৩

রাজনীতি

আতিকুর রহমান

নিবন্ধন পত্র

বই ঃ পার্বত্য তথ্য কোষ ১-১০

লেখক ঃ আতিকুর রহমান

প্রকাশক ঃ পর্বত প্রকাশনী
৪৮ সাধার পাড়া, উপশহর সিলেট

প্রকাশ কাল ঃ নভেম্বর ২০০৭ ইং

কম্পোজ ঃ বাবুল কম্পিউটার/ইমন কম্পিউটার ও সোলেমান খাঁ
২৬২/ক ২৬২ বাগিচা বাড়ী ফকিরাপুল ঢাকা-১০০০।

পেষ্টিং ঃ আবু তাহের ঐ

মুদ্রাকর ঃ বি.এস.প্রিন্টিং প্রেস ২ আর কে. মিশন রোড মতিঝিল
ঃ মোতালেব ম্যানসন ঢাকা-১২০৩।

প্রচ্ছদ ঃ শিল্পী আরিফুর রহমান ১৩১ ডিআইটি রোড ঢাকা।

পরিবেশক ঃ ১ রাঙ্গামাটি প্রকাশনী রিজার্ভ বাজার রাঙ্গামাটি
২. মল্লিক বই বিতান ঐ

সহযোগী প্রতিষ্ঠান ঃ বাংলাদেশ রিসার্চ ফোরাম
৫/১৮, নূরজাহান রোড
মোহাম্মদপুর ঢাকা।

মূল্য ঃ খণ্ড-১, ৩ ও ৯ টাকা ১৩০/- খণ্ড-১০ টাকা ৫০০/-
অন্যান্য খণ্ড - টাকা ১০০/-

যোগাযোগ ঃ আতিকুর রহমান মোবাইল ঃ ০১১৯৬১২৭২৪৮

সূচীপত্র ঃ

ভূমিকা

পার্বত্য জনসংহতি সমিতির নেতারা অবশ্যই যুদ্ধাপরাধী দেশদ্রোহী ও গণহত্যার হোতা। পাহাড়ী বাঙ্গালী হাজার হাজার নিরীহ নিরপরাধ লোককে তারা হতাহত উচ্ছেদ ও নিঃসম্বল করেছে। বাংলাদেশের ৯৯% অধিবাসী বাঙ্গালীরা এদেশের স্থায়ী ও আদি অধিবাসী। পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত। এই ইতিহাসের বিরুদ্ধে জনসংহতি সমিতির নেতারা বাঙ্গালীদের পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহিস্কার দাবী করে, যা জঘন্য অপরাধ। গণহত্যা মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশদ্রোহ, আর বাঙ্গালী বিতাড়ন দাবী অমার্জনীয় ধৃষ্টতা। এটা বিনা বিচার ও শাস্তিতে পার পেতে পারে না। হিলট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধারা নম্বর ৫২ তাদেরকে বহিরাগত অভিবাসী রূপে চিহ্নিত করেছে। বৃটিশের ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে অনুমোদিত সাধারণ নির্বাচনে ভারতব্যাপী ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। সে অনুযায়ী ১৯৩৬ ও ১৯৪৬ সালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে প্রদেশ ও কেন্দ্রে সরকার গঠিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা ছিল সে সময় ভোটাধিকার বঞ্চিত। ভোটাধিকার বঞ্চিত উপজাতীয়রা তখন তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি উত্থাপন করেনি। তাতে স্বাভাবিক ভাবেই ভাবা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়রা তখন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী বাসিন্দারূপে গণ্য ছিলো না; তাই তাদের ভোটাধিকার হীন রাখা ছিল যথার্থ। এই মূল্যায়নটিকে মৌলিক ও যথার্থ ভাবা যায়, যা এখনো প্রয়োগ ও প্রবর্তন যোগ্য। তবে পাকিস্তান আমলের ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে এই মূল্যায়নটির ব্যতিক্রম করে পার্বত্য উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দান করা হয়, যা যথার্থ ছিল না যা এখন প্রত্যাহার যোগ্য। এখন পাকিস্তান আমলের ভোটাধিকার দানকে অব্যাহত রেখে উপজাতীয়দের রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি করা একটি ভুল; এখন এর সংশোধন করা আবশ্যক। এই ভুলেরই প্রতিফল হলো আঞ্চলিক ও জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের দাবীতে জনসংহতি সমিতির বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, পার্বত্য অঞ্চলে বাঙ্গালীদের অধিকারকে অস্বীকার, পর্বতাঞ্চলে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা ইত্যাদি।

বিদ্রোহী উপজাতীয়দের ভোটাধিকার দানের ভুলকে উদারতা ভাবা হলেও, তাতে কোন সুফল ফলেনি। এটি হয়েছে বাংলাদেশের পক্ষে আত্মহননের শামিল।

উপজাতীয় দুস্কৃতিকারীদের অপরাধ বোধ না হওয়া এবং জাতি ও দেশের কাছে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা, দূর্ভাগ্যজনক। সেদিন অবশ্যই আসন্ন, যেদিন উপজাতীয়রা নিজেদের দুষ্কর্মের জন্য বৈরী ঘোষিত ও বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং শাস্তি পাবে। জাতি ও দেশের পক্ষে সে সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ এখন সময়ের ব্যাপার মাত্র।

আতিকুর রহমান
ডিএসবি কলোনী, রাঙ্গামাটি
লেখক, গবেষক ও কলামিষ্ট।

পার্বত্য তথ্য কোষ

খন্ড-৩ রাজনীতি

১। উপজাতীয় দাবী দাওয়া।

সরল সহজ অনুমান হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতিরা নিরিহ নির্যাতিত সংখ্যা লঘু। বাস্তবে ও তারা রং গঠন, সংস্কার, সংস্কৃতি, অভ্যাস ও আচরণে বাঙ্গালীদের বিপরীতে ভিন্ন এক সমাজ। আগে তারা শোষণ ও দুঃশাসন ভোগ করেছে। কিছু সংখ্যক হিন্দু ও পাহাড়ী মহাজন, অভাবে অনটনে বন্ধকের মাধ্যমে তাদের কড়া সুদে ঋণ দিতো, এবং তার বিনিময়ে হাতিয়ে নিতো টাকা কড়ি জমি জিরাত, ফল ফসল, পশু পাখী, সোনা দানা, গৃহস্থালী আসবাব, এমন কি সুদে আসলে ঋণ শোধ না হওয়া পর্যন্ত, পরিবারের কর্মঠ মেয়ে পুরুষের যে কেউ মহাজনের বাড়ী জিম্মি থেকে বেগার খাটতো। কিন্তু দোষ চেপেছে দুম্বএক ভুলা নাথের জন্য গোটা বাঙ্গালী জাতের উপর। ধর্মীয় কড়াকড়ির কারণে বাঙ্গালী মুসলমানদের কাউকে এ ব্যবসায় পাওয়া দুষ্কর। সরকারী দুঃশাসন আর সামাজিক প্রথা ঐতিহ্যের কড়াকড়িতে ও বাঙ্গালীরা,এ কাজটিতে জড়িত থাকে না। তখন শাসন ছিলো বিদেশী ঔপনিবেশিক, আর প্রথা ঐতিহ্য ছিলো উপজাতীয় সমাজ পতিদের আরোপিত। কিন্তু ঐ সুধখোরেরা কোন দিনই ক্ষোভ অসন্তোষের শিকার হোন নি। সেই প্রাচীন দুঃশাসন শোষণ ও পশ্চাদ পদতার দায় চেপেছে নন্দঘোষ বাঙ্গালী ও বাংলাদেশের উপর। দ্রুত এবং পর্যাপ্ত প্রতিকারের দ্বারা ও তা থেকে পার পাওয়া যাচ্ছে না। শুধু অহিংস দাবীতে উপজাতিরা সীশাবদ্ধ নেই, সহিংস সশস্ত্র খুনাখুনিতে বাঙ্গালী ও বাংলাদেশকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। তবু বাঙ্গালী ও বাংলাদেশ ধৈর্য্য সহকারে উপজাতিদের সন্তুষ্টি বিধানে সচেষ্ট আছে। হিংসা হানাহানিও বাধা বিপত্তি না ঘটলে, বাংলাদেশ আমলের এই স্বল্প সময়ে, এতদাঞ্চলে আরো বিস্ময়কর উন্নতি হতো, যা এখনই অবশিষ্ট বাংলাদেশকে ডিঙ্গিয়ে গেছে। লেখা-পড়া চাকুরী, প্রশিক্ষণ, রোজি রোজগার, চিকিৎসা, যোগাযোগ, নির্মাণ ও দারিদ্র্য মোচনের ক্ষেত্রে, এতদাঞ্চল এখনই সারা দেশকে পিছনে ফেলে দিয়েছে। বলা হয়ে থাকে, দাবী দাওয়া উত্থিত ও আন্দোলন না হলে এমনটি হতো না, এবং সশস্ত্র কার্যক্রম উন্নয়নের ধারাকে গতিশীল করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু এটি এক পেশে মূল্যায়ন। তবে দাবী ও আন্দোলনের স্বার্থকতাও আছে। এখানে তারই বিকাশধারা আলোচিত হলো, যথা ঃ

ক) এম এন লারমা কৃত দাবী দাওয়া তাং ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২ ইং

নিম্নোক্ত দাবীগুলো প্রথম পেশ করেন ঃ

"১। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, এবং তার একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।'

২। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৩। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।"

এই দাবী গুলো পেশের সাথে সাথে সংগঠিত হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন শান্তি বাহিনী। তৎপরই সহিংস ও বিদ্রোহাত্মক ঘটনাবলীর শুরু।

খ) জনাব জিয়াউর রহমানকে প্রদত্ত স্মারক লিপি তাং-১৯-১২-৭৫ইং।

১। "আমার মাতৃস্তন্য কাহাকেও ধরিতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।ঃ

২। বেআইন বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারীদের স্রোতধারা অবিলম্বেও নিশ্চিত রূপে বন্ধ করিতে হইবে।ঃ

৩। "উপযুক্ত তদন্ত পূর্বক এ যাবৎকাল পর্যন্ত বেআইনীভাবে বন্দোবস্তিকৃত, হস্তান্তরিত এবং দখলিকৃত জমি হইতে বহিরাগতগণকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।ঃ

৪। "চির প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি প্রশাসন সম্বন্ধীয় বিধি এবং উপবিধি সমূহ কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।ঃ

গ) অতিরিক্ত দাবী ঃ

১) " উপজাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাসনকার্যে জেলা প্রশাসককে সাহায্য ও উপদেশ দানের জন্য উপজাতীয় জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগ করা হউক।ঃ

২) 'বর্তমান পুলিশ প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া, বর্তমান পুলিশ বাহিনীর স্থলে, পূর্বতন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুরিশ বাহিনীর অনুরূপ প্রধানতঃ এই জেলার উপজাতীয় লোকগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হউক।ঃ

ঘ) মূল/পাঁচ দফা দাবীনামা ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৮৭

"১। পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রাদেশিক মর্যাদা প্রদান করা।

২। নিজস্ব আইন পরিষদ সম্বলিত প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

৩। প্রাদেশিক আইন পরিষদ নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গতি হইবে। এবং প্রদেশ তালিকাভুক্ত বিষয়ে এই প্রাদেশিক আইন পরিষদ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নের অধিকারী হইবে।

৪। ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ পরবর্তী বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করা।

৫। দেশ রক্ষা বৈদেশিক সম্পর্ক মুদ্রা ও ভারি শিল্প ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন, পুলিশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বনজ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, মৎস্য, অর্থ, পশু পালন, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্ষুদ্র শিল্প, বেতার ও টেলিভিশন, রাস্তা-ঘাট, যোগাযোগ ও পরিবহন ডাক, কর ও খাজনা জমি ক্রয় বিক্রয় ও বন্দোবস্তি, আইন-শৃঙ্খলা বিচার, খনিজ তৈল ও গ্যাস, সংস্কৃতি, পর্যটন স্থানীয় শাসন, সমবায়, সংবাদপত্র, পুস্তক ও প্রেস, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ, সীমান্ত রক্ষা, সামাজিক প্রথাও অভ্যাস উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সহ পার্বত্য চট্টগ্রামের অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রাদেশিক সরকারকে প্রত্যক্ষ পশাসন ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদান করা।ঃ

ঙ) সংশোধিত দাবী নামা ১৯৯২

"দাবী নং ১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া ঃ

(ক) পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রদান করা।

(খ) আঞ্চলিক পরিষদ(Regional Council) সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

(গ) এই আঞ্চলিক পরিষদ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত হইবে এবং ইহার একটি কার্যনির্বাহী কাউন্সিল থাকিবে।

(ঘ) আঞ্চলিক পরিষদে অর্পিত বিষয়াদির উপর এই পরিষদ সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে বিধি, প্রবিধান, উপবিধি, আদেশ নোটিশ প্রণয়ন, জারি ও কার্যকর করিবার ক্ষমতার অধিকারী হইবে।

(ঙ)................

(চ) আঞ্চলিক পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী হইবে-(১) পার্বত্য চট্টগ্রামের সাধারণ প্রশাসন ও আইন শৃঙ্খলা , (২) জেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ, ইম্প্রভমেন্ট ট্রাষ্ট ও অন্যান্য স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান সমূহ, (৩) পুলিশ, (৪) ভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৫) কৃষি ও উদ্যান উন্নয়ন, (৬) কলেজ,মাধ্যমিক ও প্রাথমিক শিক্ষা, (৭) বন, বন সম্পদ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, (৮) গণ স্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, (৯) আইন ও বিচার (১০) পশু পালন ও বন্য প্রাণী সংরক্ষণ, (১১) ভূমি ক্রয়, বিক্রয় ও বন্দোবস্ত, (১২) ব্যবসা-বাণিজ (১৩) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,

(১৪) রাস্তাঘাট ও যাতায়াত ব্যবস্থা, (১৫) পর্যটন, (১৬) মৎস্য, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ, (১৭) যোগাযোগ ও পরিবহন, (১৮) ভূমি রাজস্ব, আবগারী শুল্ক ও অন্যান্য কর ধার্যকরণ (১৯), পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ (২০) হাটবাজার ও মেলা, (২১) সমবায়, (২২) সমাজ কল্যাণ, (২৩) অর্থ , (২৪) সংস্কৃতি, তথ্য ও পরিসংখ্যান, (২৫) যুব কল্যাণ ও ক্রীড়া (২৬) সরাইখানা, ডাকবাংলা, বিশ্রামাগার, খেলার মাঠ ইত্যাদি (২৭) মদ চোলাই, উৎপাদন, ক্রয় বিক্রয় ও সরবরাহ, (৩৮) গোরস্থান ও শ্মাশান, (২৯) দাতব্য প্রতিষ্ঠান আশ্রম, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও উপাসনাগার, (৩০) জল সম্পদ ও সেচ ব্যবস্থা, (৩১) জুম চাষ ও জুম চাষীদের (জুমিয়া) পুনর্বাসন (৩২) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়ন (৩৩) কারাগার, (৩৪) পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত অন্যান্য কম গুরুত্বপুর্ণ বিষয়।'

চ) আন্দোলনের বিপরীতে সরকারী পদক্ষেপ ঃ

প্রথম প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগ সরকার, উপজাতীয় সশস্ত্র আন্দোলনে শংকিত হয়ে, দীঘিনালা ও রুমায় দুটি সেনা নিবাস প্রতিষ্ঠার দ্বারা এতদাঞ্চলের প্রতিরক্ষাকে জোরদার করার পদক্ষেপ নেন, এবং দলীয়ভাবে বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকে উৎসাহিত করেন। সাথে সাথে সাধারণ উপজাতীয় লোকদের সন্তুষ্টি ও কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে, অনেককে দলীয় নেতৃত্বে বরণ করা হয়, এবং ব্যাপক শিক্ষা সুযোগ ও উচ্চ শিক্ষায় বিশেষ কোটা প্রবর্তন করা হয়। কর্মসংস্থান ও পদোন্নতির সুযোগ ও অনেকে পান। রাজা ত্রিদিবরায়ের পাকিস্তান প্রীতির কারণে, চাকমা রাজ পরিবারের সরকারী আনুকূল্য লাভ স্থগিত থাকার বিষয়টিও ত্রিদিব রায়ের ব্যক্তিগত দেশদ্রোহিতার দায় থেকে মুক্ত করে দেয়া হয়।

জিয়া সরকার উপজাতীয় আন্দোলন ও অস্ত্রবাজিকে পরিপূর্ণ বিদ্রোহ জ্ঞান করে, তার প্রতিকারে অধিক তৎপর হোন। বৃদ্ধি করা হয় সেনা সমাবেশ ও সেনা ছাউনী। পুলিশ বিডিআর আনসার ও ভিডিপির শক্তি বৃদ্ধি করা হয়। এই সাথে স্বপক্ষীয় জনশক্তি বাঙ্গালীদের সংখ্যা বৃদ্ধির পক্ষে সরকারীভাবে ভূমিহীন পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় বসতি স্থাপনের কর্মকান্ড শুরু করা হয়। উপজাতীয়দের সংখ্যালঘু করণের দ্বারা স্থায়ীভাবে বিদ্রোহ দমানোর কর্মকান্ডের পাশাপাশি, উপজাতীয়দের প্রকৃত অভাব অভিযোগ ও পশ্চাদপদতা কাটাবার লক্ষ্যেও বটে, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রতিষ্ঠা ঘটে। শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালী আবাসন ও অর্থ নৈতিক পুনরগঠন সহ সাময়িক সেনা শাসনের।

এরশাদ আমলে স্থগিত হয়ে যায় বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা অভিযান। প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা। এই উপজাতীয় ক্ষমতায়ন ব্যবস্থাটি ও বিদ্রোহ দমাতে ব্যর্থ হয়। তবে এটি উপজাতীয় ক্ষমতায়নের নতুন পথ নির্দেশ করে। তারা প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনের বিকল্প হিসেবে, সরকারী আশীর্বাদ পুষ্ট একটি অবস্থানে পৌছে যায় যেটির নাম হয় স্থানীয় সরকার পরিষদ। তৎপর তাদের দাবী হলো কেবল তিন জেলা স্থানীয় পরিষদ নয়, আরেক পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ। এটি সরকারী অঙ্গিকারের পরিণতি।

ছ) গ্রহণ বর্জন ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া।

১। (ক) বিদ্রোহীদের পাঁচ দফা দাবীতে প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ১/১৯০০ এর বিলোপ কামনা করা হয়েছে, যথাঃ

'১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ঔপনিবেশিক অগণতান্ত্রিক ও ক্রটিপুর্ণ। এই শাসন বিধিতে পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মজনগণের প্রতিনিধিত্বের কোন বিধি ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। (সুত্র ৫ দফা দাবী নামা)

(খ) উপজাতীয় পক্ষের দাবী ঃ গণতন্ত্র সম্মত স্বায়ত্তশাসন, উপজাতীয় শাসন নয়, যথা ঃ 'জুম্ম জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণের ব্যাপারে শুধুমাত্র পার্বত্য চট্টগ্রামের পৃথক শাসিত অঞ্চলের সত্তাই যথেষ্ট নহে। বস্তুতঃ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ দশ ভিন্ন ভাষাভাষী জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ও ভূমির অধিকার সংরক্ষণ করা সম্ভবপুর নহে। (সুত্র ঃ ৫ দফা দাবী নামা)।

বিপরীতে সরকার স্থানীয় সরকার পরিষদ নামীয় একটি অগণতান্ত্রিক উপজাতীয় শাসন উপহার দেন।

২। স্বায়ত্তশাসন দাবীর পরিপূরক বা বিকল্প জ্ঞান করে সরকার স্থানীয় সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন, এবং তাতে আশান্বিত হোন যে, এই ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধার টোপে, উপজাতীয় পক্ষ সন্তোষে বিদ্রোহ পরিত্যাগ করবে, এবং কঠোর জঙ্গীবাদীরা জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হবে। কিন্তু ফলাফল আশানুরূপ হয়নি। বাড়তি ক্ষমতা ও সুযোগ-সুবিধা আশানুরূপ সুফল দানে ব্যর্থ হয়। এটা হয় সরকারের পক্ষে আরেক ফাঁদ। এ থেকে পিছু হটারও উপায় থাকে না। এ ফাঁদে পড়ার কারণ, বিদ্রোহীদের না জড়িয়ে, নিজেদের উৎসাহে পরিকল্পনাটির বাস্তবায়ন। উপজাতীয় ক্ষমতায়নকে এভাবেই উৎসাহিত করা হয়েছে, এবং তাতে তারা কেবল পেতেই আগ্রহী, কিছু দিতে বা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হতে নয়। সরকার কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়ার কথা কল্পনায় না এনে, অঙ্গীকারের অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা দিতে থাকেন। আঞ্চলিক পরিষদের ধারণা, সরকারের জেলা পরিষদ ধারণা থেকেই গৃহীত হয়। পরিষদ প্রধান উপজাতীয় হবেন, এও সরকার সৃষ্ট তোষামোদী উদাহরণ। প্রাদেশিক শায়ত্ত শাসনের মূল দাবীতে রাজ্য পাল বা গভর্ণরের উপজাতীয় হওয়ার দাবী ছিলো না। মুখ্যমন্ত্রী উপজাতীয় হলেও, রাজ্য পাল বা গভর্নরের দ্বারা ভারসাম্যতা রক্ষা করা যেতো। বিপরীতে জেলা পরিষদ বা আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান সর্বে সর্বা। তাকে নিয়ন্ত্রণের যোগ্য কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নেই। জনসংহতি সমিতি এই শূণ্যতাকে, তারা সংশোধিত দাবী নামায় হুবহু ব্যবহার করেছে।

স্থানীয় সরকার পরিষদের এখতিয়ারভুক্ত করে যে ২২টি বিষয়ের তফসিল ঘোষিত হয়েছে, জন সংহতি সমিতির বিষয় তালিকায় তাই ব্যক্ত হয়েছে। শুধু রাজনৈতিক দাবী দাওয়ার প্রশ্নেই ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। সংশোধিত দাবী নামায় বিষয় সংখ্যা ৩৬টি

হলেও তা সরকারী ২২-এর অন্তর্ভুক্ত বিষয়কে লংঘন করে না। এমতাবস্থায় দেখা যায় সরকার দাবীকৃত বিষয়ে নীতিগতভাবে দুর্বল। মূল জেলা পরিষদ ধারণাটি সরকার প্রদত্ত হওয়ায়, আঞ্চলিক পরিষদের ব্যাপারটি অনড় অনমনীয়তায় আবদ্ধ থাকেনি। বিষয়টি প্রায় মীমাংসিতই হয়ে যায়। তৎপর আঞ্চলিক পরিষদের প্রতি সরকারী অনীহা প্রদর্শন নেহাত বিরোধীয় বাগাড়ম্বরেই পরিণত হয়ে পড়ে।

বাস্তবিক পক্ষে তখন অবশিষ্ট বিরোধীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়, স্বায়ত্তশাসন বনাম স্থানীয় শাসন। স্থানীয় শাসন মেনে নেওয়া হলে, এটা সাংবিধানিক সমাধানে পড়ে। নতুবা এটা উদ্ভাবনের আবশ্যক থাকে যে, রাষ্ট্রের এক কেন্দ্রিক ব্যবস্থার সাথেস্ব কী ধরণের স্বায়ত্তশাসন সংস্থান যোগ্য। দ্বিতীয় বিরোধীয় বিষয় হয় পৃথক শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা ও পৃথক শাসন আইন, যা সংবিধান সম্মত নয়, অথবা বিশেষ সুযোগ-সুবিধা সহ অভিন্ন সাংবিধানিক শাসন ও আইন। রাষ্ট্রীয় কাঠামো ও সংবিধানকে অক্ষুণ্ন রেখে, ভিন্নতা সম্ভব বলে মনে হয় না। এমতাবস্থায়, বিশেষ সুযোগ-সুবিধার সাংবিধানিক গেরান্টিতেই নমনীয় হওয়া বাকি থাকে।

জুম্মল্যান্ড ও জুম্ম জাতি পরিচিতির দাবীটি বস্তুতঃ হুজুগী। এ দাবীটি জাতীয় ঐক্যের পক্ষে হানিকর। এ নাম পরিচিতি প্রতিক্রিয়াশীল। এটা পরিত্যাগই সঙ্গত। পরিষদীয় এলাকা ভাগের ব্যাপারে জাতীয় সম্পদ সম্পত্তি ও জন বসতিকে পৃথক করে, সীমানা নির্ধারিত হওয়া উচিত বাবা হয়। তাতে বন পাহাড় হ্রদ প্রশাসনিক দপ্তর এলাকা ও শিল্পাঞ্চল কেন্দ্রীয় ভাগেই থাকবে, এবং অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চলের আবাদকৃত এলাকা স্থানীয় প্রশাসনের আওতাভুক্ত হবে। বসতি অঞ্চল হবে রাষ্ট্রীয় বন থেকে অবমুক্ত।

অবশিষ্ট বিরোধীয় বিষয়গুলো হলো উত্তেজনাকর ও অযৌক্তিক। বাংলাদেশ ও পার্বত্য চট্টগ্রামে লোক চলাচল, পেশা, ব্যবসা ও বসবাসে, অভিবাসনের মত বিধি নিষেধ আরোপ করা এক দেশ ও এক জাতিত্বের পরিপন্থী। তবে উপজাতীয় মৌলিকত্ব আর অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে, বাঙ্গালী জন সংখ্যাকে সীমিত রাখার বিধি ব্যবস্থা করা সম্ভব। অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও সমতা বিধান করা যাবে। পাহাড়ী ও বাঙ্গালীর রক্তগত সংমিশ্রণে কড়াকড়ি আরোপ এবং পাহাড়ী বাঙ্গালীর মিশ্র বসবাসে বাধা নিষেধ প্রয়োগ যৌক্তিক।

বাঙ্গালীদের সব পরিত্যাগ করে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হবে,এটি উগ্র উস্কানীমুলক দাবী। এতদাঞ্চল বাঙ্গালীদের স্বদেশ ভূমির অংশ। এখানে তারা বিদেশী বহিরাগত নয়। বরং নিরপেক্ষ ইতিহাস ও ১৯০০ সালের রেগুলেশন বা হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের ৫২ নং ধারাই অকাট্য দলিল যে, বাঙ্গালীরা স্বনামে এখানে নিষিদ্ধ নয়। উপজাতিরা এতদাঞ্চলে বিদেশী বহিরাগত বা বিজাতীয় অভিবাসী। এদেশবাসী তাদের এই বহিরাগমনকে অনুমোদন করেনি। সুতরাং বাঙ্গালী বিতাড়নের কার্যক্রম প্রত্যাহৃত না হলে, পাহাড়ীরা পাল্টা জন বিক্ষোভে পতিত হবে। এই বহিরাগমন তিক্ততাকে বহিষ্কার দাবীর দ্বারা পুনরোজ্জীবিত করা অসঙ্গত।

সেনা প্রত্যাহারের দাবীটি ও অনভিপ্রেত। তারা দেশ রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্বে নিয়োজিত। বরং বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর বিলুপ্তি ও অস্ত্রত্যাগই আকাঙ্খিত বিষয়। এই দেশ ও জাতি, উপজাতীয়দের সাথে বৈরীতায় নিয়োজিত নয়। প্রতিটি সরকার তাদের সাথে সহানুভূতিশীল আচরণ করেছেন। দাবী দাওয়ার ব্যাপারে প্রতিটি সরকার ছিলেন উদার। উপজাতীয় সন্তোষ ও কল্যাণের সব ব্যাপারেই দাতার ভূমিকা পালন করা হয়েছে। উপজাতীয়দের থেকে কেবল অভিযোগ আর অসন্তোষ নয়, কিছু সন্তোষ আর কৃতজ্ঞতা ও আশা করার বিষয়।

২। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে জাতীয় কমিটির সম্পাদিত চুক্তি ঃ ১৯৮৮

ক) ১৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৮৮।

'ধারা খ) রাঙ্গামাটি (খাগড়াছড়ি, বান্দরবন) পার্বত্য জেলা (সমূহের) জন্য বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পরিষদ গঠন করা হইবে। তাহাতে উপজাতীয় অধিবাসীদের প্রাধান্য ও সংখ্যা গরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে, উপজাতীয় ও অউপজাতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা, স্থিরকৃত অনুপাতে অক্ষুণ্ন রাখিবার উদ্দেশ্যে, উপজাতীয় ও অউপজাতীয় প্রতিনিধির সংখ্যা, স্থিরকৃত অনুপাতে নির্ধারিত হইবে, এবং প্রস্তাবিত জেলা পরিষদে জনসংখ্যা নির্বিশেষে সকল উপজাতীয় (সম্প্রদায়ের) প্রতিনিধিত্ব থাকিবে। সর্বোপরি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান উপজাতীয় লোকদের মধ্য হইতে নির্বাচিত হইবেন।

খ) ৫ই অক্টোবর ১৯৮৮

"ধারা ৭। আসন বন্টনে জনসংখ্যা ও উপজাতীয় ক্ষুদ্র গোষ্ঠী গুলির প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত হইবে।

প্রস্তাবিত জেলা কাউন্সিলে প্রতিনিধিত্বের অনুপাত হইবে অউপজাতীয় নূনতম এক তৃতীয়াংশ, এবং অবশিষ্ট বিভিন্ন উপজাতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। ৩১ সদস্য বিশিষ্ট পরিষদে উপজাতীয় এবং অউপজাতীয় সম্মত আসন নিম্নরূপ হইবে ঃ

	রাঙ্গামাটি	খাগড়াছড়ি	বান্দরবান
ক) উপজাতীয় চেয়ারম্যান	১	১	১ জন
খ) চাকমা সদস্য	১০	৯	১ জন
গ) মারমা (মগ)	৪	৬	১০ জন
ঘ) তঞ্চঙ্গ্যা	২	০	১ জন
ঙ) ত্রিপুরা + উচাই	১	৬	১ জন
চ) চাক (সেক)	০	০	১ জন

ছ) লুসাই	১	০	১ জন
জ) পাংখো + বোমৎ	১	০	০ জন
ঝ) খেয়াং	১	০	০ জন
ঞ) খুমি	০	০	১ জন
ট) মুরুং (ম্রু)	০	০	৩ জন
ঠ) অউপজাতি	১০	৯	১১
মোট	৩১	৩১	৩১ জন

গ) বিষয় বিভক্তি করণ ঃ বিষয় বিভক্তি করণ সম্পর্কে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহ জেলা কাউন্সিলের অধীনে পুর্ণ বা আংশিকভাবে ন্যস্ত করার প্রস্তাব করেন যথা ঃ ১। প্রাথমিক স্বাস্থ্য রক্ষা

২। প্রাইমারী শিক্ষা

৩। ইউ, এস, এফ (Unclassed State Forest)

৪। মৎস্য ও পশু পালন

৫। কৃষি

৬। সমবায়

৭। পুলিশ

৮। লাইসেন্স পারমিট (স্থানীয় ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত)

৯। উপজাতীয় সামাজিক আইন

১০। জেলার মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য সম্পর্কিত (বিষয়)

১১। সংস্কৃতি ও খেলাধুলা

১২। বাজারফান্ড/হাটবাজার।ম্ব

১৯৮৮ চুক্তির অধীনে প্রণীত আইন ধারা নং-১ (ক) স্থানীয় পরিষদ আইন। খ। সংজ্ঞা উপজাতীয় অর্থ রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/ও বান্দরবন জেলায় স্থায়ীভাবে বসবারত চাকমা, মারমা, তনচংগ্যা, ত্রিপুরা, লুসাই, পাংখু, ম্রো (মুরং) বোম, খুমি, উচাই ও চাক উপজাতির সদস্য।

চেয়ারম্যান উপজাতীয় গণের মধ্যে হইতে নির্বাচিত হইবেন।

এই আইন বা বিধিতে ভিন্নরূপ বিধান না থাকিলে পরিষদের নির্বাহী ক্ষমতা চেয়ারম্যানের উপর ন্যস্ত হইবে।

রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলার ডেপুটি কমিশনারগণ পদাধিকার বলে (সংশ্লিষ্ট পরিষদের) সচিব হইবেন।

ধারা নং ২। সচিবের দায়িত্ব হইবে পরিষদের সভা আহ্বান, সভা পরিচালনা ও সভার কার্যসূচী নিস্পন্ন করার ব্যাপারে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা।

ধারা ২২। পরিষদের কার্যাবলী। প্রথম তফসিলে উল্লেখিত কার্যাবলী, পরিষদের কার্যাবলী হইবে এবং পরিষদ উহার তহবিলের সংগতি অনুযায়ী এই কার্যাবলী সম্পাদন করিবে।

খ) প্রথম তফসিল ঃ (এখতিয়ার বা ক্ষমতা)

পরিষদের কার্যাবলী ঃ

১। জেলার আইন-শৃঙ্খলা সংরক্ষণ ও উহার উন্নতি সাধন।

২। জেলার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ সমূহে উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, উহাদের উন্নয়ন প্রকল্প সমূহের বাস্তবায়ন, পর্যালোচনা ও হিসাব নিরিক্ষণ, উহাদিগকে সহায়তা সহযোগীতা ও উৎসাহ দান।

৩। শিক্ষা।

৪। স্বাস্থ্য।

৫। জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন এবং তৎসম্পর্কিত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, জনস্বাস্থ্য বিষয়ক শিক্ষার প্রসার।

৭। পশু পালন।

৮। মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্য খামার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, মৎস্য ব্যাধি প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ।

৯। সমবায় উন্নয়ন ও সমবায় জনপ্রিয়করণ এবং উহাতে উৎসাহ দান।

১০। শিল্প ও বাণিজ্য।

১১। সমাজ কল্যাণ।

১২। সংস্কৃতি।

১৩। সরকার বা কোন স্থানায় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংরক্ষিত নহে, এই প্রকার জনপথ, কালভার্ট, ও ব্রীজের নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, এবং উন্নয়ন।

১৪। খেয়াঘাট ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ।

১৫। উদ্যান, খেলার মাঠ ও উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থাও উদ্যানের রক্ষণাবেক্ষণ।

১৬। সরাইখানা, ডাক বাংলা এবং বিশ্রামাগার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ।

১৭। উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন।

১৮। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন।

১৯। পানি নিস্কাশন ও পানি সরবরাহ।

২০। স্থানীয় এলাকার উন্নয়ন কল্পে নক্সা প্রণয়ন।

২১। স্থানীয় এলাকা ও উহার অধিবাসীদের ধর্মীয় নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সাধনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ।

ধারা ৬৪। ভূমি হস্তান্তরে বাধা নিষেধ। আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাঙ্গামাটি/খাগাড়ছড়ি/বান্দরবন পার্বত্য জেলার এলাকাধীন কোন জায়গা জমি পরিষদের পুর্বানুমোদন ব্যক্তিরেকে বন্দোবস্ত দেওয়া যাইবে না, এবং অনুরূপ অনুমোদন ব্যক্তিরেকে উপরোক্ত কোন জায়গা জমি উক্ত জেলার বাসিন্দা নহেন এইরূপ কোন ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা যাইবে না। তবে শর্ত থাকে যে, সংরক্ষিত (Protected) ও রক্ষিত (Reserved) বনাঞ্চল, কাপ্তাই বিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা এলাকা, সরকার বা জনস্বার্থের প্রয়োজনে হস্তান্তরিত বা বন্দোবস্তিকৃত জায়গা জমি এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রয়োজন হইতে পারে এইরূপ কোন জায়গা জমি বা বনের ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।ৃ

পর্যালোচনা ঃ

১। ২৪ (২) ও ৩১ (১) ধারা দুটি বিভ্রান্তিকর ও সরকারী দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে অসুবিধা জনক। আইনতঃ পরিষদের চেয়ারম্যান ক্ষুদ্র মেয়াদ ভিত্তিক একজন নির্বাচিত জন প্রতিনিধি, যার ক্ষমতার পরিধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু জেলা প্রশাসক সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি ও প্রশাসক। তিনি ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। স্থানীয় আইনে তিনি অসীম ক্ষমতাধর। জেলায় কর্মরত সব নির্বাহী কর্মকর্তা তাঁর অধীন ও অধঃস্তন। তবে ২১ (১) ধারা অনুযায়ী তিনি পরিষদের সচিব ও মামুলী দায়িত্বের অধিকারী। (মান-মর্যাদায় ও তিনি চেয়ারম্যানের অধস্তন। সুতরাং উভয়ের অবস্থান দান্দ্বিক। এ ব্যবস্থা সুষ্ঠ দায়িত্ব পালনের অনুকুল নয়। চয়ারম্যান কার্যতঃ জন প্রতিনিধি ও উপমন্ত্রীর মর্যাদা প্রাপ্ত হলেও,

ক্ষমতায় জেলা প্রশাসকই প্রধান। তিনি জেলা হাকিম ও জেলার প্রধান নির্বাহী আমলার ক্ষমতা বলে, জরুরী মুহূর্তে সরকারের পক্ষে, চেয়ারম্যান ও পরিষদের বিপক্ষে, ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকারী। সার্বক্ষণিক একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত, জেলা প্রশাসকের এই প্রাধান্য অনস্বীকার্য। কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ ও সার্বিক প্রশাসনের স্বার্থে এই প্রাধান্য অপরিহার্য। আনুষ্ঠানিক প্রধান রূপে এস্থলে একজন রাজনৈতিক প্রধানের নিযুক্তি জরুরী, যার পদ ও ক্ষমতা হবে পলিটিকেল এজেন্ট বা গভর্নরের মত।

২। এখানে উল্লেখ্য যে, সাধারণ নেতৃবৃন্দ আংশিক ক্ষমতা লাভে ও সম্মত ছিলেন। তাদের সাথে স্থির কৃত সিদ্ধান্তেরই অনুসরণে স্থানীয় সরকার পরিষদের ব্যবস্থা পরিকল্পিত, তার জন্য প্রয়োজনীয় বিধি বিধান রচিত, জাতীয় সংসদে তা গৃহীত, এবং সে অনুযায়ী নির্বাচনের মাধ্যমে এটি প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হয়েছে। অসঙ্গতিগুলো নিম্নরূপ ঃ

ক) চুক্তিবদ্ধ ১২টির স্থলে ২২টি বিষয় পরিষদের দায়িত্বাধীন হয়েছে। আংশিক ক্ষমতা ও বিবেচিত হয়নি।

খ) সংজ্ঞায় ব্যক্ত উপজাতি পরিচিতি, ইতিহাস, আইন ও নৃতত্বকে অনুসরণ করে নি। উপজাতি তালিকা ও প্রতিনিধিত্বের তালিকা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। কতিপয় যথার্থ ক্ষুদ্র সম্প্রদায় প্রতিনিধিত্বের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত নেই। শুধু উপজাতি হওয়া বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার সূত্র নয়। এই সাথে স্থানীয় আদিবাসী পাহাড়ী হওয়ার শর্ত জড়িত, যাদের উপর আয়কর প্রযোজ্য নয়। যথা ঃ ভারতীয় আয়কর আইন ১১/১৯২২ঃ

Shall apply to all persons in the chittagong Hill tracts except the indigenous Hillmen.

বাংলা ঃ এই আইন আদিবাসী পাহাড়ী ব্যতীত, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অন্য প্রত্যেকের উপর প্রযোজ্য হবে।

গ) জেলা প্রশাসকের অধীনতা ও ক্ষমতাহানি মূল সমঝোতার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। ক্ষমতার ভার সাম্যের ক্ষেত্রে এটা অবশ্যই মুখ্য বিবেচ্য বিষয়। তার সীমা লঙ্ঘন করে জেলা প্রশাসককে নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

ঘ) জনসংখ্যা ও সম্প্রদায় ভিত্তিক নির্বাচন সুনিশ্চিত হয়নি। এই ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী সম্প্রদায়ের ভোটের ক্ষমতা রহিত হওয়া দরকার ছিলো। এটি জাতীয় নির্বাচন নীতির পরিপন্থীও বটে।

ঙ) শুধু উপজাতীয়দের জন্য চেয়ারম্যান পদের সীমা বদ্ধতা অন্যায় আর অগণতান্ত্রিক।

চ) ব্যবস্থাটি প্রবর্তন কালে এটা বিবেচিত হয়নি যে, বিদ্রোহীদের কাছে, স্থানীয় উপজাতীয় জনসাধারণ অসহায় জিম্মি। তারা বিদ্রোহীদের আন্দোলনের সুফল ভোগী

পক্ষ হলেও, বিদ্রোহীদের বিপক্ষে এদের সংঘঠিত করা অতি দুঃসাধ্য কাজ। সুতরাং অনিশ্চিত ব্যবস্থার পিছনে ক্ষমতা ও অর্থের অপব্যয়, নিজেদের হয়রানীরই শামিল। তার চেয়ে সহজ ব্যবস্থা হতো ঃ পরিস্থিতির জন্য দায়ী পক্ষকে শান্ত করা। কোন বড় রকমের ছাড় দেয়া ছাড়াই, তাদের উত্থাপিত পাঁচ দফার আওতায় শান্তি স্থাপন সম্ভব ছিলো। ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, স্থানীয় সরকার পরিষদ শান্তির প্লেটফরমে পরিণত হতে অপারগ। যতই আশাবাদ ব্যক্ত করা হোক, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এটা সক্ষম নয়। বিদ্রোহীদের মূল্যায়নে ও স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের যথার্থ বিকল্প নয়।

(ছ) স্থানীয় ক্ষমতা মঞ্জুরের ক্ষেত্রে সরকার জন সংহতি সমিতির দাবীকে মান্য করে স্থানীয় সরকার পরিষদের ক্ষমতার তপসিল নির্ধারণ করেছেন। এই ক্ষেত্রে তফাৎ বলতে গেলে নেই। এখন কেবল রাজনৈতিক দাবীগুলোই অমীমাংসিত আছে।

৩। দাবী দাওয়া আন্দোলন ও সমঝোতা।

কারো কারো ধারণা হলো ঃ উপজাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য হচ্ছে ঃ শুধু স্বায়ত্ত শাসন লাভ। আরেক দল সন্দেহ করেন, স্বায়ত্ত শাসনের দাবী আসলে একটি মুখোস, এর আড়ালে মুল লক্ষ্য হচ্ছে স্বাধীনতা। ভারত এখানে একটি তাবেদার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহীদের মদদ দিচ্ছে। মধ্যপন্থী আরেক দলের অভিমত হচ্ছে, স্বায়ত্ত শাসন বা বিচ্ছিন্নতা নয়, সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা আদায়ই আসল উদ্দেশ্য। এ ধারণা গুলোর যথার্থতা যাচাই করার পক্ষে, আন্দোলনের গতি প্রকৃতি ও তাতে ব্যক্ত লিখিত বক্তব্যগুলোর মূল্যায়নই যথেষ্ট, যা এখানে ক্রমান্বয়ে উপস্থাপিত হলো।

পাকিস্তান আমলে সমস্যা ছিলো উপজাতীয় জীবনের পশ্চাদপদতা ও আদিমতা। সর্বত্র নিরক্ষরতা ছিলো ব্যাপক। রোজি রোজগারের প্রধান মাধ্যম ছিলো জুম কৃষি ও বনজ দ্রব্য আহরণ। প্রশাসন ছিলো আমলা নির্ভর ও সামন্ততান্ত্রিক। দারিদ্র্য আর পশ্চাদপদতা মানুষকে অসহায় করে রেখেছিলো। ষাটের দশকে কর্ণফুলী হ্রদের নিমজ্জন জনিত কারণে ঐ নদী উপত্যকার লক্ষাধিক অধিবাসী, নিজেদের বাড়ী-ঘর, জায়গা জমি, ফল ফসল ও বাগানের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রথম একসাথে মুঠ ভরা টাকার স্পর্শ পায়, এবং তদ্বারা সেই প্রথম স্বচ্ছলতার উল্লাস অনুভব করে। সাথে সাথে অনেকে নতুন বাড়ী-ঘর জায়গা জমি গড়ে তোলার অনিশ্চয়তায়, বর্ধিত ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে সোচ্চার হয়। সরকার মানুষের ক্ষোভ ও অসন্তোষ মিটাতে যাতায়াত, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন, সমাজ কল্যাণ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নে ব্রতী হন।

স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কৃষির উন্নয়নে অধিক প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়। এত ব্যাপক প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয় যে, তাতে ছাত্র আর শিক্ষক পাওয়াই কঠিক হয়ে দাঁড়ায়। প্রাথমিক শিক্ষা, পল্লী স্বাস্থ্য আর কৃষি সম্প্রসারণের সুবিধা পাড়ায় পাড়ায় ছড়িয়ে পড়ে। নগদ

টাকার আধিক্যে ভোগ বিলাস আনন্দ উপভোগ ও বিলাসী আয়োজন বেড়ে যায়। বন্য পশ্চাদপদ জীবনমান কাটিয়ে সহসা শহুরে সাজ পোষাক ও আধুনিকতার প্রতি লোকজন আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। অধিকার চেতনার জন্ম হয়। দৃষ্টিভঙ্গি ও রুচিতে পরিবর্তন আসে। পাকিস্তানের শেষ আমলে স্থানীয় শাসন ক্ষমতা লাভের সুযোগ হয়। বৃহৎ শিল্প ও পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আওতায় অনেকের কর্মসংস্থান ও ঘটে। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে সাথে, রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা এবং কর্মসংস্থানের চাহিদাও বৃদ্ধি পেতে থাকে। সেই বর্ধিত চাহিদা আর উচ্চাভিলাষই জন্ম দেয় নতুন রাজনৈতিক আন্দোলনের। শ্লোগান ওঠেঃ স্বায়ত্ত শাসন চাই। উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য আর ঐতিহ্যের রক্ষা কবচ দিতে হবে। এই বিক্ষুব্ধ নব প্রজন্মের নেতা হয়ে আবির্ভুত হোন মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা। আগুনের মত ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এ শ্লোগানটি। এরই অনুকূল প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনে লারমা জিতে যান। জয়ের সাফল্যে স্বতন্ত্র ঐতিহ্য প্রীতি ও স্থানীয় আধিপত্য লাভের আকাঙ্খা আরো জোরদার হয়ে ওঠে। কিন্তু আকস্মিক সংঘটিত স্বাধীনতা যুদ্ধ, তাদেরকে সাময়িক স্তম্ভিত করে দেয়। তবে উক্ত বিরতিকালেও নতুন উৎসাহের সংযোগ ঘটে। তারা মিজো স্বাধীনতাকামী ও স্থানীয় উপজাতীয় রাজাকারদের সংস্পর্শে আসেন। রাজনৈতিক সশস্ত্র আন্দোলনের একটি শিক্ষা ও সুত্র তাদের নাগালে এসে যায়। পাকিস্তানের পরাজয় নিশ্চিত হওয়ায়, অসহায় রাজাকার ও মিজো বাহিনী, বিমূঢ় অবস্থায় পতিত হয়। লারমা ও তার সহযোগীগণ এই সুযোগে তাদেরকে রাইংখ্যং বনের সীমান্তবর্তী বিতর্কিত এক জুম ক্ষেত্রে আত্মগোপন করার সুযোগ করে দেন, যে ক্ষেত্রটি বার্মা ও মিজোরামের সংযোগ স্থলে অবস্থিত। তথাকার বেআইনী চাকমা জুমিয়াগণ নিজেদের জুম ও বসতি রক্ষার জন্য সংসদ সদস্য লারমার উপর নির্ভরশীল ছিলো। লারমা প্রেরিত মিজো ও রাজাকারদের আগমনকে তারা নিজেদের শক্তি বৃদ্ধি ধরে নেয়, এবং ঐ বাহিনীদ্বয়ের আশ্রয় ও রসদ যোগাতে নিয়োজিত হয়। ভারতীয় বাহিনীর ভয়ে মিজোরা কিছুদিনের ভিতর চীন পাহাড়ের দিকে সরে যায় ও আত্মগোপন করে। উপজাতীয় রাজাকারগণ, যাদের সংখ্যা ছিলো প্রায় দেড় হাজার, লারমার তত্ত্বাবধানে সেখানেই থেকে যায়। অতঃপর পাকিস্তানীদের পরিত্যক্ত ও লুকিয়ে রাখা অস্ত্র ও গোলা বারুদ উদ্ধার এবং বাহিনীর সংখ্যাগত শক্তি বৃদ্ধির জন্য নতুন নিয়োগ ও ট্রেনিং দান শুরু হয়। এই সশস্ত্র লারমা বাহিনী পরিশেষে শান্তি বাহিনী নাম ধারণ করে, এবং এর পরিচালক রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে জন সংহতি সমিতির প্রতিষ্ঠা ঘটে। উভয়েরই জন্ম হয় আগে পরে ১৯৭২ সালে।

বাংলাদেশের জন্মলগ্ন থেকেই গুপ্ত হত্যা ও অগ্নিসংযোগের ঘটনাবলী শুরু হয়ে যায়, এবং একতরফা বাঙ্গালীরাই তার শিকার হয়। উপজাতীয় ছাত্র ও যুবকেরা সামরিক প্রস্তুতিমূলক শারীরিক কসরত ও কুচ কাওয়াজ অনুষ্ঠান শুরু করে। সশস্ত্র উপজাতীয় বাহিনীর আনাগোনা দৃষ্টি গোচর হতে থাকে। শুরু হয়ে যায় চাঁদাবাজি ও হুমকি। মফস্বলে জানমাল ও ইজ্জতের নিরাপত্তা অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। সরকার ও পরিস্থিতি

সম্বন্ধে অবহিত হোন। নিরাপত্তা জোরদার করার প্রচেষ্টা শুরু হয়। লারমা দ্বৈত ভূমিকা পালনে অবতীর্ণ হোন। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা সেজে একদল উপজাতীয় প্রতিনিধি সহ তিনি ঢাকায় পৌছে সর্বপ্রথম নিম্নোক্ত আনুষ্ঠানিক দাবীগুলো সরকারের নিকট পেশ করেন। এর আগে সমুদয় দাবী দাওয়াই ছিলো মৌখিক তথা অনানুষ্ঠানিক। উথাপিত দাবী সমূহ যথা ঃ

'১। পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে একটি স্বায়ত্ত শাসিত অঞ্চল এবং এর একটি নিজস্ব আইন পরিষদ থাকবে।

২। উপজাতীয় রাজাদের দপ্তর সংরক্ষণ করা হবে।

৩। উপজাতীয় জনগণের অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯০০ সালের পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ন্যায় অনুরূপ সংবিধি ব্যবস্থা থাকবে।

৪। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় নিয়ে কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন বা পরিবর্তন যেন না হয়, এরূপ সংবিধি ব্যবস্থা সংবিধানে থাকতে হবে।'

(সূত্র ঃ স্মারকলিপি ১৫ ফেব্রুয়ারী ১৯৭২)।

তবে এ দাবীগুলো নিয়ে লারমা সংসদে বা বাইরে কোথাও তেমন সোচ্চার হোন নি। প্রকাশ্য আন্দোলন মূলক কোন রাজনৈতিক কর্মসূচীও গ্রহণ করেননি। কিন্তু তার গোবেচারা ধরণের চেহারার আড়ালে ভয়ংকর হিংস্রতা উজ্জীবিত হতে থাকে। শক্তি বৃদ্ধি ও সশস্ত্র আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি এগিয়ে যায়। এই লেখক সরকারকে পরিস্থিতি অবহিত করেন সরকার নিজেও স্থানীয় গোয়েন্দা রিপোর্টের মাধ্যমে পরিস্থিতির ভবিষ্যৎ ভয়াবহতা অবগত হন ও প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি জোরদার করার উদ্দেশ্যে রুমা ও দীঘিনালায় সেনা ছাউনী প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হোন। বিপরীতে শুরু হয়ে যায় দুর্গম চলার পথে শান্তিরক্ষী বাহিনী ও বাঙ্গালীদের উপর গেরিলা আক্রমণ। বাজার ও গণ্যবাহী যানবাহনগুলো লুট করার ঘটনা ঘটতে থাকে। যাত্রীরা ব্যাপক সংখ্যায় লুট ও নির্যাতনের শিকার হতে থাকেন। পাড়াবাসী ও ব্যবসায়ীদের চাঁদা দিতে বাধ্য করা হয়। খুন জখম গুম ও মারপিট বেড়ে যায়। অগ্নিসংযোগের পুনরাবৃত্তিতে অনেক বাজার একাধিকবার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণে সেনা উপস্থিতি ও পুলিশী নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করা হয়। এরই এক পর্যায়ে ১৯৭৪ সালে নদী বন্দর সুবলং বাজারে পুলিশ ও শান্তিবাহিনী প্রথম মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শান্তিবাহিনীর পক্ষে কয়েকজন হতাহত ও ধৃত হয়। এরই কিছুদিনের ভিতর চন্দ্রঘোনা থানা এলাকায় সৈন্য টহল দলের উপর আক্রমণ ঘটে। প্রমাণিত হয়ে যায় শান্তিবাহিনীর ভয়াবহ হিংস্র অস্তিত্ব। লারমা এত সব ঘটনার দ্বারা উপজাতীয় মহলে এক নতুন ত্রাণকর্তাও বীরে পরিণত হোন। ইতোপূর্বে ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে তার জন সংহতি সমিতি উত্তর ও দক্ষিণের উভয় আসনেই জয়লাভ করে, এবং তিনি নিজে একজন সহযোগী সহ বর্ধিত শক্তিতে সংসদে পুনরাবির্ভুত হন। তবে এ যাবৎকাল সংসদে একটি কথাই তিনি জোরের সাথে ব্যক্ত করতে সক্ষম হন যে,

উপজাতিরা বাঙ্গালী নয়, এই ক্ষেত্রে বাংলাদেশী জাতীয়তাই প্রযোজ্য। সংবিধান গ্রহণ কালে তার ঐ বক্তব্য ছিলো যথার্থ, এবং তখনই রাষ্ট্রীয় কাঠামো ফেডারেল না এক কেন্দ্রিক হবে, এই প্রশ্নটি উত্থাপন যথার্থ হতো। কিন্তু প্রাদেশিক স্বায়ত্ত শাসনকামী লারমা এই সাংবিধানিক প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। তার লক্ষ্য ছিলোঃ আগে শক্তি সঞ্চয় ও তৎপর বাধ্য করণ। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, আওয়ামী লীগ নিয়ন্ত্রিত সরকার ও সংসদে তার স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতা লাভের দাবী হবে অরণ্যে রোদন। তিনি সতর্কতার সাথে শান্তিবাহিনী সংক্রান্ত উৎসাহ আর সংশ্লিষ্টতা গোপন রাখতে সচেষ্ট হোন। তাই তাকে প্রকাশ্যে বিদ্রোহী বলে অভিযুক্ত করাও যায়নি। তার লক্ষ্য ছিলো চূড়ান্ত প্রস্তুতি পর্যন্ত আত্মরক্ষা ও সময় ক্ষেপণ এবং সংসদীয় ক্ষমতায় টিকে থাকা। এই কৌশলেরই অংশ হিসাবে তার বাকশালে যোগদানকে মূল্যায়িত করা যায়। তবু ইতোমধ্যে তিনি সংগোপনে বিতর্কিত হয়ে যান। তার ধ্বংসাত্মক ভূমিকা সম্বন্ধে অনেকেই ওয়াকিবহাল হয়ে পড়েন। তিনি নিজেও ব্যাপারটি আঁচ করতে সক্ষম, ও নতুন করণীয় উদ্ভাবনে নিমগ্ন হন। এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রীয় বিপ্লব ঘটে যায়। বাকশালী সরকারের পতন ঘটে। তাদের অনেকেই নিহত হোন। ক্ষমতার পট পরিবর্তনে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। লারমা আত্মগোপন করেন। ইতোমধ্যে গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠান রো এর মাধ্যমে ভারত সরকারের সাথে তার যোগাযোগ ও সমঝোতা হয়ে গেছে। তিনি কৌশল হিসাবে দক্ষিণ ত্রিপুরাকে আশ্রয় হিসাবে গ্রহণ করে নেন। তাতে ভারতীয় মদদ যোগাযোগ ও নিরাপত্তার ছত্র ছায়া নিশ্চিত করাই ছিলো তার উদ্দেশ্য। একদা নির্বাচনী বাজিমাত ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চারিত হয়েছিলো যে উৎসাহ বর্ধক ও উত্তেজক সায়ত্তশাসন মূলক শ্লোগান, পরবর্তীতে তাই-উচ্চাভিলাষী করে তুলে তার প্রবক্তা নেতৃবৃন্দকে। পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের জন্ম রহস্য তাদেরকেও অত্যুৎসাহী করে তুলে। আঞ্চলিকভাবে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য, সীমান্তে অবস্থিতি, পার্বত্য দুর্গমতা, এবং সর্বোপরি বিদেশী মদদ লাভের নিশ্চয়তায় লারমা ও তার সহযোগীগণ উজ্জীবিত হোন। তারা ভাবতে শুরু করেন, শুধু স্বায়ত্ত শাসন নয়, আরো অধিক কিছু পাওয়ার পক্ষে পরিস্থিতি অনুকূল। সংখ্যাগত প্রাধান্যের গুণে হিন্দুদের জন্য ভারত, মুসলশানদের জন্য পাকিস্তান, এবং বাঙ্গালীদের পক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হওয়ায়, উপজাতীয় প্রাধান্যের বলে স্বশাসিত জুম্মল্যান্ড প্রতিষ্ঠা ও তার বেশী কিছু অর্জন সম্ভব। এই উচ্ছ্বাস ও উচ্চাশায় অস্ত্রবাজি, চাঁদা সংগ্রহ আর দালাল নির্মূল অভিযান জোরদার করা হয়। সমগ্র মফস্বল অঞ্চল সন্ত্রাসী তৎপরতায় ভরে যায়। একটি বিদ্রোহী সরকারই যেন পাশাপাশি সক্রিয় হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি হয়ে যায় ঘোলাটে।

ইতোমধ্যে বিপ্লব জনিত বিভ্রান্তি ও অস্থিরতা কেটে গেছে। সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান পাকা পোক্ত ভাবে ক্ষমতা সামলে নিয়েছেন। তিনি অনতিবিলম্বে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে বিদ্রোহ অবসানের লক্ষ্যে আলোচনা ও পরামর্শ লাভের আশায়, রাঙ্গামাটি সার্কিট হাউসে বৈঠকে বসেন। কিন্তু আলোচনায় উগ্রতা ও আঞ্চলিকতার প্রাধান্য ঘটায়, তিনি হতাশ হোন। তাঁর ধারণা জন্মে উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্যই উগ্রতা ও বিদ্রোহের ভিত্তি।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ উদার ও নমনীয় নন। সেই বৈঠকে তারা নিম্নোক্ত লিখিত বক্তব্য পেশ করেন, যা কার্যতঃই সমঝোতা মূলক ও নমনীয় ছিলো না, যথাঃ

৪। উপজাতীয়দের প্রাথমিক রাজনৈতিক বক্তব্য।

১। 'আমার মাতৃস্তন্য কাহাকে ও ধরিতে দিতে আমার ইচ্ছা নাই।স্ব

২। বেআইনী বাঙ্গালী অনুপ্রবেশকারীদের স্রোতধারা অবিলম্বে ও নিশ্চিত রূপে বন্ধ করিতে হইবে।স্ব

৩। "উপযুক্ত তদন্ত পূর্বক এ যাবৎকাল পর্যন্ত বেআইনীভাবে বন্দোবস্তিকৃত, হস্তান্তরিত এবং দখলিকৃত জমি হইতে বহিরাগতগণকে উচ্ছেদ করিতে হইবে।স্ব

৪। "চির প্রচলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম ভূমি প্রশাসন সম্বন্ধীয় বিধি এবং উপবিধি সমুহ কার্যকরী ভাবে প্রয়োগ করিতে হইবে।স্বস্ব

উপরোক্ত দাবীগুলোর প্রত্যেকটি উগ্র অসহনশীল ও একপক্ষদর্শী ছিলো। তাতে মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত বাঙ্গালী শক্তিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা হয়েছে। এতদাঞ্চল মুক্তিযুদ্ধের দ্বারা ছিনিয়ে আনা নয়, বরং এই পর্বতাঞ্চলের পক্ষে বাংলাদেশের সাথে সংযুক্তি যেন উপজাতীয় করুণা। বাঙ্গালীরা ও তাদের কাছে তুচ্ছ করুণার পাত্র। এই পার্বত্য ভূখন্ড যেন উপজাতিদের এক পক্ষীয় চিরকালিন লাখেরাজ সম্পত্তি। এই উগ্র এক পক্ষীয় তিক্ত বক্তব্যের দ্বারা বিদ্রোহকেই সমর্থন দেওয়া হয়। এখানে সমঝোতা ও জাতীয় স্বার্থের প্রতিফলন ঘটেনি। তাতে আরো কিছু উচ্চাভিলাষী দাবী ও সন্নিবেশিত হয়, যথা ঃ

ক) "উপজাতীয় স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া প্রশাসনকার্যে জেলা প্রশাসককে সাহায্য ও উপদেশ দানের জন্য উপজাতীয় জনপ্রতিনিধিগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী উপদেষ্টা কমিটি নিয়োগকরা হউক।স্বস্ব

খ) বর্তমান পুলিশ প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তন করিয়া, বর্তমান পুলিশ বাহিনীর স্থলে, পূর্বতন পার্বত্য চট্টগ্রাম পুলিশ বাহিনীর অনুরূপ প্রধানতঃ এই জেলার উপজাতীয় লোকগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী গঠন করা হউকস্বস্ব। (সূত্র ঃ উপপ্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জনাব জিয়াউর রহমানকে প্রদত্ত উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের স্মারক লিপি তাং ১৯-১২-৭৫ইং)।

জনাব জিয়াউর রহমান এটিকে উপজাতীয় বাড়াবাড়ি জ্ঞান করে সিদ্ধান্ত নেনঃ তাদের আপত্তিকৃত বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারাই উপজাতীয় প্রাধান্যের বিপদের মোকাবেলা করা সঠিক হবে। সংখ্যা প্রাধান্যের বলেই উপজাতিরা উগ্র ও দুর্বিনীত। এর স্থায়ী সমাধানই হলোস্ব বাঙ্গালীর সংখ্যা বৃদ্ধি। সংখ্যালঘু না হওয়া পর্যন্ত তারা দমিত হবে না। এর

পাশাপাশি যোগাযোগসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে উন্নয়ন কাজও চালান দরকার। প্রতিরক্ষামূলক প্রস্তুতি চালানে হয়। শুরু হয়ে যায় বাঙ্গালী আবাসন। সেনা ছাউনী বৃদ্ধির প্রতি জোর দেয়া হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত উন্নয়নে অধিক মনোযোগ ঘটে।

অতীত অভিজ্ঞতার অভাবে অনেকেই মনে করেন, বাঙ্গালী আবাসনটি উপজাতিদের হিংসাত্মক আচরনের মূল কারণ। কিন্তু এই প্রতিবাদীরা জানেন না যে, ওদের অনেকের বাঙ্গালী বিদ্বেষ একটি দীর্ঘ লালিত স্বভাব। উপরোক্ত স্মারক লিপির প্রথম দফাগুলোই এর প্রমাণ। বাঙ্গালী আবাসন হলো এর পরের ঘটনা। অপ্রিয় হলেও বাঙ্গালী আবাসন কাজটি রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষার অপরিহার্য অংশ। স্থানীয় বিদ্বিষ্ট জনগোষ্ঠীকে সংখ্যালঘু করার মাধ্যমেই এতদাঞ্চলের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হতে পারে। নতুবা এটা হয়ে থাকবে তাদের রাজনৈতিক উচ্চাশা পুরনের ঘাটি। সংখ্যাগত প্রাধান্যের মাধ্যমে প্রাপ্য আধিপত্য লামামহীন উচ্চাকাঙ্খা পুরণের কারণ হতে পারে। যদ্বারা আনুগত্য হীনতা ও বিদ্রোহ ঘটা সম্ভব। সন্দেহ ভাজনদের সংখ্যালঘুকে পরিণত করার অর্থ তাদের প্রতি অত্যাচার করা নয়। জাতি ও দেশের কল্যাণে এটি হবে তাদের ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার। দেশ রক্ষায় প্রাণ দিতে হয়। জাতীয় সম্মান রক্ষায় অনেক কিছু হারাতে হয়। এটি আত্মদান ও স্বার্থ ত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত। তাতে ক্ষতি আর পীড়ণ থাকলেও, তৃপ্তিদায়ক অহংকারও নিহিত। উপজাতিদের সংখ্যালঘুকে পরিণত হওয়া এমনি এক মাহাত্ম্য মন্ডিত কাজ। জাতি ও দেশের পক্ষে এটি প্রয়োজনীয়। এই অপ্রিয় কাজ স্বেচ্ছায় অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব নয়। এক শক্তিশালী পক্ষ এর বিরোধীতা করবেই। তাতে সংগঠিত সংঘর্ষ সংঘাতে জানমালের ক্ষতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। তবু লক্ষ্য অর্জন করা ছাড়া উপায় নেই। জনাব জিয়াউর রহমান, এ সব সম্ভাবনার কথা চিন্তা করেই, বাঙ্গালী আবাসনে অগ্রসর হোন। তার আকস্মিক শাহাদাতের ঘটনায় পরিকল্পনাটি স্থগিত হয়ে যায়। নতুবা এতদিনে উপজাতিদের ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হওয়া ছিল অবধারিত, এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে উপজাতীয় স্বাধিকার অর্জনের অস্ত্রবাজি, তার দার্শনিক ভিত্তি হারিয়ে, নেহাত দুষ্কর্মের চরিত্রই ধারণ করতে বাধ্য হতো। তাদের সন্ত্রাসের আশ্রয় ও ঘাটিগুলো হতো বাঙ্গালীদের দ্বারা দখলীভুত। বন ও পাহাড়ের নির্জন দুর্গমতা, ঢেকে রাখার মত আচ্ছাদনে, বিদ্রোহীদের লুকিয়ে রাখতে পারতো না। তখন দমিয়ে যাওয়া ছিলো তাদের পক্ষে অনিবার্য। গুপ্ত হত্যা আর সন্ত্রাস তৎক্ষণাত সম্পুর্ণ নির্মুল না হলেও, তার শক্তি হতো দুর্বল। তাতে দেশ জয় করার মত সাহস ও চ্যালেঞ্জ অব্যাহত থাকা, কোন মতেই সম্ভব ছিলো না। ফলে আস্তে আস্তে বিদ্রোহী পক্ষ হতাশায় আক্রান্ত হতো। পরিস্থিতি তাদেরকে অস্ত্র বাজি থেকে নিষ্ক্রান্ত করে দিতো।

পরবর্তী এরশাদ সরকার ভাবাবেগ বশতঃ বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে শান্তির নিশ্চয়তা পাওয়া ছাড়াই, বাঙ্গালী আবাসনও সেনা অভিযান, একতরফা ভাবে স্থগিত করে দেন। কোন্দলরত ক্ষুদ্র একদল বিদ্রোহীকেও নিরাপত্তা আশ্রয় দিয়ে, অবশিষ্টদের আত্মঘাতী সংঘাত থেকে বাঁচিয়ে দেন, এবং বিদ্রোহীদের দাবীকৃত স্বায়ত্ত শাসনের বিপরীতে,

স্থানীয় সরকার পরিষদ শাসনের এক অভিনব অগণতান্ত্রিক ও বৈষম্যমূলক স্বশাসন ব্যবস্থা চাপিয়ে দেন। পরিস্থিতির উন্নয়নে যে ব্যবস্থা মোটেও ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়নি।

বাঙ্গালী আবাসন ও সেনা অভিযান স্থগিত করণ, এবং দল ছুট বিদ্রোহীদের আশ্রয় দানের পর, সন্ত্রাস বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। এবার ১৯৮৬ সালে পাহাড়ী বাঙ্গালী পরস্পরের পাল্টা হানাহানি স্থানীয় গৃহযুদ্ধের রূপ নেয়। উপদ্রুত পাহাড়ীদের বিরাট একটি দল, ভারতের ত্রিপুরা ও মিজোরামে পালিয়ে গিয়ে, আশ্রয় গ্রহণ করে। তাদের মাধ্যমে বাংলাদেশে উপজাতি নির্যাতনের বদনাম রটে। তখন সরকার বিষয়টি হাল্কা করার জন্য বিদ্রোহীদের সাথে আলোচনার উদ্যোগ নেন। কিন্তু আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই সশস্ত্র বাহিনীর মাঝে। সরকার পক্ষের নয় দফা, আর বিদ্রোহী পক্ষের পাঁচ দফা সম্বলিত দাবী-পত্রগুলিই মাত্র পরস্পরের কাছে হস্তান্তরিত হয়। বৈঠকে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত না থাকায়, ফলপ্রসূ আলোচনা সম্ভব হয়নি। সুতরাং সমঝোতার পর্যায়ে পৌঁছা দুরূহই থাকে। আলোচনা চালিয়ে যাওয়া নিস্ফল ভেবে, ৬ষ্ঠ বৈঠকের পর বিদ্রোহী পক্ষ তা বর্জন করেন। অপর দিকে বিদ্রোহীদের ব্যর্থ করে দেওয়ার লক্ষ্যেই, স্থানীয় উপজাতীয় সাধারণ রাজনীতিকদের, ক্ষমতার টোপ হিসাবে, স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থার প্রতি, আগ্রহী করে তোলা হয়। বিদ্রোহীদের দাবীকৃত পাঁচ দফায় অন্তর্ভুক্ত স্থানীয় ক্ষমতা গুলো, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। শুধু প্রদেশ নাম ও গভর্ণর পদের ব্যবহারটাই বাদ থাকে। কিন্তু তা হয় কার্যতঃ আত্মঘাতী অথবা নিষ্ফল ব্যবস্থা।

বাস্তবে বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র। ফেডারেল প্রাদেশিক ব্যবস্থা তাতে সংগতি পূর্ণ নয়। এই সাংবিধানিক অসুবিধা যুক্তিসঙ্গতভাবে বিবেচ্য ছিলো। এর পক্ষে বিপক্ষে আলোচনা হতে পারে। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আপোষ মীমাংসার বিকল্প উত্থাপিত হওয়াও ছিল সম্ভব। প্রাদেশিক ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতা ও বিদ্রোহের বিপরীতে রক্ষা কবচ হলো রাজ্য পাল বা গভর্নরের উপস্থিতি, এবং তার পক্ষে কেন্দ্রীয় শাসন প্রয়োগের ক্ষমতা। সশস্ত্র বাহিনীর সহযোগিতায়, তিনি হন কেন্দ্রের পক্ষে প্রধান স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সরকার হয় তার আনুষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণাধীন। প্রাদেশিক সরকারের অর্থঃ স্বাধীন বা সামন্ত শাসন কর্তৃপক্ষ নয়, বা তা কোন সম্প্রদায় বিশেষের প্রশাসনিক কর্তৃত্বও নয়। বর্ণিত স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থায়, এরূপ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। স্থানীয় সরকার প্রধান চেয়ারম্যান ও তার পরিষদের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরোপকারী কোন স্থানীয় সার্বক্ষণিক কর্তৃপক্ষ নেই। অন্ততঃ একজন পলিটিকেল এজেন্ট নিয়োগ ও তাকে আনুষ্ঠানিকভাবে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব দিয়ে পরিষদকে কেন্দ্রের সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা যেতো। জেলা প্রশাসক কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি হলেও তিনি আমলা। তার রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রাধান্য আইনতঃ প্রাপ্য নয়। পারিষদীয় আইনে তিনি হন চেয়ারম্যানের অধীন একজন সচিব মাত্র। সুতরাং প্রাদেশিক ব্যবস্থার মত ক্ষমতার ভারসাম্যতা রক্ষা, বর্ণিত পারিষদীয় ব্যবস্থায় নেই। তাতে ক্ষমতা আমলা কেন্দ্রিক। দূরবর্তী কেন্দ্রীয় হস্তক্ষেপই তাকে নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। এই নিয়ন্ত্রণ তাৎক্ষণিক ও স্থানীয় না হওয়া অসুবিধাজনক। চেয়ারম্যান পদটি অগণতান্ত্রিক

ভাবে শুধু উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। এটি একপক্ষীয় তোষামোদ মূলক ব্যবস্থা, যা প্রাদেশিক ব্যবস্থায় স্বীকৃত নয়। প্রদেশ নাম, রাজ্যপাল বা গভর্ণর পদ, ভারসাম্যময় গণতান্ত্রিক শাসন ও নির্বাচনী ব্যবস্থা বাদে, সবই বর্ণিত পারিষদীয় ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রাদেশিক শাসনের পরিপূরক বিকল্প এক পক্ষীয় এই স্বশাসন ব্যবস্থা হলো এক নতুন সুবিধাবাদ। এর বিপরীতে একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি, তথা পলিটিকেল এজেন্টের অধীন, স্বশাসিত পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠন করা, যুক্তিযুক্ত হতো। তাতে স্থানীয় সরকার গঠনের মাধ্যম হতো, কিছু সংরক্ষিত আসন সহ গণতান্ত্রিক নির্বাচন। পাঁচ দফায় দাবীকৃত ক্ষমতার কাঠামোভুক্ত, সম্মত বিষয়গুলো হতো, স্থানীয় সরকারের দায়িত্বাধীন। বিদ্রোহী পক্ষের তাতে সম্মত হওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু এক রোখা অরাজনৈতিক চিন্তা সে সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেয়। ফলে শান্তি স্থাপন পিছিয়ে যায় ও স্থানীয় সরকার পরিষদ ব্যবস্থা বুমেরাং হয়ে দেখা দেয়। এটা হয়ে যায় বাস্তবে শান্তি-মুক্ত-ক্ষমতা-লিপ্সু খাই-খাই পরিষদ। যাদের নিজেরাই নিজেদের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। বাইশটি তালিকাভুক্ত ক্ষমতার সার্বিক হস্তান্তর ও সাংবিধানিক নিশ্চয়তার দাবীতে তারা হন সোচ্চার। তাদের এই দাবী দাওয়া বিদ্রোহীদের চাহিদারই প্রতিধ্বনি। তবু এই পারিষদীয় ব্যবস্থা বিদ্রোহীদের দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়। সুতরাং শান্তি স্থাপন ও শান্তকরণ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এই চেপে দেয়া পারিষদীয় ব্যবস্থা অব্যাহত রাখা মানে একটি অযথা ব্যয় বাহুল্যকে বয়ে চলা, শান্তি স্থাপনে যার কোন ভূমিকাই নেই। অশান্তির জন্য যাঁরা দায়ী, বলা যায় সেই বিদ্রোহীরাই প্রত্যক্ষভাবে শান্তির চাবিকাঠি। তাদের সাথেই সমঝোতা প্রয়োজন।

বিদ্রোহীদের দাবীর পরিধি এখন সীমিত। তারা এই পর্যায়ে শান্তি স্থাপনের প্রতি অধিক আগ্রহী। তাই স্বেচ্ছায় অস্ত্রবাজি থেকে বিরত হয়েছে। তাদের দাবীকৃত স্বায়ত্ত শাসনের পাঁচ দফা এখন আর আগের পর্যায়ে নেই। একচেটিয়া উপজাতীয় সুবিধাবাদ নয়, গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থাই তাদের কাম্য। এই নমনীয়তা নিশ্চয়ই সুলক্ষণ। তাদের মৌলিক রাজনৈতিক বক্তব্যগুলো প্রণিধান যোগ্য, যথা ঃ-

"এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপুর্ণ উপায়ে রাজনৈতিকভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচিতি জন্মভূমি ও ভিটা মাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে, সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে চায়। চায় সকল প্রকারের পশ্চাদপদতা অতি দ্রুতগতিতে অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। কারণ গণতান্ত্রিক শাসন ও অধিকার ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নতি সাধন সহ জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব সংহতি সামাজিক সংগঠন, অভ্যাস প্রথা প্রবাদ ভাষা ঐতিহ্য ভূমির অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংরক্ষিত হতে পারে না।স্বম্ব

(সূত্র ঃ জনসংহতি সমিতির জরুরী বিবৃতি তাং-৩১/১০/৯১ ইং)।

এই বিবৃতিকে বলা যায় সমাধানের সংশোধিত সর্বশেষ মূলনীতি, যা কার্যতঃ উদার ও বিজ্ঞ ধ্যান ধারণার সমষ্টি। এটাকে ভিত্তি করে সহজে সম্মানজনকভাবে সংকট উত্তরণ সম্ভব ছিলো।

উপজাতীয় সমষ্টিকে তাত্বিক অর্থে নয়, আভিধানিক অর্থে বাংলাদেশী জাতির শাখা বলে স্বীকৃতি দেয়া যায়। এমনিতে শব্দটি সাধারণ সংজ্ঞারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তার পরিবর্তে সংজ্ঞাটির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হওয়াই ভালো। জুম্ম জাতি বা জুমিয়া জাতি সংজ্ঞাটি একটি অনুপযোগী পেশা ও আদিমতা সংশ্লিষ্ট। উপজাতীয়দের সবাই নয়, অতি স্বল্প সংখ্যক পশ্চাদপদ লোকই উক্ত ঐতিহ্যের ধারক। তাই আধুনিক কালের গর্বিত সুসভ্য শিক্ষিত লোকজন, তদ্বারা পরিচিত হতে কুণ্ঠিত হবেন। সুতরাং জুম্ম জাতি নয়, আভিধানিক উপজাতি বা অবাঙ্গালী পরিচিতি হবে সঠিক ও সুখকর। স্থানীয় ভৌগোলিক নামটিও জুম্মল্যান্ড নয়, জুম-বঙ্গ রাখা যেতে পারে। নামটি বাংলা ঐতিহ্যের সাথে সংগতিপুর্ণ। অতীতে মোঘল আমলে এ নামটি প্রচলিত ছিলো। রাণী কালিন্দির একটি পাট্টায় এ নামের প্রচলন সমর্থিত হয়। মোগল আমলের জরিপী কাগজ পত্রেও এর উল্লেখ আছে। সুতরাং এ নামটি প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক ও কুলিন। এ নামের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত হতে পারে।

উপজাতীয় ঐতিহ্য ও স্বাতন্ত্র্য বিরোধীয় ব্যাপার নয়। এটা জাতীয় বৈচিত্র্যের অঙ্গ। তাদের ভাষা আচার-আচরণ প্রথা ও জীবন-যাপনের বর্ণাঢ্যতা অবশ্যই রক্ষা করার যোগ্য এবং তজ্জন্য দরকার পৃথক ঐতিহ্য সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে তার একটি শাখা থাকবে। সংশ্লিষ্ট সম্প্রদাযের দ্বারা নির্বাচিত হবে একটি ঐতিহ্য পরিষদ। সরকারী ব্যয়ে তারা নিজেদের ঐতিহ্য রক্ষা ও চর্চায় ব্রতি হবেন। আন্তঃ সাম্প্রদায়িক ও সামাজিক মিশ্রণ এবং কলুষতাকে পরিহার করাও হবে তার দায়িত্ব। একেকটি বিশেষ এলাকাকে বিশেষ সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত করাও যাবে। বিশুদ্ধতাবাদীরা সেখানে নিজেদেরকে অপরদের সংমিশ্রণ থেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। কিন্তু মিশ্র অঞ্চলও রক্ষিত হবে, যেখানে সবার সম্মিলিত বসবাসের অধিকার থাকবে।

জুম্মজাতি ও জন্মভূমির অস্তিত্ব রক্ষায় গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে, সংরক্ষিত উপজাতীয় অঞ্চল ভাবা হলে, তা বাস্তব সম্মত হবে না। দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে এখানে বাঙ্গালীদের এবং অবশিষ্ট অঞ্চলে উপজাতীয়দের সমান ভূম্যাধিকার অবশ্যই প্রাপ্য। উপজাতি ও বাঙ্গালী মিলে সবাই বাংলাদেশী জাতির সদস্য। তাদের কেউ কোথাও অবাঞ্ছিত হতে পারে না। গণতান্ত্রিক স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থা পশ্চাদপদদের বিশেষ সুবিধাসহ, অবশ্যই মঞ্জুর যোগ্য। এটা আবশ্যিক কাজ। কোন সম্প্রদায়ের পক্ষেই কোন জটিল ব্যাপারে একক একতরফা ত্যাগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে উপজাতীয় পক্ষকে অবশ্যই ছাড় দিতে হবে। জাতি রাষ্ট্রীয় কাঠামো পরিবর্তনের দ্বারা ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত, স্বায়ত্ত শাসন দাবীটি

স্থগিত রাখাই সঙ্গত। দ্বিতীয়ত ঃ বাংলাদেশের স্থপতি বাঙ্গালী সম্প্রদায়কে আস্থায় আনয়নই উপজাতীয় সুবিধা সুযোগ লাভের উপায়। তাদের বৈরিতা ক্ষতিকর। এই সত্য কথাটির প্রতি প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। তাদের বৈরিতা ক্ষতিকর। এই সত্য কথাটির প্রতি প্রতিপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে। সুতরাং বাঙ্গালীদের সাথে বৈরিতা নয়, সহাবস্থান ও সখ্যতাই উপজাতীয় স্বার্থের অনুকূল, এই উপলব্ধিতে উজ্জীবিত হতে হবে। বাঙ্গালী পাহাড়ী একমত হলে, এখানে অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে। এই সুন্দরতম উর্বর প্রাকৃতিক অঞ্চল, তার জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের এক সোনার খনি। একে বৈরিতা আর হিংসায় অকেজো করে রাখা দুর্ভাগ্যজনক। সমঝোতার সুত্র এটাই।

৫। পাঁচ দফা দাবী নামায় স্বায়ত্ত শাসন ও বিচ্ছিন্নতা।

এটাই ব্যাপক ধারণা যে, পার্বত্য উপজাতিদের পক্ষে জন সংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তি বাহিনী বাড়াবাড়ি করলেও তারা জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছে। তাদের এই অধিকারের লড়াই, দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিরোধী নয়। দেশের অধিকাংশ বামপন্থী পন্ডিত ও কিছু মানব দরদী সরল প্রাণ বুদ্ধিজীবী, এ ধারণাটির পরিপোষক। এরা যুক্তি ও দরদের মোড়কে, এ ধারণাটির পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু দেশে বিদেশে এমন লোকের ও অভাব নেই, যাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিপক্ষে উপজাতিদের উষ্কানী ও মদদ দান। আমার এ প্রবন্ধটির লক্ষ্য ঃ মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে সুধী ও দেশ প্রেমিকদের ঐ গূঢ় রহস্যটি ওয়াকিবহাল করান, যদ্বারা পরিষ্কার হয়ে যাবে যে, আসলে পাঁচ দফা দাবী নামায় কী ব্যক্ত আছে। এখন পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবি নামার চুল চেরা মূল্যায়ন হয়নি। ব্যাপক আলোচনা ছাড়া এর ঘের টোপ উম্মোচিত হবে না। জাতীয় সংকট ও স্বার্থের সাথে জড়িত এ বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রাখে। অবহেলার কারণে দিনে দিনে এটি জটিল হচ্ছে। উভয় পাক্ষিক বৈঠকের আগে বিষয়টির উপর পাঠ ও অভিজ্ঞতা নেওয়া দরকার। আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, দীর্ঘ দিন যাবৎ পার্বত্য সংকটটি প্রলম্বিত থাকলেও এখন পর্যন্ত এতদাঞ্চল ও অবাঙ্গালী স্থানীয় বাসিন্দাদের সর্বাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য কোন পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলিত বা রচিত হয়নি। কোন কর্তৃপক্ষই তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। হ্যাঁ ইতোমধ্যে কিছু পুঁথি ও কিংবদন্তি পুস্তক রচিত, সংকলিত ও মুদ্রিত হয়েছে, এবং সে সবের উপজাতীয় লেখকগণ সহায়তা আর অনুদান ও পেয়েছেন। তবে ঐ সব লেখা লেখিতে বিভ্রান্তি বেড়েছে, প্রকৃত তথ্যের বিশেষ যোগান মেলেনি। এতদাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের জানার জন্য দরকার ছিলো তথ্য ভান্ডার গড়ার ও গবেষণার দ্বারা ঐ ভান্ডারটিকে ইতিহাসে রূপ দানের। প্রয়োজন কালে না হলে, এ আর কখন হবে? এটা দুর্ভাগ্য যে অন্ধের হাতি দেখার মত পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিচার হচ্ছে।

উপজাতীয় বিদ্রোহী পক্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী দাবীগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমেই এসে যায়, তাদের ক্ষমতায়ন দাবী কথা। প্রথমে এটি ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের

দাবীতে দৃঢ়। দীর্ঘ বিশ বছরের রক্ত ক্ষরণের পর ১৯৯০ সালে এটি আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবীতে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু দাবীটি আগেও সাংবিধানিকভাবে আইন সম্মত ছিলো না, সংশোধনের পর এখনো তা সংবিধান সম্মত নয়। রাষ্ট্রের এক কেন্দ্রিক কাঠামো তাতে ক্ষুণ্ন হয়, এটাই আপত্তি কর। এই বাধার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ তজ্জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু এখানেও পরিস্থিতি বিরূপ। সংবিধান সংশোধনে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজনীয়। এটা মৌলিক সংশোধনী বলেও, গণভোটে জাতি কর্তৃক তা গৃহীত হতে হবে। কোন সরকারেরই এটি একক কর্তৃত্বের ব্যাপার নয়। সুতরাং সংশোধনের পক্ষে সুপারিশ প্রধান যুক্তি সঙ্গত ও বাস্তব নয়। এই যৌক্তিক পরিবেশে জনসংহতি সমিতির অবস্থান কী হবে তা অজ্ঞাত। তবে এতে যে তারা ছাড় দিবেন, ও শৈথিল্য দেখাবেন, এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ইতোপূর্বে তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদেরকে ভাবিয়ে তুলা হয়েছে বলেও কোন খবর নেই। আমাদের জানা মতে, বিদ্রোহী পক্ষের সাথে সরকারী পক্ষের অনেক আলোচনা হলেও, যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক মত বিনিময় খুব কমই হয়েছে, অথবা মোটেও হয়নি। আলোচনার অনুরূপ দৈন্যদশা, সুফল দায়ক হতে পারে না। সমস্যার সমাধান তাই সূদুর পরাহত রয়ে গেছে। মূল প্রধান দাবী হলো, 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া......আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।ম্ব (দাবী-১) এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে যদি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েও যায়, এবং সরকার ও বিরোধী দল সমূহ শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও করেন তবু সংবিধান সংশোধন সহজসাধ্য হবে না। জন সংহতি সমিতির প্রস্তাবিত সংশোধন, গোটা সংবিধানকেই প্রভাবিত ও গ্রাস করবে। মনে করা হয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ নং ১ই মাত্র সংশোধন করা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশ নামীয় রাষ্ট্রটিকে এককেন্দ্রিক বা ইউনিটারী ঘোষণা করেছে। অথচ জন সঙহতি সমিতির দাবী নং ১ হলো আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন, যার চরিত্র ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এর বিপরীতে দুই ধারার রাষ্ট্র কাঠামোতে সঙ্গতি বা সমঝোতা সাধন দুষ্কর। সাংবিধানিক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান ভিত্তিক সমঝোতা প্রস্তাবে ও সুপ্রীম কোর্টে পার পাওয়া কঠিন হবে। বিষয়টি আরো জটিল হবে যখন দেখা যাবে যে, দাবীর অন্যান্য অংশগুলোতে ও সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন এবং শেষ মেশ এই সংশোধনের ধারা, সংবিধান পরিবর্তনেই পর্যবসিত হয়। তখন নিরূপায়ভাবে সবাইকে হতভস্ব আর অক্ষম হয়ে যেতে হবে। অনুরূপ বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবনাকে আগে ভাগেই আঁচ করা উচিত।

আমার কথাগুলোকে আগাম হতাশা ও ফেকড়া আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সুধী মহলের আরো ভাববার বিষয় হলো ঃ রাষ্ট্রের গণপ্রজাতন্ত্রী সাংবিধানিক চরিত্র, কোনরূপ গোষ্ঠীতন্ত্রকে সমর্থন করে না। জন সংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামে অখন্ড অঞ্চল ভিত্তিক উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসন, এবং বাংলাদেশের সাথে শিথিল সম্পর্ক। বিষয়টি সরাসরি নয় তীর্যকভাবে উপস্থাপিত হয়েছে,

যথা ঃ

দাবী নং ১/কঃ

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

দাবী নং ১/খ ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি বিশেষ শাসন বিধি অনুযায়ী শাসিত হইবে। সংবিধানে এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২ (গ)ঃ

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে, সংবিধানে সেই রকম সংশোধন ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২ (ঘ)ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন, এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা।....

দাবী নং ২ (ঙ-১)ঃ

গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন না করা হয়, সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ঙ-২)ঃ

আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতীত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২ (৪)ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসনসমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

দাবী নং ২ (৫/গ) ঃ

পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দাবী নং ৩(১) ঃ ১৭ই আগস্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা জমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া, অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়া বিভিন্ন স্থানেও গুচ্ছ গ্রামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সবাইয়া লওয়া।

দাবী নং ৩ (৪/ক)ঃ

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনানিবাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া। (সূত্র ঃ সংশোধিত দাবী নামা)।

এই দীর্ঘ উদৃতির মাধ্যমে সুধী পাঠক মহলের ধৈর্য্যচ্যুতি হলেও এটা তাদের পক্ষে অনুধাবন করা কঠিন নয় যে, সংবিধান বজায় রেখে এবং বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বাঁচিয়ে, এই দাবী দাওয়া পূরণ সম্ভব নয়। এটা হলো স্বায়ত্ত শাসনের নামে এমন আঞ্চলিক স্বশাসনের ক্ষমতা লাভের পচেষ্টা, যার অবস্থান স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কাছাকাছি। এমনিতে স্বায়ত্ত শাসন হলো স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থান। এলাকাটিও দুর্গম ও উপজাতি প্রাধান্যময় বৈরী বিজাতীয় সীমান্ত। এই প্রতিকূল পরিবেশ, অখন্ডতার রক্ষাকবচ নয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব রক্ষার পক্ষে এক নাজুক পরীক্ষা ক্ষেত্র। শুধু উপজাতীয় অসন্তোষ দুরিকরণই ভাবনার বিষয় নয়, এবং এ বলাও সঠিক নয় যে, কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায়ই উপজাতীয় সংগ্রামীদের লক্ষ্য। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপজাতীয় অস্ত্রধারীরা বিদ্রোহী। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাঙ্গালী উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা। ইতোমধ্যে লাঞ্ছনা-বঞ্চনার বেশ প্রতিকার হয়েছে। উন্নতি আর অগ্রগতির পরিমান ও যথেস্ট। এখন বিদ্রোহ আর অসন্তোষ অব্যাহত থাকার বিশেষ কার্য কারণ নেই। এমতাবস্থায় সন্তোষ ও কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটা উচিত। দেশ রক্ষার কার্যক্রম প্রকৃতপক্ষে বিদ্রোহকে পাহারা দান বা জিইয়ে রাখা নয়, বরং দমন করা, এবং তা দ্রুতই হতে হবে। তবে শান্তিপুর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে নিস্পত্তি করাই সর্বোত্তম। সরকারী পক্ষে একমাত্র ক্ষমা ও স্থানীয় শাসন মঞ্জুরই নমনীয়তার বিষয়। অপর পক্ষে বিদ্রোহীদের শর্তহীন অস্ত্র আর বাড়াবাড়ি ত্যাগই হতে হবে সমঝোতার শেষ কথা। এই চূড়ান্ত প্রস্তাবে রাজি না হলে, আর কোন শৈথিল্য নয়। বিদ্রোহীদের দমন ও নির্মূলে বাঙ্গালী আবাসনই হবে যথেষ্ট। চিরকালের জন্য বিদ্রোহী পক্ষকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত করার মাঝেই, উপজাতীয় বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দমনের স্থায়ী উপায় নিহীত। এ পথই সমাধান। সেনা বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্রোহ দমাতে কঠোরতার বিকল্প নেই।

ঘরে বাইরে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সন্দেহবাদী লোকদের সংখ্যা প্রচুর। বাংলাদেশের ও বাঙ্গালী পক্ষের ক্ষয়-ক্ষতিতে ওরা কখনো বিদ্রোহী পক্ষের নিন্দাবাদে সোচ্চার নয়। ওদেরকে হামেশা বিপক্ষীয় যুক্তি খাটাতেই দেখা যায়। ওরা মাসোহারা ভোগী এজেন্টের মতই ভূমিকা পালন কারী পক্ষ। কিছু বামপন্থী দেশীয় পত্র-পত্রিকা ও বিদ্রোহীদের স্তাবক। কল্পনা চাকমার আজগৌবী অপহরণ ও তার জীবন কাহিনীর মত উড়ো কথাই তাদের প্রধান উপজীব্য। দিনকে দিন ইনিয়ে বিনিয়ে তাই প্রচার করতে তারা অধিক উৎসাহী । না পারতে, দায় সারা গোছের হাল্কা ভাষ্যের আক্রমণ বাঙ্গালী হত্যা ও অপহরণের কিছু ঘটনা তাদের প্রচার মাধ্যমে আসে। দেশ ও জাতির সমর্থনে তাদের যুক্তি ও আলোচনা কমই পরিচালিত হয়। জাতীয় স্বার্থ রক্ষামূলক বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তি ও আলোচনাকে তারা কমই আমল দেন। এদের মদদেও বিদ্রোহী পক্ষ শক্তি আর উৎসাহ পায়।

এতদাঞ্চলের জুম্মল্যান্ড নাম, প্রবর্তন এর উপজাতীয় অধিবাসীদের জুম্মুজাতি পরিচিতি দান, বাঙ্গালী ও সেনাবাহিনীর প্রত্যাহার বাস্তবায়ন এবং বাংলাদেশের সাথে লোক চলাচল ও বসবাসে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তন সহ, পৃথক প্রশাসনিক আইনের সংস্থানের অর্থ, বাংলাদেশের নিজের দ্বারা নিজের সেচ্ছায় অঙ্গচ্ছেদ ঘটান ও স্বতন্ত্র জুম্ম্যাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা করা। এতদাঞ্চলে কোন আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় প্রশাসক থাকারও প্রস্তাব নেই। সর্বেসর্বা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন আঞ্চলিক পরিষদ প্রধান। এতো আনুকূল্য ও স্বাতন্ত্র্যকে অবশ্যই বেনামী বিচ্ছিন্নতা বলা যায়। শুধু একটি ঘোষণাই বাকি থাকে যে, বাংলাদেশের সাথে জুম্ম্যাল্যান্ডের আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। এমন মুক্ত পরিবেশে, উগ্র জঙ্গীবাদী পক্ষ, কোন চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগ নিবে না, এমন নিশ্চয়তা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়।

খোদ সরকারই উপজাতিদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথে এগিয়ে যেতে, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে, চেয়ারম্যান পদ, প্রধান নির্বাহী ক্ষমতা সম্পন্ন একক উপজাতীয় কোটাভুক্ত করে, উদাহরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। এ দাবীটি কখনো সরাসরি উত্থাপিত হয়নি, এবং সরকার নিজেও একজন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধির আকারে তত্ত্বাবধায়ক বা প্রশাসকের আনুষ্ঠানিক সংস্থান রাখেননি। দূরবর্তী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেলা প্রশাসকগণ খন্ডিত কর্তৃত্বেরই অধিকারী ও আমলা। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব, তাদের দায়িত্ব ভুক্ত বিষয় নয়। সুতরাং এ বলা বেঠিক হবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সরকারী নীতি নির্ধারণে, তথ্য তত্ব ও বুদ্ধি কৌশল কমই খাটান হয়েছে।

দাবী দাওয়ার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াবার কৌশল হিসাবে জন সংহতি সমিতি ঘোষণা করেছে যে, তারা সংবিধান গণতন্ত্র ও দেশের অখন্ডতাকে মান্য করে, যথা ঃ 'এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জন সংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ, শান্তিপুর্ণ উপায়ে

রাজনৈতিকভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচিতি, জন্মভূমি ও ভিটা মাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে, জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ করতে চায়। চায় অতি দ্রুত গতিতে সকল প্রকারের পশ্চাপদতার অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গনতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে।ম্ব (সূত্র ঃ জরুরী বিবৃতি তাং ৩১,১২,৯১ইং)।

জনসংহতি সমিতির সশস্ত্র হিংস্রতারই ফল, সাম্প্রদায়িক হানাহানি ও উপজাতীয়দের দেশ ত্যাগ। পাঁচ দফা দাবী ও তার পক্ষে পরিচালিত অহিংস আর সহিংস উভয় প্রকার আন্দোলনের সুফল ও কুফলের ভাগীদার সার্বিকভাবে উপজাতীয় সমাজ। কেউ পৃথক কোন পরিস্থিতির শিকার নয়। পাঁচ দফাই চূড়ান্ত ও সার্বিক উপজাতীয় দাবী হয়ে থাকলে, তার প্রবক্তাদেরকেই সংকট রফা করার দায়িত্ব নিতে হবে। নতুবা পাঁব দফা ও তার পক্ষে পরিচালিত আন্দোলন, গুরুত্ব হারাতে বাধ্য, তাতে উপজাতীয় সমাজ ভিন্ন ভিন্ন নিজস্ব পন্থায় দাবী দাওয়া আদায়ে উৎসাহিত হবে, এবং খোদ উপজাতীয় সমাজে জনসংহতি সমিতি হবে অবহেলিত। এটা হবে তাদের পক্ষে সাংগঠনিক বিপর্য্যয়। আসলে বাড়তি কিছু দফা জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফারই পরিপূরক কিছু দাবী। তাতে চমক আছে, নতুনত্ব নেই। এই দাবী প্রবণতা বাংলাদেশ পক্ষের অতি উদারতারই ফল, যাকে বিপক্ষরা দুর্বলতাই ভাবে।

এখানে শরনার্থী সংগঠন পদত্ত দফাওয়ারীভাবে ১৩ দফা দাবীর পর্যালোচনা করা হলে দেখা যাবে, এটা আসলে মীমাংসাকে বাধাগ্রস্ত করা, নতুবা জটিলতার সৃষ্টি ও প্রতিদ্বন্দ্বী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। বিরোধের সাথে এভাবে পক্ষ বৃদ্ধিকে অনুমোদন করা হলে, তা একটি প্রবণতার রূপ নিবে এবং মীমাংসা প্রচেষ্টা দফায় দফায় প্রলম্বিত হয়েই চলবে, চূড়ান্ত হবে না।

৬। ভারতে আশ্রিত শরণার্থীদের ১৩ দফা।

দফা নং-১। উপজাতীয়দের জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান।

জবাব ঃ দেশে প্রায় দশ লক্ষ উপজাতি ও আদিবাসী, জীবন ও সম্পত্তির পরিপূর্ণ নিরাপত্তা ভোগ করছে। কতিপয় অসন্তুষ্ট স্বদেশত্যাগী শরণার্থী ছাড়া, স্বদেশবাসী কোন উপজাতীয় বা আধিবাসী লোক নিরাপত্তা হীনতার অভিযোগে সোচ্চার নয়। স্বদেশত্যাগী শরণার্থীদের কেউ কেউ চিহ্নিত অপরাধী বিধায়, তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন নিরাপদ নয় ভাবাই স্বাভাবিক। উপজাতীয় কেউ এ দেশের কোথাও লাখেরাজ সম্পত্তি বা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী নয়। বন্দোবস্তি দলিলের মাধ্যম ছাড়া তাদের ভূম্যাধিকার মান্য হতে পারে না। রাষ্ট্রীয় উদারতার গুণে তাদেরকে খাস জমি ভোগ দখল করতে দেওয়ার অর্থ আনুষ্ঠানিক ভূম্যাধিকার প্রদান নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দোবস্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত আবাদকৃত জমি ভোগ ভূম্যাধিকার নয়। আনুষ্ঠানিকভাবে বন্দোবস্তি গ্রহণ না করা পর্যন্ত

আবাদকৃত খাস জমি ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয় না। তবু সরকার ও জাতি উপজাতিদের প্রতি সহানুভূতিশীল। তাদের মালিকানাধীন ও দখলাধীন সম্পত্তি বেদখল থেকে উদ্ধার ও প্রত্যার্পণের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে। দেশে আইনের শাসন প্রচলিত আছে। কোন নিরিহ সংখ্যালঘু বা উপজাতির পক্ষে চলমান সশস্ত্র তৎপরতার গুণে ইতোপূর্বে যে সংঘাতময় পরিস্থিতি ছিলো, এখন অস্ত্র সম্বরণ পালিত হওয়ায় তাও বিদূরিত। সুতরাং স্বদেশবাসী উপজাতীয় লোকদের জীবন ও সম্পত্তি এখন সম্পুর্ণ নিরাপদই আছে। শরণার্থীদের জন্য স্বদেশে অনুরূপ নিরাপদ পরিবেশই অপেক্ষমান, যার ব্যতিক্রম হবে না। এটা রাষ্ট্রীয় অঙ্গিকার, এতে আশ্বস্ত হওয়া উচিত।

দফা নং ২। বিভিন্ন সময় উপজাতীয়দের উপর সংঘটিত গণহত্যার ব্যাপারে হাইকোর্টের বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত অনুষ্ঠান।

জবাব ঃ বিদ্রোহ আর সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা জনিত সংঘাত সংঘর্ষে, উপজাতীয় লোকদের চেয়ে বাঙ্গালীরাই অধিক ক্ষতিগ্রস্ত। প্রতিটি সংঘাত সংঘর্ষ উপজাতীয় পক্ষ থেকেই শুরু হয়েছে। ক্ষেত্র বিশেষে বাঙ্গালীরা তার পাল্টা দিয়েছে মাত্র। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপজাতীয়রা সংঘর্ষ বাঁধিয়ে পাল্টা প্রতিক্রিয়া থেকে বাঁচতে পালিয়ে গেছে। ঐ পলাতকদেরই একটি অংশ শরণার্থী হিসাবে ভারতীয় শিবিয়ে আশ্রিত আছে। ঐ ঘটনাবলী তদন্তে হাইকোর্টের কোন বিচারক নিযুক্ত হলে, নির্যাতিত বাঙ্গালীরাও হিসাবে আসবে। তদন্তে বাঙ্গালী পক্ষের অধিক ক্ষয়ক্ষতি নিরুপিত হওয়াই স্বাভাবিক। তখন তদন্তের দাবীদারেরা আবার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সোচ্চার হবে। যেমনটি ঘটেছে ১৯৯২ সালের লোগাং হত্যাকাণ্ডের তদন্তে। সুতরাং তদন্ত দাবী, বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়।

দফা নং-৩। উপজাতীয়দের জমি ফিরত দান।

জবাব ঃ সরকার তিন পার্বত্য জেলার সমুদয় জায়গা জমি জরিপের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাতে ব্যক্তিগত মালিকানা, ভোগ দখল বিরোধ এবং সরকারী খাসের একটি সার্বিক ও পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যেতো। ওটাই হতো জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ মীমাংসা ও সমস্যা সমাধানের নির্ভরযোগ্য সূত্র। সুতরাং দাবীটির যথার্থতা প্রমাণের পদক্ষেপ ইতোমধ্যেই গৃহীত হয়েছে। এতেও উপজাতীয় পক্ষের একদল বিরোধীতায় সোচ্চার। পর্যালোচনায় মনে হয়, শুধু একের পর এক দাবী উথাপন ও বিরোধীতাই যেন উপজাতীয় রাজনীতির চরিত্র। সন্তোষ, সম্মতি ও কৃতজ্ঞতা যেন তাদের কুষ্ঠিতে লেখা নেই। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেন তাদের লাখেরাজ সম্পত্তি। বন্দোবস্তি নিতে হবে না, খাজনা সালামী ও দিতে হবে না, এ দেশে আছেন, তাই তারা মহামান্য রাজা।

দফা নং-৪। পার্বত্য জেলায় মুসলিম অনুপ্রবেশ বন্ধ করা।

জবাব ঃ ১৯৪৭ সালের ভারত বিভাগের নীতিতে এটি বাংলাদেশের তথা মুসলমানদের প্রাপ্য অঞ্চল। স্থানীয় সংখ্যা গরিষ্ঠ অমুসলিম উপজাতিরা, হিন্দু ভারতের পক্ষাবলম্বী

হলেও, তা গ্রাহ্য করা হয়নি। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘটিত হলেও, তা দমিয়ে দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সুত্রে এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এতদাঞ্চলের অধিকারী। এদেশের ৮৪% লোক ধর্মতঃ মুসলমান। দেশ শাসন ও অধিকারের প্রশ্নে তারা সর্বোচ্চ অংশীদার। তবু রাষ্ট্রের উপর তারা একাদিকার প্রয়োগ করে না। ধর্মীয় আধিপত্য ও সাম্প্রদায়িকতা নয়, সহনশীরতা, সহাবস্থান ও উদারতাই তাদের আচরিত নীতি। দেশের ১০% অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম গঠিত। এখানে খাস সরকারী সম্পত্তির পরিমাণ আবাদী অঞ্চলের কয়েকগুণ বেশী। এই জাতীয় অঞ্চলে দেশের নব প্রজন্ম সহ ভূমিহীন ১০% লোকের পুনর্বাসন লাভের অধিকার অবশ্যই ন্যায্য। এই প্রশ্নে মুসলিম হওয়ার আপত্তি তোলা, ঘৃণ্য সাম্প্রদায়িকতা চর্চারই শামিল। জাতীয় খাস সম্পত্তিতে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দান রাষ্ট্রীয় কর্তব্য। এটা আপত্তিযোগ্য উপজাতীয় সম্পত্তি নয়।

দফা নং-৫। সিভিল প্রশাসন পুর্নাঙ্গরূপে কায়েম করা।

জবাব ঃ বিদ্রোহীদের অস্ত্র বিরতি ঘোষণার পর থেকে পূর্ণ বেসামরিক প্রশাসান চালু আছে। এটা অব্যাহত থাকা, বিদ্রোহীদের অস্ত্রবাজি না করার উপর নির্ভরশীল।

দফা নং-৬। নিহত উপজাতীয়দের ক্ষতিপূরণ প্রদান।

জবাব ঃ নিহতদের তালিকায় বাঙ্গালীদের সংখ্যাইবেশী। ঐ হত্যাকাণ্ডের দায়-দায়িত্ব অনেক সন্ত্রাসী শরণার্থী ও বিদ্রোহীদের উপর বর্তায়। ঘটনাগুলোর, সত্যাসত্য যাচাই ও দায় দায়িত্ব নির্ধারিত হওয়ার পরে, শাস্তি বা পুরষ্কার নির্ধারিত হওয়াই সঙ্গত। উপজাতিরা কি আইনের হাতে নিজেদের সোপর্দ করতে প্রস্তুত? তখন নিরাপরাধ ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতি পূরণ দাবী অবশ্যই ন্যায্য হবে।

দফা নং-৭। জমি সংক্রান্ত মামলাদির এক তরফা রায় বাতিল করা।

জবাব ঃ এটা অনির্দিষ্টঃ ভুয়া অভিযোগ। তবু এটা তদন্ত সাপেক্ষ ও মীমাংসা যোগ্য।

দফা নং-৮। শান্তিবাহিনী সন্দেহে ধর পাকড় বন্ধ করা।

জবাব ঃ এটা একটি ভিত্তিহীন ঢালাও অভিযোগ। এভাবে নির্বিচারে ধর পাকড় হওয়ার ঘটনা যথার্থ তথ্য নির্ভর নয়। এখন আনুমানিক ও পূর্বের ঘটনাবলীর জের টানা অনুচিত।

দফা নং-৯। ধর্মান্তর করণ বন্ধ করা।

জবাবঃ এটি ও একটি ভূয়া অভিযোগ। ধর্মমত প্রচার ও প্রসারে সরকার সম্পুর্ণ নিরপেক্ষ। ইসলাম সাংবিধানিকভাবে বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম হলেও, এতদাঞ্চলে তার প্রচার ও প্রসারে রাষ্ট্র বা সরকার কোন ভূমিকা পালন করে না। কার্যতঃ নীরবে নিভৃতে উপজাতীয় সমাজে খৃষ্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারই ঘটছে। তাতে বাধা দান সরকারের কর্তব্য নয়। বরং অতীতে উপজাতিদের দ্বারা মুসলমানদের ধর্মান্তর করণেরই বহু ঘটনা

ঘটেছে, যা প্রমাণিত সত্য, যথা ঃ চাকমা রাজা শের মস্ত খাঁ সহ ঐ পরিবারের পরবর্তী দেশ জন রাজা ও রাণী, নাম খেতাব ও আচরণে মুসলিম পরিচিত হলেও, রাণী কালিন্দির আমল থেকে ধর্মীয় পরিচিতি নাম ও খেতাব বদলে দেওয়া হয়েছে। দাজ্যা, চেক কাবা, সর্দার, মুলিমা ইত্যাদি গোত্র ও গোষ্ঠীগুলো মুলতঃ দাড়ি রাখা, খাতনা করা ইত্যাদি ইসলামী আচরণ সুত্রে মুসলমানই ছিলেন, কিন্তু তাদের বংশধরগণ এখন ধর্মান্তরিত বৌদ্ধ। ইসলাম ধর্ম পালনের জের হিসাবে এখনো ভগবান ও ঈশ্বরের প্রতিশব্দ হিসাবে চাকমারা 'খোদাম্ব শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানদের খেশ এর প্রতিশব্দ হিসাবে চাকমারা খিসা শব্দ ব্যবহার করে থাকেন। মুসলমানদের খেশ এর প্রতিশব্দ চাকমা উপাধি খিশা, যার অর্থ আত্মীয় বা কুটুম্ব। হেজাব, সতর, কবুল, তালাক, দোজখ, সালাম ইত্যাদি ইসলামী পরিভাষা চাকমা ভাষায় অঙ্গিভুত থাকায়, এটা ভাবার অবকাশ আছে যে, বিপুল সংখ্যক মুসলিম চাকমাকে একদা ধর্মারিত করার ফলেই বর্তমানে চাকমা সমাজ মুসলিম মুক্ত। তবে তাদের ভাষা মুসলিম ঐতিহ্য থেকে মুক্ত নয়।

দফা নং-১০। বিভিন্ন বাণিজ্যিক ও কৃষি ব্যাংক থেকে গৃহীত উপজাতিদের ঋণ মওকুপ করা।

জবাব ঃ এটা অর্থনৈতিক অরাজাকতার শামিল দাবী। পরিমানে এটা হবে সম্বতঃ হাজার কোটির অংক সম্বলিত। লোট, চাঁদা মুক্তিপণ অনুদানকে হিসাবে ধরা হলে, সাম্প্রতিক কালে বিদ্রোহী উপজাতীয় লোকেরা কয়েক হাজার কোটি টাকার সুবিধা ভোগ করেছে। তাতে বাঙ্গালীরা হয়েছে শোষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত। পরিস্থিতিগত কারণে লোট, চাঁদাবাজি ও সরকারী অনুদানের দ্বারা উপজাতীয় পক্ষে বিরাট অর্জন হয়ে গেছে। এখন ক্ষতিপূরণ ও রেয়াত প্রাপ্য বাঙ্গালীদের।

দফা নং-১১। উপজাতীয়দের পুর্ণাঙ্গ পুনর্বাসনে জাতিসংঘ, রেডক্রস, আইএলও এবং ভারত সরকারের প্রতিনিধিদের তদারকির দায়িত্ব প্রদান।

জবাব ঃ বিদ্রোহীদের নিজেদের সৃষ্ট সংঘাত সংঘর্ষ জনিত বিরূপ পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় উপজাতীয়দের কিছু লোক স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হয়েছে। বাংলাদেশ তাদের ন্যায্য প্রত্যাবাসনে সচেষ্ট। এ ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ ও তদারকি অনভিপ্রেত।

দফা নং-১২। ভারতের শরণার্থী শিবিরের স্কুলে অধ্যায়নরত উপজাতীয় ছাত্রদের পরবর্তী শ্রেণীতে পরীক্ষার সুযোগ দান।

জবাব ঃ এটা সহজ সমাধ্য বিষয়।

দফা নং-১৩। পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে অর্থবহ আলোচনা অনুষ্ঠান ও স্থানীয় পরিষদ আইন বাতিল করা।

জবাব ঃ আলোচনা অর্থবহ করার দাবী একমাত্র সংশ্লিষ্ট পক্ষ জনসংহতি সমিতির পক্ষেই

উত্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। অন্যদের এটা অনধিকার চর্চা। স্থানীয় পরিষদ আর আঞ্চলিক পরিষদের ব্যাপারটা ও বর্ণিত রাজনৈতিক আলোচ্য সূচীর অন্তর্ভুক্ত ভিন্ন বিষয়। এর সাথে শরণার্থী প্রত্যাবাসন সাম্পর্কিত নয়। প্রত্যাবাসন কার্যতঃ মানবিক বিষয়। এর সাথে রাজনীতি জড়িত করা দুর্ভোগ বাড়ানোরই নামান্তর।

৭। উপজাতীয় তত্বকথা।

বিষয়টির ধারণাগত বিশ্লেষণ আগে দেওয়া দরকার। উপজাতীয় লোকজন বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত সোচ্চার। দেশে বিদেশে বিভিন্ন মহলে এ নিয়ে উত্তপ্ত বিতর্ক বিদ্যমান। উপজাতীয় পক্ষের স্বতঃসিদ্ধ ধারণা হলো, পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের নিজস্ব এলাকা। বাঙ্গালীরা এখানে বগিরাগত। তাই বাঙ্গালীদের আগমন, বসবাস ও আবাসন গ্রহণ আপত্তিকর। সম্প্রতি মানবতাবাদী একটি ইউরোপীয় গোষ্ঠী, পার্বত্য চট্টগ্রামে ও ত্রিপুরায় তাদের তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে 'লাইফ ইজ নট আওয়ার্স' নামে একটি প্রতিবেদনমূলক পুস্তক ছেপে, উপজাতীয় দাবীর পক্ষাবলম্বন করে, আন্তর্জাতিক ভাবে ঘোলাটে পরিস্থিতি সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন। দেশেও সাধারণ থেকে গুণী জ্ঞানী পর্যন্ত প্রচুর লোক বিষয়টি নিয়ে প্রচুর বিভ্রান্তিতে আছেন। সবই ভুল তথ্য আর তথ্যহীনতায় আচ্ছন্ন। প্রকৃত তথ্য দুষ্প্রাপ্য নয়। তবু খুঁজে দেখার প্রয়াস নেই। সস্তা বুলিতে সবাই বিভ্রান্ত। বিতর্কটি অনভিপ্রেত। সহজভাবে এই জটিলতা কাটিয়ে ওঠার উপায়ও নেই। বিষয়টি ধারণাজাত, তাই এর প্রকৃত সমাধান অন্য কিছুতেও নেই। অস্ত্র, জোর জবরদস্তি, কঠোরতার প্রয়োগ, এখানে যথার্থ নয়। মানুষের মন মস্তিস্ক ও ধারণাকে তজ্জন্য সহায়ক তথ্য যোগাতে হবে। এই ক্ষেত্রে তথ্য হীনতা ও ভুল তথ্যই মারাত্মক। উপজাতীয় পক্ষের হাতে এতদাঞ্চলে তাদের আদি বাস সম্বন্ধে শ্রুতিকথা ও কিংবদন্তি ছাড়া কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য নেই। তাদের কিংবন্তিমূলক কাহিনী ও দাবীকে, অবিশ্বাস্য বলে প্রত্যাখ্যান করা হলে, তাকে অসঙ্গত বলাও যাবে না। বিপরীতে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ কম হলেও খাঁটি ও নির্ভরযোগ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলা হয়, উপজাতীয় দাবীগুলো ভুল ধারণাজাত ও হিংসা প্রসূত, এবং তাতে গ্রহণীয় যুক্তি নেই, তাহলে তাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়াও যাবে না। মনে হয় উপজাতীয় মহল যুক্তির চেয়ে হিংসার দ্বারাই অধিক প্রভাবিত। তাদের মাঝে উচ্চ শিক্ষিত পন্ডিতদের অভাব নেই। খুঁজে দেখলে পাওয়া সম্ভব যে, এতদাঞ্চলের মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ও তথ্যবহুল পুস্তকাদি লিখিত হয়েছে। সে সব লেখকগণের অনেকে আন্তর্জাতিকভাবে নির্ভরযোগ্য পন্ডিত বলেও স্বীকৃত, এবং ঐ পুস্তকগুলো ইতিহাস ও নৃতত্বের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে সুখ্যাত। ঐ লেখকও পুস্তিকাগুলোর অবদানের অনেকাংশ এই পর্বত্যাঞ্চল নিয়েই রচিত। সেই বিদেশী পন্ডিতদের প্রত্যক্ষ অনুসন্ধান, প্রত্ন নির্দশন, ও প্রাপ্ত পূরাকীর্তি সমূহের মাধ্যমে যে বাস্তব অতীত-চিত্র ফুটে উঠে, তা একাধারে নির্ভরযোগ্য ও নিরপেক্ষ। সে সব বর্ণনাকে অবলম্বন করে উপজাতীয় দাবীগুলো রচিত হলে, আপত্তির কিছুই থাকতো না। কিন্তু দুঃখ হয় আজগৌবী কথা কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়ায়। তাই বলতে ইচ্ছে হয় উপজাতীয় মহলের ইতিহাস মূলক বক্তব্যের মূল অত্যন্ত কাঁচা। তাদের এ দেশীয় আদি অধিবাস নিশ্চিত নয়। সব দাবীদাওয়ার আগে প্রথমেই প্রমাণ করতে হবে যে, তারা এদেশের আদি বাসিন্দা ও বিশুদ্ধ স্থানীয় ভূমিজ সন্তান। দক্ষিণ পূর্ব এশীয় ভাষা সংস্কৃতি আর ঐতিহ্য ধারণ করে, অধিকাংশ উপজাতি এখনও বিদেশী পরিচয় ধারণ করে আছেন। শত বছরের জন্ম মৃত্যু আর বসবাসেও তারা অবাংলাভাষী। তাতেই প্রমাণিত

হয় তাদের সাংস্কৃতিক রাজধানী দেশে নয় বিদেশে অবস্থিত। মন মানসিকতা ধ্যানে ও জ্ঞানে এখনও তাদের মাঝে বিজাতীয় যোগসূত্র অক্ষুণ্ন আছে। কথায় কাজে মননেও জন্মসূত্রে তাদের ভিন্নতা, ও দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় পরিচিতি, অম্লান ও পরিষ্কার। তাদের এদেশীয় পরিচয় আর আনুগত্য প্রশ্নাতীত হলে, তারা আমাদের স্বদেশবাসী, এটা নির্দ্বিধায় স্বীকার্য্য হতো। যাদের ব্যাপারে আমরা অধিক আগ্রহান্বিত, সেই চাকমা সম্প্রদায়কে নিয়েই গোল বেঁধেছে অধিক।

আমাদের ধারণা ছিলো, যেহেতু চাকমারা ইতিহাস ঐতিহ্যে আত্মীয়তায় আচার আভ্যাসেও ধর্মে-কর্মে অধিকতর ভাবে ভারত উপমহাদেশীয় চরিত্র সম্পন্ন, সুতরাং তারা চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রেও অধিকহারে, এ দেশীয় ভূমিজ সন্তানদের সাথে একাত্ম হবে। আঞ্চলিক বাংলা ভাষায় কথা বলা, আর বাঙ্গালীদের পোষাকী চরিত্রে আগাগোড়া সজ্জিত হওয়া সত্ত্বেও, তাদের বাঙ্গালী হওয়ার প্রতি অস্বীকৃতি, একটি ব্যতিক্রমধর্মী ব্যাপার। এই ধারণাগত পার্থক্য বাঙ্গালীতেও চাকমাতে মৌলিক তফাৎ সৃষ্টি করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা তাদেরকে একাত্ম ভাবলেও, তাতে তারা অস্বীকৃত। অধিকন্তু তারা অন্যান্য উপজাতিদের থেকেও পৃথক এক সম্প্রদায়। মানসিক কারণে তারা যেমন বাঙ্গালী হতে অস্বীকৃত, তেমনি ভাষাগত কারণে প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতি সমাজ থেকেও ভিন্ন। দেশ ও জাতির প্রতি এ কারণেই তাদের একাত্মতা ও আনুগত্য সন্দেহাতীত ভাবা হয় না। তাদের আচরণে, বাঙ্গালী আর উপজাতি সহ অবশিষ্ট দেশবাসী সন্দিহান। এ সন্দেহকে বাড়িয়ে তুলেছে, তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র প্রচেষ্টা। এ পরিস্থিতিতে অতীত ইতিহাস তুলে ধরা এ জন্য দরকার যে, তাতে তাদের হুশ ফিরে আসতে সহায়তা হবে। এ কথা জানিয়ে দেওয়া অত্যাবশ্যক যে, চাকমারা মূলতঃ আরাকান থেকে আগত বিদেশী। তাদের জাতীয়তার চেতনা ও মানসিকতা এখনও তাই ভিন্ন। বৃটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের ধরে রাখলেও, এদেশে তাদের বসবাস এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদিত নয়। এদেশের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের দ্বারা আনুষ্ঠানিকভাবে অণুমোদন লাভের পরেই এই বিদেশী শরণার্থীদের বংশধরেরা এ দেশে আইন সঙ্গত নাগরিকে পরিণত হবে। এখন তাদের আন্দোলনের প্রধান বিষয় হলো মূলতঃ এদেশীয় নাগরিকত্ব ও জাতিত্বে উত্তরণ, স্বায়ত্ত শাসন বা বাঙ্গালীদের চ্যালেঞ্জ করা নয়। প্রমাণ ভিত্তিক ইতিহাসের বিবরণে, একমাত্র কিছু ত্রিপুরা, মুন্ড শিকারী কুকি, আর মগ সমাজভুক্ত কিছু লোকই প্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম ও তার পার্শ্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে আগমন ও বসবাসের ঘটনার সাথে জড়িত। আর কোন উপজাতীয় লোকের এতদাঞ্চলের প্রচীন অধিবাসী হওয়া সমর্থিত নয়। অন্যান্য উপজাতীয়দের এতদাঞ্চলে আগমন নির্গমন ও বসবাস সর্বাধিক বৃটিশ আমলেরই ঘটনা।

তবে বগিরাগত উপজাতীদের মাঝে চামমাদের কিছু লোকের আগমনকাল মোগল আমলের শেষ সময় বলেই নির্ণীত হয়। ত্রিপুরা ও আরাকানের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত চট্টগ্রাম ও পূর্ববর্তী পাহাড় অঞ্চলে, বিভিন্ন সময়ে কুকি ও ত্রিপুরাদের রাজনেতিক আগমন নির্গমন ঘটেছে ও বসবাস সম্প্রসারিত হয়েছে। তবু তাদের খুব কম লোকই

এতদাঞ্চলে স্থায়ী পুনর্বাসন গ্রহণ করেছে। এখানে কৃষি কাজে ভূমি ব্যবহারকারী স্থায়ী ও প্রধান অধিবাসী হওয়ার গৌরব একমাত্র বাঙ্গালীদেরই প্রাপ্য। যদিও তখন লোক বসতি ছিলো বিরল, এবং অধিকাংশ পাহাড়াঞ্চল ছিলো অনাবাদী। কুকি মগ ও ত্রিপুরা বাদে অন্যান্য উপজাতিদের নাম পরিচয় আর অস্তিত্বের কথা সর্বাধিক বৃটিশ আমলেই গোচরীভূত হয়। ঐ আমলের শুরুতে দূরবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী বিভিন্ন উপ-জাতীয় লোকের এতদাঞ্চলে আগমন আক্রমণ ও তজ্জন্য অরাজকতা ঘটে। বার্মা ও আরাকানের পারস্পরিক সংঘর্ষের কারণেও বটে, বহিরাগমন ব্যাপক ও তরান্বিত হয়। এসব ঘটনার বিবরণ সেকালের সরকারী রেকর্ডপত্রে বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে, এবং তা নিয়ে অনেক মূল্যবান ঐতিহাসিক বই পুস্তক ও রচিত হয়েছে। পর্তুগীজ পন্ডিত জোয়াও ডে বারোজের ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি সময়ে অংকিত প্রাচীন বাংলার একটি মানচিত্রই সর্বাধিক প্রাচীন দলিল, যা চাকমাদের বহির্দেশীয় অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রথম তথ্য দান করে। অন্যান্য প্রাচীন তথ্যগুলো উপজাতীয় কিংবদন্তি থেকে গ্রহীত, এবং তা নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য নয়। তৎপর আমরা অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিনের গবেষণা নিবন্ধ 'অরিজিন অফ দি রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টসম্ব থেকে অবগত হইঃ জনৈক শের মস্ত-খাঁ-ই প্রথম ব্যক্তি, যিনি তদীয় অনুসারী কিছু চাকমা সহ আরাকান ত্যাগ করে ১৭৩৭ খ্রীঃ সালে মোগলদের অধীন চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসে আনুষ্ঠানিকভাবে পুনর্বাসন গ্রহণ করেন। তৎপূর্বে ১৭১১ খ্রীঃ সালে দক্ষিণ চট্টগ্রামের সীমান্ত অঞ্চলে, উপজাতীয় রাজা হিসাবে, জনৈক চন্দন খাঁ আবির্ভুত হোন, যার বংশধরদের শেষ ব্যক্তি জালাল খাঁ ১৭২৪ খ্রীঃ সালে অবাধ্যতার কারণে, মোগল শক্তি কর্তৃক আরাকানে বিতাড়িত হোন। চন্দন খাঁর বংশ ও তাদের উপজাতীয় অনুসারীদের পরিচয় পরিষ্কার নয়। তাদের সাথে চাকমা ও শেরমস্ত খাঁ বংশের সম্পর্ক থাকা অনিশ্চিত। উভয়ের আগমন ও নির্গমনকালের মাঝ খানে, তের বছরের এক ব্যবধান বিদ্যমান। মার্মা বা মগেরা নামেই বর্মী পরিচিত। ত্রিপুরা ও লুসাই জনগোষ্ঠী, ত্রিপুরা রাজ্য ও মিজোরাম থেকে আগত। চাকমাদের রাজা শের জব্বার খানের সীলমোহরই প্রমাণ, তারা সম্প্রদায়গতভাবে বৃটিশ আমলের পূর্ব পর্যন্ত আরাকানের অধিবাসী ছিলেন। চাকমা রাণী কালিন্দির একটি লিপিতে স্বীকার করা হয়েছে যে, তাদের আদি রাজা ছিলেন জনৈক শেরমস্ত খাঁ। একটি চাকমা ছড়া গানেও তাদের আদিবাস বিবৃত হয়েছে, যথাঃ-

'আদি রাজা শেরমস্ত খাঁ

রোয়াং ছিল বাড়ী

তার পর শুকদেব রায়

বান্ধেজমিদারী।ম্ব

সুতরাং এটা নিঃসন্দেহ যে, উপজাতীয়দের আদি বসবাস ক্ষেত্র পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়। তারা এতদাঞ্চলে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর। তাদের নাগরিকত্ব বা জাতীয়তা,

এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী হওয়া মঞ্জুর সাপেক্ষ। তারা বাঙ্গালী নয়, বাংলাদেশী ও নয়, মূলতঃ অস্থানীয় আর বিদেশী বংশোদ্ভুত।

আরাকানবাসী মগ ও চাকমাদের বিপুল সংখ্যায় স্বদেশ ত্যাগ ও চট্টগ্রাম সীমান্তের পাহাড়ী অঞ্চলে অশ্রয় গ্রহণের দ্বিতীয় ও প্রধান ঘটনার কাল হলো প্রাথমিক বৃটিশ আমল, যার বিশদ ও নিরপেক্ষ বিবরণ পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রথম জেলা প্রশাসক মিঃ টি এইচ লুইনের লেখনীতেই পঠনীয়, যিনি এতদাঞ্চল সম্পর্কীয় একজন প্রধান পন্ডিত যথা ঃ

``A greater porion of the hill tribes at present living in the Chittagong Hills undoubtedly came about two generations ago from Aracan. This is asserted both by their own traditions and by records in the Chittagong Collectorate. It was in some measure due to the erodous of our hill tribes from Arracan that the Burmese war of 1824 took place, which ended in annexation to Britsh territory of the fertile province of Arracan. As this is a point intersting not only from its local bearing on the hill tribes but also in a larger and more important historical sense. I shall trace here the way in which the dissensions between the English authorites. and the Burmese, which eventually culminated in war, hinged in a great measure upon refugees from the hill tribes who fleeing from Arracan into our territory, were pursued and demanded at our hands by the Burmese.

Among the earliest records that we have of our dealings with the Burmese are two letters, written one by the king of Burmah, the other by the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong and rrceived on about the 24th June 1787.

(Ref : The HILL TRACTS OF CHITTAGONG AND THE DWELLERS THEREIN Page 28/29)

বাংলা ঃ "উপজাতীয়দের যারা বর্তমানে চট্টগ্রামের পাহাড়াঞ্চলে বসবাস করছে তাদের অধিকাংশ প্রায় দুপুরুষ আগে আরাকান থেকে এসেছে। এটা তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য আর ঐ সব দলিলপত্রের দ্বারা প্রমাণিত যা চট্টগ্রামের রাজস্ব দপ্তরে সংরক্ষিত আছে। আরাকান থেকে উপজাতীয় লোক জনের পলায়ন হলো অন্যতম কারণ যদ্দরুণ ১৮২৪ খ্রীঃ সালের বর্মীযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিলো, যা বৃটিশ ভারতের সাথে উর্বর আরাকান প্রদেশের সংযুক্তির মাধ্যমে শেষ হয়। ঘটনাটি শুধু স্থানীয় পাহাড়ী উপ-জাতিগুলোর কারণেই নয়, বরং আরো গুরুতর ও ঐতিহাসিক কার্যকারণেও হৃদয় গ্রাহী। আমি এখানে

সে ব্যাপারগুলো চিহ্নিত করতে চাই, যদ্দরুণ বৃটিশ ও বর্মী কর্তৃপক্ষের মাঝে মত পার্থক্যের সৃষ্টি হয় ও যুদ্ধের পরিণতি লাভ করে, আর তা হলো, পাহাড়ী উপজাতিদের বিপুল সংখ্যায় আরাকান ত্যাগ, ও আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণ, যাদেরকে ফেরৎ চেয়ে বর্মী কর্তৃপক্ষ আমাদের সাথে যোগাযোগ ও দাবী উথাপন করেন।

বর্মীদের সাথে আমাদের যোগাযোগের সর্বাধিক প্রাচীন দলিল হলো দুম্বটি চিঠি, যার একটি বার্মার সম্রাট কর্তৃক, এবং অপরটি আরাকানের রাজা কর্তৃক, আমাদের চট্টগ্রাম অঞ্চলের প্রধানের কাছে লিখিহ হয়, যা সম্ভবতঃ ২৪শে জুন ১৭৮৭ খ্রীঃ তারিখে পাওয়া যায়। (সূত্র ঃ দি হিল ট্রাক্টস অফ চিটাগাং এন্ড দি ডুয়েলার্স দেয়ার ইন পৃঃ ২৮/২৯)

মিঃ লুইন অতঃপর আরাকানের রাজার চিঠি খানার পরিপূর্ণ ইংলিশ ভাষ্যের উদ্ধৃতি তুলে ধরে পুনরায় বলেনঃ

``This letter is explicit enough. The fugitives referred to are evidently men of the Chuckma and Mrung hill tibes, who to this day preserve the recollection of their ancestor's flight from Arracan, The persons in question were probably the chiefs of the clans. and driving of them from British trrritory would have been equivalent to expulsion of the whole clan. (Ref : do page 29)

বাংলা ঃ এই চিঠিখানা যথেষ্ট বিশদ। বর্ণিত পলাতকগণ প্রমাণিতভাবে পাহাড়ী উপজাতীয় চাকমা ও মুরুং সম্প্রদায়ের লোক, যারা এখনো তাদের পূর্ব পুরুষদের আরাকান ত্যাগের স্মৃকিকথা ধারণ করে আছে। বিতর্কিত ব্যক্তিগণ সম্ভবতঃ তাদের সমাজপতি, যাদেরকে বৃটিশ শাসিত অঞ্চল থেকে বিতাড়ণের অর্থ, গোটা সম্প্রদায়কেই বিতাড়ণ (সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ২৯)

এবার আরাকানের রাজার প্রদত্ত চিঠিখানা প্রণিধানযোগ্য যথা ঃ

``From the Rajah of Arracan to the Chief of Chittagong. Our territories are composed of five hundred and sixty countries and we heve ever been on terms of friendship The inhabitants of other countries willingly and freely trade with the countries belonging to us. A person named keoty habing absconded from our country, took refuge in yours. I did not however pursue him with a force but sent a letter of friendship on the subject desiring that keoty might be given up to me. You considering your own power and the extent of your possession refused to sent him to me. I also am possessed of extensibe country and keoty

in consequnce of his disobedient conduct and the strength and influence of my king's good fortune was destroyed.

Dumcan Chukma and Kiecopa lies Marring and other inhabirants of Arracan have now absconded and taken refuge near the mountains within your border and exercise depredations on the people belonging to both countries and they moreover murdered an Englishman at the mouth of the Naf, and stole away everything he has with him. Hearing of this I am come to your boundaries with an army in order to sieze them. because they have deserted their own country and disobedient to my King, exercise the profession of robber. It is not proper that you should give asylum to them or the other Moghs who have absconded from Arracan and you will do right to drive them from your country that our friendship may remain perfect and the road of travellers and merchants may be secured. If you do not drive them from your comtry and give them up. I shall be under the necessity of seeking them out with an army, in whatever part of your territories they may be. I send this letter by Mahammed Wassene. Upon recipt of it, either drive the Moghs from your country, or if you mean to give them an asylum, return me an answer immediately. (Page : 29)

বাংলা ঃ আরাকানের রাজা থেকে চট্টগ্রামের প্রধানের উদ্দেশ্যে ঃ

আমাদের রাষ্ট্রীয় এলাকা পাঁচশত ষাটটি দেশ নিয়ে গঠিত, এবং আমরা চিরকালই পরস্পরের সাতে সৌহার্দ্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আমাদের অধীন দেশ সমূহের অধিবাসীগ্ণের সাথে স্বেচ্ছায় আর অবাধে অন্য বিভিন্ন দেশবাসী ব্যবসা বাণিজ্য করে থাকে। কেওটি নামক জনৈক ব্যক্তি আমাদের দেশ থেকে পলায়ন করে আপনাদের আশ্রয় লাভ করেছে। আমি তাকে সসৈন্যে পশ্চাদ্ধাবন করছি না, তবে বিষয়টি নিয়ে একখানা বন্ধুত্বপূর্ণ চিঠি পাঠিয়েছি, এই আশায় যে, কেওটিকে ধরে অবশ্যই আমার হাতে তুলে দিবেন। আপনারা নিজেদের শক্তি আর অধিকারের বিবেচনায় তাকে আমার হাতে তুলে দিতে অস্বীকার করেছেন। আমিও একটি বিশাল রাজ্যের অধিকারী। কেওটি পরিণামে তার অবাধ্য আচরণ আর আমাদের রাজার সৌভাগ্যের শক্তি ও প্রভাব গুণে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যাবে।

ডোমকান, চাকমা, কায়কোপা, লাইচ, মেরিং ও অন্যান্য কিছু আরাকানী অধিবাসী, পালিয়ে গিয়ে আপনাদের সীমান্তভুক্ত পাহাড়াঞ্চলের আশেপাশে আশ্রয় নিয়েছে এবং

উভয় দেশের লোকজনের উপর উৎপীড়ণ চালাচ্ছে। অধিকন্তু তারা না৷ফ নদীর মোহনায় একজন ইংরেজকে হত্যা করে তার যথা সর্বস্ব লুট করে নিয়েছে। এটা শুনে আমি একদল সৈন্যসহ তাদেরকে পাকড়াও করার উদ্দেশ্যে আপনাদের সীমান্ত এলাকায় এসেছি। যেহেতু তারা নিজেদের স্বদেশ ত্যাগ করেছে। আমার রাজার প্রতি অবধ্য এবং দস্যু বৃত্তিতে লিপ্ত। সুতরাং তাদেরকে এবং ঐসব মগদেরকেও, যারা আরাকান থেকে পালিয়ে গেছে, আশ্রয় দান করা আপনাদের পক্ষে সমীচীন নয়। আপনারা তাদের সবাইকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলে সঠিক কাজই হবে। তাতে আমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন থাকবে, এবং পথিক ও ব্যবসায়ীদের যাতায়াত পথ নিরাপদ হবে। যদি তাদেরকে আপনাদের দেশ থেকে না তাড়ান ও ধরে হস্তান্তর না করেন, তাহলে আমি প্রয়োজনে আপনাদের দেশের যেখানেই তারা থাকুক না কেন, একদল সৈন্য নিয়ে ধরে আনতে বাধ্য হবো। আমি এই চিঠিখানা মোহাম্মদ ওয়াসেনকে দিয়ে পাঠালাম। এটি বুঝে পেয়ে, হয় মগ লোকজনকে আপনাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিবেন, নয়তো তাদেরকে আশ্রয় দেবার মতলব থাকলেও আমাকে যথাশীঘ্র প্রত্যুত্তরে জানাবেন। (সূত্র ঃ ঐঃ পৃঃ ২৯)

মিঃ লুইন পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ এভাবে বর্ণনা করেন যথা ঃ

These letters were received during the administration of Lord Cornwallis. They were followed up almost immediately by the entrance into our territory of a force of armed Burmese under the Sirdar of Arracan. The Chief of Chittagong in the same month of June, writes to the Governor General in Councl reporting this incursion and stating that he has declined to respond to the overtures of alliance until this armed force was withdrawn. At the same time he states that in his opinion the refugies should be driven out of British territory. He adds that these fugitives were persons of some consequence in Arracan, and reports further that a Chakma Sirdar, who had flied from Arracan, had been arrested and confined by him. He concludes by stating his opinion that this Sirdar and his tribe have no intention of cultivating the low lands in a peaceable manner but have taken up their abode in the hills and jungles for the convenience of plundering. Ten years before this in the year 1777. it appears from a letter dated 31 st May. from the Chief of Chittagong to the Honourable Waren, Hasting. Governor General that some thousands of hill men had come form Arracn into the Chittagong limits, having been offered encouragement

to settle by one Mr. Bateman, who was the chief governing officer there at that time. These migrations were evidently for a long time a rankling sore to the Burmese authorities and (Macfarlane's History of British India. Page 355,) recods that in .1795 a Burmee army of 5,000 men again pursued some rebellious Chiefs or as they called them robbes, right into the English District of Chittagong. These Chiefs who had taken refuge in our territories were eventually given up to the Burmese and tow out the three were put to death with atrocius tortures.

In 1809 Macfarlane recods that disputes continued to occur in the frontiers of Chittagong and Tipperah, but the organized forays into that territory hardly assumed any nerratitve definite form untill 1823 (Wilson's Narrative of the Burmese War page 25), when a rupture ensued, which led to the war of 1824. The primary cause, therefore of all these disturbence, rendering the Burmese apt to provoke and take offence, was undoubtadly the emigration to our hills of tribes hitherto subject to their authority.

The origin of the tribes is a doubtful point, Pemberton ascribes to them a Maloy descent. Colonel Sir A. Phayire considers two of the principal tribes of Arracan, who are also found in these hills to be of Myamma or Burmese extraction. Among the tribes themselves as record exists, save that of oral tradition, as to their origin. The Khyoungtha alone are possessed of a written language, thay have among them several copies of the Raja Wong, or History of the Kings of Arracan, but I have been able to discover no records whatever as to their sojourn and doings in the hills. The Tongtha, on the other hand posses no written character, and the languages spoken by them are simply to a degree expressin merely the wants and sensations of uncivilized life. The informationg obtainable as to their origin and past history is therefore naturally meager and unreliable (Page 32/33).

বাংলা ঃ এই চিঠিগুলো লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় পাওয়া। এগুলো পাওয়ার পর প্রায় সাথে সাথেই আরাকানের সর্দারের পরিচালনাধীন একদল সশস্ত্র কর্মী সৈন্য আমাদের

শাসনাধীন এলাকায় ঢুকে পড়ে। আমাদের চট্টগ্রামের প্রধান ঐ একই জুন মাসে বাধ্য হয়ে বড় লাটের উদ্দেশ্যে একটি প্রতিবেদনে এটা লিখে পাঠান যে, তাকে মৈত্রী রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে অবজ্ঞা করা হয়েছে যদ্দরুণ আগে সশস্ত্র সৈনিকদের প্রত্যাহার দরকার। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই অভিমতও ব্যক্ত করেন যে, শরণার্থীদের বৃটিশ অধিকৃত অঞ্চল থেকে অবশ্যই তাড়িয়ে দিতে হবে। তাতে তিনি এটাও যোগ করেন যে, উক্ত পলাতক লোকজন আরাকানে বহুবিধ দুষ্কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য দায়ী। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, জনৈক চাকমা সর্দার যিনি আরাকান থেকে পালিয়ে এসেছেন, তাকে তিনি নিজেই গ্রেফতার করে ধরে রেখেছেন। তিনি এই অভিমত ব্যক্ত করে স্বীয় বক্তব্য শেষ করেন যে, উক্ত সর্দার ও তার পরিচালনাধীন উপজাতীয় লোকদের নীচু ভূমিতে শান্তিপুর্ণ চাষবাদেও আগ্রহ নেই। তারা ইতোমধ্যে পাহাড়ে ও বনে আস্তানা গড়ে নিয়েছে যাতে লোট পাটের সুবিধা হয়। এর দশ বছর আগে ১৭৭৭ খ্রীঃ সালের ৩১ মে তারিখের আরেকটি চিঠি যেটি চট্টগ্রামের তদানিন্তন প্রধান কর্তৃক সম্মানিত বড় লাট ওয়ারেন হোষ্টিংসের উদ্দেশ্যে লিখিত হয়, তাতে আছে, কয়েক হাজার পাহাড়ী লোক আরাকান থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে এসেছে। তারা চট্টগ্রাম অঞ্চলের পূর্ববর্তী প্রধান প্রশাসক মিঃ বেটম্যান কর্তৃক পুনর্বাসন লাভের আশ্বাসে উদ্দীপ্ত। দেশ ত্যাগের এ জাতীয় প্রামাণ্য ঘটনাবলী বর্মী কর্তৃপক্ষের জন্য দীর্ঘদিন যাবৎ বিশেষ উদ্বেগের কারণ ছিল। মেক ফার্লেন লিখিত ইতিহাস পুস্তক ব্রিটিশ ইন্ডিয়াস্বর ৩৫৫ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে যে, ১৭৮৫ খ্রীঃ সালে আরেকবার ৫০০০ বর্মী সৈন্যের একটি বাহিনী কিছু বিদ্রোহী উপজাতীয় সর্দারদের যাদেরকে তারা ডাকাত বলে, বৃটিশ অধিকারভুক্ত চট্টগ্রাম অঞ্চলে পশ্চাদ্ধাবন করে। আমাদের এলাকায় আশ্রয় গ্রহণকারী ঐসব সর্দারদের কয়েকজনকে ধরে তখন বর্মীদের কাছে হস্তান্তর করাও হয়, যাদের মোট তিনজনের দু'জনকে ভীষণ উৎপীড়নের দ্বারা মেরে ফেলা হয়।

মেক ফার্লেন আরো উল্লেখ করেন, ১৮০৯ খ্রীঃ সালেও চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার সীমান্তে বিরোধ অব্যাহত ছিল। কিন্তু ১৮২৩ খ্রীঃ সালের পূর্ব পর্যন্ত সংঘটিত ঐসব সংঘাত সংঘর্ষ কমই সফলকাম হতে পেরেছে বা চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। (উইলসন্স লিখিত নেরেটিভ অব দি বার্মিজ ওয়ার পৃষ্ঠা ২৫)।

ঐ সময় সংঘটিত ঘটনাবালী ১৮২৪ সালের যুদ্ধকে অনিবার্য্য করে তুলে। দেখা যায়, এসব অশান্তির সূচক হলো এমন একটি কারণ, যা বর্মীদের ধৈর্য্যচ্যুত আর দোষ গ্রহণে বাধ্য করে। নিঃসন্দেহে সে কারণটি হলোঃ উপজাতীয় লোকদের স্বদেশ ত্যাগ করে, আমাদের পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ, যা তাদের কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত।

উপজাতীয় মৌলিকত্বের ব্যাপারটি সন্দেহপুর্ণ। পেম্বারটন তাদেরকে মালয়ী বংশোদ্ভুত বলে নির্ণয় করেন। কর্ণেল স্যার এ ফেইর অনুমান করেন, আরাকানের প্রধান যে দুটি উপজাতি, যাদের অনেককে এই পাহাড়াঞ্চলেও পাওয়া যায়, তারা মূলতঃ মায়াম্মা বা বর্মী লোকোদ্ভুত। উপজাতীয়দের নিজেদের মৌখিক পুরাকাহিনী ব্যতীত মুল জন্ম

বৃত্তান্তের কিছুই লিপিবদ্ধ আকারে প্রাপ্তব্য নয়। খিয়াংথা পরিচিত লোকদেরই কেবল লিখিত ভাষা আছে। তাদের কাছে বহুসংখ্যক 'রাজাওং' বা আরাকানের রাজাদের ইতিহাস নামক পুস্তিকা পাওয়া যায়।

কিন্তু আমি তাদের প্রবাস ও পর্বত বাসের জীবন বৃত্তান্তের উপর কোন তথ্যই অবগত হতে পারিনি। অপর পক্ষে 'টংথাম্ব নামীয়রা কোনরূপ লেখশৈলীর অধিকারী নয়। তাদের কথাবার্তা হলো কোন মতে চাতিদাকে ব্যক্ত করা, যা অসভ্য জীবনের অভিব্যক্তি। তাদের মৌলিকত্ব আর অতীত ইতিহাসের তথ্য স্বভাবতই অপ্রতুল আর অবিশ্বাস্য। (সূত্র ঃ ঐ পৃঃ ৩২/৩৩)

মিঃ লুইন ও কর্ণেল ফেইর আন্তর্জাতিকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত পুরাতাত্ত্বিক। তারা নিজেদের কর্মজীবনের দীর্ঘকাল পার্বত্য চট্টগ্রাম ও আরাকানে সরকারী দায়িত্ব পালনে ও তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যয় করেছেন। তাদের বর্ণনা গুলোকে নিরপেক্ষ ও নির্ভরযোগ্য ভাবা হয়ে থাকে। গত শতাধিক বছরেও তাদের বর্ণনা গুলো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন বা অসত্য প্রমাণিত হয়নি। খোদ উপজাতীয় পন্ডিতদের অকেনকে তাদের বর্ণনার সুত্র ধরেই নিজেদের অতীত অনুসন্ধানে অগ্রসর হতে হয়।

এটা নিঃসন্দেহ যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বাসী উপজাতিদের অধিকাংশ আরাকানী শরণার্থীদের বংশোদ্ভুত লোক, এদেশের আদি অধিবাসী নয়, এবং তাই তাদের জাতীয়তা আদি বাংলাদেশী হওয়া বিতর্কিত। উপজাতি সমুহের আগমন নির্গমন ও বসবাসের মৌলিক তথ্য তাদের সংরক্ষিত কিছু দলিল প্রমাণ নির্দশন ও চর্চিত গানের দ্বারাও প্রমাণিত হয়। তাতেও সমর্থন মিলে যে, তাদের অধিকাংশ বার্মা ও আরাকান থেকে আগত, এবং অবশিষ্টরা আসাম ও ত্রিপুরার অদিবাসী, যারা শরণার্থী ও প্রবাসী থাকা অবস্থায়, বংশ বৃদ্ধি ঘটিয়ে, বর্তমানে পার্বত্য চট্টগ্রামের বাসিন্দা। এই লোকজন এ যাবৎ অস্থানীয় আর বিদেশী বলে চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন না হওয়ায়, ধারণাগতভাবে তাদের নাগরিকত্বের বিতর্ক চাপা পড়ে গেছে। তাই নতুন প্রজন্মের উপজাতি আর বাঙ্গালীরা ও বটে, স্ব স্ব মৌকিত্বকে ভুলে আছে। উপজাতি সংক্রান্ত এতদাঞ্চলের প্রামাণ্য অতীত ঘটনাবলী গ্রন্থনা ও চর্চার অভাবে মারাত্মক তথ্য শূণ্যতার সৃষ্টি হয়েছে। যদ্দরুণ জ্ঞানী গুণী, সাধারণ আর সরকারী কর্তকর্তা কর্মচারীরাও বটে, এতদাঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসী নাগরিক হিসাবে মূল্যায়ন করে থাকেন। এই ভুল মূল্যায়নের ভিত্তিতেই উপজাতিরা বৈষম্য আর উৎপীড়ণের অভিযোগ উত্থাপনসহ, স্বায়ত্ত শাসনের দাবীতে সোচ্চার। অথচ অবিতর্কিত স্থায়ী নাগরিকদের পক্ষেই কেবল রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধার দাবী উত্থাপন করা সম্ভব। প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিদের জাতীয়তা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশী নয়। আনুত্যহীনতার কারণে বিহারী মুসলমানেরা বাংলাদেশে বিদেশী ঘোষিত। ঠিক অনুরূপভাবে প্রবাসী ও শরণার্থীদের বংশধর উপজাতিরা, রাষ্ট্রের প্রতি বিদ্রোহী হওয়ার কারণে, আনুষ্ঠানিকভাবে নাগরিকত্ব পাওয়ার অযোগ্য। তারা বিদেশী ঘোষিত হলে, আপত্তি করার কিছুই থাকে

না।

এই সাথে কিছু কর্তৃপক্ষীয় মূল্যায়ন বিবেচ্য, যথাঃ-

১। The Most reasonable accunt of their origin is that they are the products of unions between the Nowab Saista Khan's solder's and mogh women, and that the clan was formed within the last 200 years or so.

(Ref : Selection from the corespondence on the revenue administration of Chittagong Hill Tracts. pge-276)

বাংলা ঃ তাদের মৌলিকত্বের অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা হলো, তারা নবাব শায়েস্ত খাঁর সৈন্যবাহিনী ও মগ স্ত্রীলোকদের পারস্পরিক মিলনজাত প্রজন্ম। গত দুশত বছর বা অনুরূপ সময়ের ভিতরে তাদের বর্ন ও শাখা প্রশাখার উদ্ভব হয়েছে। (সুত্র পার্বত্য চট্টগাম রাজস্ব প্রশাসন সংক্রান্ত চিঠিপত্র সংগ্রহ পৃঃ ২৭৬)

২। The Chakma's are mongoloed race, probably of Arakanies origin. Though they have inter merried largely with Bengalies. They are divided in three subtribes. Chakma, Duingnak and Tanchangya. The Duingnak broken away from the main tribe a century ago and flied to Arakan, Of later years some have returned to cox's bazar sub-division of Chittagong districts, (Ref : Provincial Gazatteer of India Page 410/1941)

বাংলা ঃ চাকমারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীর লোক, সম্ভবতঃ আরাকানী মূল থেকে উদ্ভুত। যদিও তারা বাঙ্গালীদের সাথে ব্যাপকভাবে আন্তঃ বিভাহে আবদ্ধ, তবু তারা নিজেদের মাঝে তিন শাখা উপজাতিতে বিভক্ত যথা চাকমা, ডুইংনাক ও টঞ্চঙ্গ্যা। শতাব্দীকাল আগে ডুইং নাকেরা মূল সমাজ থেকে পৃথক হয়ে আরাকানে চলে গিয়েছিলো। কয়েক বছর আগে তাদের কিছু লোক পুনরায় চট্টগ্রাম জেলার কক্সবাজার মহকুমা এলাকায় ফিরৎ এসেছে।

(সূত্র প্রভিন্সিয়েল গেজেটিয়ার অফ ইন্ডেয়া পৃঃ ৪১০/১৯৪১)

৩। The tribes consider themselve descendants of emigrants from Bihar, who came over and setlled in this part in the days of the Arakanies kings. (Ref : An Account of Chittagong Hill Tracts, by S. H, Hutchinson Page 89)

বাংলা ঃ এই চাকমা উপজাতীয় লোকজন নিজেদেরকে দেশত্যাগী ঐ সব বিহারবাসীদের

বংশধর বলে মনে করে, যারা এই ভুখণ্ডে আরাকানী রাজাদের শাসনকালে আসে ও আবাস গড়ে তোলে। (সুত্র ঃ এন একাউন্ট অফ চিটাগাং হিলট্রাক্টস ঃ এস এইচ, হাচিনসনঃ পৃ-৮৯)।

৪। তখন এতদাঞ্চলে (আরাকানে) কিছু পশ্চিমা লোক বাণিজ্য উপলক্ষ্যে আগমন ও উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাদের অনেকের উপাধি ছিলো শেখ যা থেকে থেক বা স্যাক নামের উৎপত্তি হয়েছে।

(সুত্র ঃ জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল সংখ্যা ১৪৫/১৮৪৪ পৃঃ ২০১-২ কর্নেল ফেইর লিখিত প্রবন্ধ।)

৫। চাকমাগণ মগ নারী ও মোগল সৈনিকদের মিলনজাত বংশধর। সপ্তদশ শতাব্দীতে চাকমাদের অনেকেই মোগল ধর্ম গ্রহণ করে, তাদের অনুগত হয় এবং খোদ চাকমা প্রধানরা ও মুসলমানী নাম ও খেতাব ধারণ করেন। পরে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তারা হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শেষাবধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব প্রকট হয়ে ওঠে, এবং হিন্দু প্রভাব অন্তর্হিত হয়।

(সূত্র ঃ সেনসাস অফ ইন্ডিয়া ১৯৩১ ঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রসঙ্গ)

৬। চাকমাগণ আধা বাঙ্গালী। বস্তুতঃ তাদের পোশাক পরিচ্ছদ আর ভাষাটিও একজাতের বিকৃত বাংলা। এতদভিন্ন তাদের উপাধিসহ নামগুলিও এমন বাঙ্গালী ভাবাপন্ন যে, তজ্জন্য তাদেরকে বাঙ্গালী সম্প্রদায় থেকে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব।

(সূত্র ঃ (১) মিঃ জীম বীম সেন কমিশনার চট্টগ্রাম-এর চিঠি নং-২২৭ এইচ/তাং ৫, ৯, ১৮৭৯ ইং)

(২) চাকমা জাতির ইতিবৃত্তঃ বিরাজ মোহন দেওয়ান পৃঃ ১১)।

৭। প্রচলিত মগ জনশ্রুতিঃ কোন এক সময় চট্টগ্রামের জনৈক উজির আরাকান রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। পথিমধ্যে এক শুদ্ধাচারী ফুঙ্গী, উজির সাহেবকে আহারের নিমন্ত্রণ দেন। খাবার দিতে দেরী হওয়ায় উজির সাহেব জনৈক সৈনিককে তার কারন অনুসন্ধানে পাঠান। সৈনিকটি ফিরে এসে তাঁকে জানায় যে, ফুঙ্গী নিজের পা চুলাতে স্থাপন করেছেন ও তা থেকে আগুন জ্বলছে তাই দেরী। এই সংবাদে উজির সাহেব রাগান্বিত হয়ে চলে যান। ইতোমধ্যে ফুঙ্গী খাদ্যাদিসহ এসে দেখেন উজির সাহেব ও তাঁর সঙ্গীরা নেই। তাতে তিনি মনোক্ষুণ্ন হয়ে অভিশাপ দেন। পরিশেষে উজির সাহেব সসৈন্যে পরাজিত ও বন্ধি হন, চাকমারা তাদের মগ স্ত্রীজাত বংশধর।

বাংলাদেশের আদিবাসী ও উপজাতি।

খালেদা সরকার (১৯৯১-৯৬) দাবী করেছেন বাংলাদেশে কোন আদিবাসী নেই। এর বিপরীতে একদল অবাঙ্গালী সংখ্যালঘু নিজেদের আদিবাসী দাবী করে ১৯৯৪ সালকে জাতিসংঘের ঘোষিত আদিবাসী বর্ষ হিসেবে পালন ও সম্মেলন করেছেন। আবারও তজ্জন্য প্রস্তুতি চলেছে। এছাড়াও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও বই পুস্তকের আলোচনায় স্থানীয় অবাঙ্গালী সংখ্যালঘুদের ঢালাও ভাবে হয় উপজাতি না হয় আদিবাসী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। তাত্বিক ও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণের বিচারে এ বিতর্কটির মীমাংসা টানা আবশ্যক, নতুবা বিভ্রান্তির অবসান হবে না। এটা নিশ্চিত নয় যে আদিবাসী আর উপজাতি সংজ্ঞাটি কে কোন অর্থে ব্যবহার করছেন। এটা তাত্বিক বা শাব্দিক এ দুস্বসূত্রের যে কোন একক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে, এক সাথে দ্বৈত অর্থে নয়। তাত্বিক অর্থের আদিবাসী আর উপজাতি বাংলাদেশে আছে কি নেই, তা এখনো অবশ্যই গবেষণা ও মীমাংসা সাপেক্ষ বিষয়। নৃতাত্বিক পাশ্চাত্য পন্ডিত অধ্যাপক পিয়ের বেসানেত, স্বীয় বিখ্যাত পুস্তক ট্রাইবস অফ চিটাগাং হিল ট্রাকট্স-এর শুরুতেই মন্তব্য করেছেন ঃ

(ক) আমি পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এই রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের অংশ হিসেবে বিবেচনা করেছি। যে সব লোক সভ্যতার প্রভাব হতে দূরে সরে আছে স্বাভাবিকভাবে এই নৃতত্ব নীতি তাদের উপরই প্রযোজ্য। (সূত্র ঃ ভূমিকার শেষ প্যারার মধ্যাংশ)।

(খ) যদি কেউ আদিম অর্থে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম ভাবধারা বহন করে আজো যারা বেঁছে আছে তাদের বুঝায়। তাহলে এই পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদেরকে আদিম বলে বর্ণনা করলে সত্যের অপলাপ হবে। তারা সভ্য জগৎ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। বস্তুতঃ এরা অধিকাংশই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং এদের পারিবারিক গঠন পদ্ধতিও কিছুটা হিন্দুদের মত। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এরা অনেক দিন থেকেই সভ্য সমাজের প্রভাবে প্রভাবিত। (সূত্র ঃ প্রথম পরিচ্ছেদ প্রথম প্যারা)।

উপরোক্ত বক্তব্যের মাঝেই পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী অবাঙ্গালীদের আদিবাসী ও উপজাতিভুক্ত হওয়া, তথা তাদের স্থানীয় প্রাগৈহাসিক আদিম চরিত্র থাকা পরিষ্কারভাবে অস্বীকৃত হয়েছে। সভ্যতার অনুসরণ ও আদিম ভাবধারা পরিত্যাগ শেষে তাত্বিক অর্থে কারো পক্ষেই আদিবাসী আর উপজাতি থাকার দাবী করা ভুল। এ বক্তব্য অন্যান্য অবাঙ্গালীদের বেলায়ও খাটে। অস্থানীয়রা তো আদিবাসী হতেই পারে না।

বস্তুতঃ তাত্বিক অর্থের আদিবাসী ও উপজাতীয় লোকের বাংলাদেশের কোথাও থাকা নিশ্চিত নয়। যারা তা হওয়ার দাবী করছেন, তারা সভ্যতা গুণে গুণান্বিত ভিন্ন লোক। শাখাও সংখ্যালঘু অর্থে উপজাতি ও আদিবাসী আখ্যা গ্রহণকেও অবিতর্কিত ভাবা যায় না। এই অর্থে বর্ণিত সংজ্ঞা গুলোর ব্যবহার সর্বজন মান্য নয়। তাত্বিক অর্থের আদিবাসী ও উপজাতি সংজ্ঞাই সর্বত্র প্রচলিত। জাতিসংঘ কর্তৃক বিবৃত আদিবাসী সংজ্ঞার সাথেই স্থানীয় আদিবাসী দাবীদারগণ একাত্ম। অথচ তাত্বিক অর্থে তারা তা নন তারা অস্থানীয়। শাব্দিক অর্থে তারা স্বদেশীসংখ্যাগুরু বাঙ্গালীদের বিপরীতে গঠন, ভাষা ও চারিত্রিক ভিন্নতা গুণে স্থানীয়ভাবে শাখা বোধক উপজাতি আখ্যায়িত হতে পারেন। এটা

আদিবাসী সমার্থক সংজ্ঞা নয়।

অবাঙ্গালী স্থানীয় সংখ্যা লঘুদের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখেও বলা যায় যে, তাদের পক্ষে তাত্বিক অর্থে আদিবাসী ও উপজাতি পরিচিতি যুক্তিগ্রাহ্য হওয়া আবশ্যক। নতুবা এটা হয়ে থাকবে বির্তকিত।

এটা ও অনস্বীকার্য যে, এই গরীব দেশে দুঃখ দুর্দশা অভাব অসুবিধা ব্যাপক ও সার্বজনীন। বলা হয়ে থাকে ভূমিহীন লোকের সংখ্যা শতকরা ষাটেরও অধিক। নিরক্ষরদের সংখ্যা স্বাক্ষরদেরও বেশী। দারিদ্র্য সীমার নীচে পতিত মানবেতর মান সম্পন্ন ফকির মিসকিনদের সংখ্যা শতকরা আশির উপরে। অবাঙ্গালী সংখ্যা লঘুরাও বৃহৎ সংখ্যায় দরিদ্র, এবং তাদের সামগ্রিক সংখ্যা বাঙ্গালীদের তুলনায় শতাংশের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংখ্যা লঘুদের অভাব অসুবিধা, দুঃখ দুর্দশা পৃথক বা কারো আরোপিত কিছু নয়। এটা জাতীয় দুরবস্থার অংশ। যদি প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙ্গালীরা একাই সুখী সমৃদ্ধ হতো এবং এক তরফা শুধু সংখ্যা লঘুরা অবহেলিত আর বঞ্চিত হতেন, তাহলে তা তাদের প্রতি অবিচার জ্ঞান করা যেতো। এটা জানা কথা যে, বাংলাদেশে দুধ মধুর নহর বইছে না, আর একা বাঙ্গালীরা ও তা লুট করে খাচ্ছে না। চাকচিক্যময় কিছু শহর নগর আর ভাগ্যবানরা গোটা দেশ ও জাতির চিত্র নয়। ভূখা নাঙ্গা শ্রীহীন সাধারণ বাংলাদেশের চিত্র ভিন্ন, যা সেবা ও পরিচর্য্যার অপেক্ষায় ধুঁকছে। এমতাবস্থায় প্রত্যেকের কেবল নিজের দুঃখ আর বঞ্চনাকে বড় করে দেখা, সংকীর্ণতা আর এক পক্ষ দর্শিতারই শামিল। এই দৃষ্টিতে বঞ্চিত আদিবাসী ও দরিদ্র উপজাতি মানসিকতা একটি মেনিয়া। অনুরূপ খন্ড চরিত্র সম্পন্ন আরো অনেক মেনিয়া আমাদের অগ্র যাত্রাকে ব্যাহত করছে। প্রসারিত জাতীয় চেতনার মাধ্যমে এই রোগগ্রস্থতাকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। নতুবা এই মানসিক রোগ, গোটা দেশ ও জাতিকে পঙ্গু করে দিবে। আদিবাসী ও উপজাতি কারা? অন্যান্যদের তুলনায় তাদের সংখ্যা কতো? সম্পদ সম্পত্তি, আয় রোজগার শিক্ষা কর্মসংস্থান ইত্যাদির তুলনামূলক হিসেবে তারা কি বঞ্চিত? এ ব্যাপারে নিশ্চিত হতে গেলে, হতাশ হতে হবে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান তো এ তথ্যই দান করে যে, তাদের অধিকাংশ বাংলাদেশে সর্বাধিক অগ্রসর ও সুবিধাপ্রাপ্ত লোক। তাদের কারো কারো আকাঙ্খা হলো নিজেদের অধ্যুষিত অঞ্চলে একাধিপত্য লাভ। এই লক্ষ্য অর্জনে যুক্তি হিসেবে বাঙ্গালী অত্যাচারের কাহিনী বিবৃত হয়। কিন্তু তাদের নিজেদের দ্বারা যে বাঙ্গালীরা নিগৃহীত তা অবলীলায় চেপে যাওয়া হয়। এটাও এ যাবৎ চাপা ছিলো যে, কথিত উপজাতীয় অঞ্চলে বাস্তবে তাদের প্রাধান্য কৃত্রিম ও বৃটিশ কর্তৃক আরোপিত। তাদের অধিকাংশ হলো বহিরাগত। তদুপরি অভিবাসনের পক্ষে তাদের দ্বারা কোন আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়নি। এটা প্রশ্নের জন্ম দেয় যে, তারা অভিবাসন সুযোগ প্রাপ্ত প্রাচীন শরণার্থী বংশধর। আনুষ্ঠানিক নাগরিকত্ব তাদের দ্বারা এখনো অর্জিত হয়নি। ১/১৯০০ রেগুলেশনের অধীন রচিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ৫২ ধারা তাদেরকে অভিবাসনের সুযোগ দান করেছে। এই সুত্রে তারা আশ্রয় প্রাপ্ত বাসিন্দা। তবে শরণার্থী অভিবাসীর তকমা এখনো তাদের পরিচয়ের সাথে সম্পৃক্ত

আছে। যদি বাংলাদেশের বসবাস অর্থে বাঙ্গালীরা দাবী করে তারাই বাংলাদেশের চিরকালীন প্রধান বাসিন্দা, তবে তাই সঠিক হবে। পক্ষান্তরে তথাকথিত আদিবাসীদের সংখ্যা জাতীয় জনসংখ্যার অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। তারা বগিরাগত জনগোষ্ঠী, স্থানীয় নয়। তখন উক্ত দাবীটি কি যুক্তি ও তথ্যে খন্ডানো যাবে? প্রধান জনগোষ্ঠীকে বৈরী ও প্রতিপক্ষে পরিণত করে অনুবিক্ষনীয় সংখ্যালঘুদের নিজেদের রাজা উজির বানানোর বিদেশী মদদপুষ্ট আত্মম্ভরী এই প্রচেষ্টা সত্যিই দুঃখজনক।

সংখ্যালঘুরা এদেশের বৈচিত্র্যময় মানব সম্পদ। বাঙ্গালীরা তাদের সম্মান ও প্রীতিপূর্ণ আন্তরিকতায় স্বদেশী জ্ঞান করে। তাদের সাথে বাঙ্গালীদের কোন রূপ জাতীয় বৈরিতা বা ঘৃণা নেই। এমতাবস্থায় সংখ্যালঘুদের খামোখা ভয় ও হীমন্যতায় ভোগা উচিত নয়। তাদের ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা ও অস্তিত্ব কোন মতেই অবহেলিত নয়। এটা এ দেশের কারো কাম্য ও নয়। অনুরূপ সন্দেহ অবিশ্বাস সম্পূর্ণ অমূলক। তবে পৃথিবীটাই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। জীবনটাও সংগ্রামশীল। এই প্রতিযোগিতা ও সংগ্রামকে ভয় পেলে চলে না। হারিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে জয়ের সূচনা হয়। তলিয়ে যাওয়ার মাঝে সহযোগীর সহায়তার সংযোগ ঘটে। তাই সহযোগী সহযাত্রীদের প্রাচুর্য্যে ও প্রাধান্যে ঈর্ষান্বিত হতে নেই। বরং একেই নিজের অবলম্বন করে উন্নতির প্রয়াস চালাতে হবে। সংগ্রাম ও প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র জন্ম থেকে মৃত্যু আর ঘর থেকে বিশ্বের সর্বত্র বিস্তৃত। এটা সাফল্য ও বেঁচে থাকার অবলম্বন। এটা আপন পর সবার সাথে স্বদেশে ও বিদেশে সর্বত্র আচরণ বিধি। ঘন বসতির এই গরীব দেশে কাউকে বর্ধিত সুযোগ-সুবিধা দান, বা কারো জন্য কিছু সংরক্ষিত রাখার উপায় বা সংগতি কোনটাই নেই। পর্যাপ্ত সম্পদ সম্পত্তি ও উপায় উপকরণ না থাকাটাই মূল কারণ। মিলিত ভোগ দুর্ভোগে আমাদেরকে অভ্যস্ত হতে হবে। ক্ষুদ্র ও খন্ডিত স্বার্থ, আর গোষ্ঠী চিন্তা, এ ক্ষেত্রে উপযোগী নয়। পক্ষ বিপক্ষ নির্বিশেষে স্বদেশী জনতার সংস্থান সর্বক্ষেত্রে উন্মুক্ত রাখা ছাড়া উপায় নেই। মানুষের সংখ্যাস্ফীতি কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ধরে রাখা সম্ভব নয়। যদি মহাকাশের বিপর্যস্ত ওজন স্তর সত্যই প্রকৃতিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অব্যাহত রাখে, আর পরিবেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তখন বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্র তলে তলিয়ে গিয়ে কোটি কোটি লোককে ছিন্নমূল করে দিবে। সে সম্ভাব্য বিপর্যয়ে আমাদের সবাই উঁচু অঞ্চলসমূহে একত্রে নতুন করে ভাগে যোগে বসবাস করতে হবে। সুতরাং সুবিধাবাদ ও সংরক্ষণবাদ অনুকরণীয় নয়।

বিপক্ষ সংখ্যা লঘুদের নির্মূল করা বাংলাদেশের জাতীয় নীতি নয়। সংখ্যা লঘুদের প্রতি অত্যাচার এ দেশের সচেতন বিবেকবান লোক, চিরকাল ঘৃণা করেছেন এবং ভবিষ্যতেও তা বরদাস্ত করা হবে না। এটাই তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এ বিষয়ে বিদেশের মদদ গ্রহণ দেশের আভ্যন্তরীন বিসয়ে হস্তক্ষেপের শামিল। এটা পারস্পরিক সন্দেহ আর ভুল বুঝাবুঝির সহায়ক, সুতরাং অবাঞ্ছিত। উপজাতি আর আদিবাসী পরিচিতি নিয়ে আন্দোলন, বিভেদবাদী চিন্তারই ফসল। সন্দেহ করা হয়, এটাও বিদেশী মদদপুষ্ট কুমন্ত্রণার ফল। সংখ্যালঘুদের উচিত, তাদের স্বার্থ ও বাঁচার প্রতিটি আন্দোলনে স্বজাতি ও স্বদেশী বন্ধুদের উপর নির্ভর করা। স্বদেশে তারা মোটেও অসহায় নয়। বিদেশী

বংশোদ্ভুতএ পর্যন্ত তাদের বহিষ্কার ও বিতাড়নের কোন দাবী ওঠেনি, এবং তা সমর্থনও পাবে না। তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সংরক্ষিত। এতে সন্দেহ আর হীনমন্যতার কোন অবকাশ নেই।

উগ্র অসহিষ্ণু বিদেশী মনা অবাধ্য স্বাতন্ত্র্যবাদীদের উদ্দেশ্যে কিছু সত্য তথ্য উপস্থাপন করাও জরুরি। কারণ তাদের প্রচারিত বিভ্রান্তি থেকে অন্যদের মুক্ত রাখার এটাই উপায়। সত্য তথ্য অপ্রিয় হলেও এক্ষেত্রে তার প্রচার অপরিহার্য। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের ঘাঁটি হলো পার্বত্য চট্টগ্রাম ও গারো অধ্যুষিত কিছু অঞ্চল। এরা অকারণে অসন্তুষ্ট বিভ্রান্তপক্ষ। তাদের বিপক্ষে যৌক্তিক ও প্রতিরক্ষামূলক চিন্তা-চেতনা থাকা আবশ্যক।

গারোদের মূল জাতীয় অঞ্চল ভারতভুক্ত গারো পাহাড় এলাকা। তারা এতদাঞ্চলে ঐ তাদেরই সম্প্রসারিত অংশ। বাংলাদেশের আদি বসবাস বা প্রাচীন জীবন মানের সূত্রে এরা এখানকার আদিবাসী নয়। ইতিপূর্বে তারা নিজেদের উপজাতি জ্ঞান করতো। আজ উক্ত নৃতাত্বিক সংজ্ঞাটিও তাদের পক্ষে অনুপযোগী। অধুনা তারা সভ্য লোক ও নেহাত সংখ্যালঘু একটি অবাঙ্গালী সম্প্রদায়। রং ও গঠনে তারা মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত। বাঙ্গালীদের বিপরীতে এটা তাদের মাঝে প্রধান লক্ষ্যণীয় পার্থক্য। তাদের সাথে বাঙ্গালীরা দীর্ঘদিনের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে অভ্যস্ত। উভয়ের মাঝে কোন গুরুতর সাম্প্রদায়িক বৈরিতা নেই। তবে বিচ্ছিন্ন ও ব্যক্তি কেন্দ্রিক এবং কিছু যৌন সম্পর্ক ভিত্তিক ঘটনাবলী প্রায়ই ঘটে থাকে, যাকে সাম্প্রদায়িক ও জাতীয় নিপীড়ণমূলক পরিকল্পিত বৃহৎ কিছু ভাবার অবকাশ নেই। কোন সমাজ ও সম্প্রদায়ই এ রূপ অপ্রীতিকর বিচ্ছিন্ন ঘটনাবলী থেকে মুক্ত নয়। এটা জাতীয় অসন্তোষ ও বৈরিতার উদাহরণ রূপে চিহ্নিত হতে পারে না। তবে সুখের কথা যে, গারোরা এ পর্যন্ত কোন রূপ গুরুতর অসহিষ্ণুতায় মেতে উঠেননি। ষড়যন্ত্রমূলক উস্কানীতেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করে আছেন।

পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অশান্ত অঞ্চল। এখানে উচ্চাভিলাষী রাজনীতি, একদল লোককে বিদ্রোহী করে তুলেছে, এবং কিছু লোককে সুবিধা ভোগীতে পরিণত করেছে। বৃটিশ আমলে আরাকানী উদ্বাস্তুদের দ্বারা চট্টগ্রামের সীমান্তবর্তী পর্বতাঞ্চল ঘন অধ্যুষিত হয়ে পড়ে। তারা স্বদেশে ফেরত যায়নি, এবং পরিশেষে এখানেই অভিবাসন গ্রহণ করে। এটা পার্বত্য চট্টগ্রামের অবাঙ্গালী অধ্যুষিত হওয়ার ইতিহাস। তবে স্বল্প সংখ্যক কুকি, ত্রিপুরা মগ ও বাঙ্গালীরাই ছিলো-এর প্রাচীন বাসিন্দা। ত্রিপুরা ও মগ বাসিন্দারা ত্রিপুরা রাজ্য ও আরাকানের দখল অভিযানের সাথী হয়ে এতদাঞ্চলে এসেছিল। পরে বৃটিশ আমলে বহিরাগমনের মাধ্যমে তাদের স্বজাতীয়দের আরো সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। চাকমাদের স্বল্প সংখ্যক লোক জনৈক দলপতি শেরমন্ত খাঁর নেতৃত্বে সর্বপ্রথম ১৭৩৭ সালে চট্টগ্রামের দক্ষিণ বাঙ্গুনীয়ায় এসে অভিবাসন গ্রহণ করেন। পরে বৃটিশ আমলে তাদের বৃহদাংশ উত্তর আরাকান থেকে পালিয়ে আসেন। তাদের কেউ এতদাঞ্চরের আদি বাসিন্দা নন। এতদাঞ্চল এই বহিরাগত লোকজনের কারো মূল জাতীয় আবাস ভূমিও নয়। আচরণেও তারা সুসভ্য। সুতরাং তাত্বিক অর্থে এদের উপজাাতি আর আদিবাসী

হওয়া সঠিক নয়। তাদের আচরিত জুম চাষ পেশাই আদিমতার একমাত্র নিদর্শণ। এটাও আজকাল প্রায় পরিত্যক্ত।

ইতিহাস ও নৃতত্ব বিজ্ঞানের বিপরীতে কথা বলে লাভ নেই। তদ্বারা কেউ রাজা-উজির হতে পারবেন না। দেশও বাঙ্গালী দখল থেকে মুক্ত হবে না। এ দেশের বাঙ্গালী প্রাধান্য বিধিদত্ত। এর সাথে আপোস করে সুখ তালাস করাটাই, সংখ্যালঘুদের পক্ষে বাস্তব কাজ। এর বিরোধিতা করা বা পৃথক একাধিপত্যের দুরাশায় মেতে ওঠা, মানে স্রোতকে উজানে ঠেলার অপচেষ্টায় লিপ্ত হওয়া। তাতে ক্ষয়ক্ষতি হলেও, লাভের সম্ভাবনা নেই। আজকাল অস্ত্রবল নয়, জনবলই সাফল্যের হাতিয়ার। তাতে সংখ্যালঘুরা নয়, তাদের প্রতিপক্ষই বলিয়ান। বিদেশী মদদের দ্বারা-এর ক্ষতিপূরণ হওয়া অসম্ভব। ইতিহাস আর তত্ব-বিজ্ঞানও প্রধান পক্ষের সমর্থক।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন-বিধি ১৯০০ এর ভুল অর্থ ও ব্যাখ্যার রহস্য এখন উদঘাটিত হয়ে গেছে। আগে এটা বৃটিশের উপনিবেশ ছিলো। কিন্তু এখন এটা বাংলাদেশের দখলীয় উপনিবেশ নয়, অবিচ্ছেদ্য অংশ। অভিন্ন আইন ও প্রশাসনের আওতায় এটা পরিচালিত হবে। সমানাধিকার ও গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির ব্যত্যয় এখানে হতে পারে না।

১৯০০ সালের শাসন বিধি স্থানীয় অবাঙ্গালীদের ভূমিদাস করেছে, ভূমি মালিক নয়। ঐ আইন বলে তাদের কিছু লোক সর্দার আর মাতবর হলেও, তারা সরকারী রাজস্ব এজেন্ট, দাসানুদাস ও খয়েরখা। জেলা প্রশাসক তাদের পরামর্শ শুনতে বাধ্য নন। বরং তারাই জেলা পশাকের হুকুম তামিল করতে বাধ্য। সাধারণ লোকজন এদের সেবাদাস। তাদের বাধ্যতামূলক শ্রম দান অস্বীকার করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। বন্দোবস্তি আর ইজারা ছাড়া, তাদের পক্ষে বসবাস, কৃষিকাজ, পশু পালন, ও পশু চারণ নিষ্কর নয়। তাদের স্থানান্তর গ্রহণ অনুমোদনীয় নয়, বরং দ্বৈত কেপিটেশন টেক্স বা দ্বিগুণ মাথাপিছু কর আরোপ যোগ্য, এবং প্রতিটি লোক জুমিয়া গণ্য। জুমিয়াদের সর্দার ও মাতবরগণই গালভরা রাজা ও হেডম্যান নামে খ্যাত। আসলে এই আইনটি সম্পূর্ণভাবে জুমিয়া ও জুমভূমি শাসন বিধি, সাধারণ আইন নয়।

উল্লেখিত এই শাসন বিধির ৫১ ও ৫২ ধারায় কিছু তাত্বিক সংজ্ঞা ব্যবহার করা হয়েছে, যেগুলোর ভিতর দেশী, উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী সংজ্ঞাগুলো অন্তর্ভুক্ত আছে। এই সংজ্ঞাগুলোর বদৌলতেই স্থানীয় অবাঙ্গালী জনগোষ্ঠী নিজেদের এ দেশীয় স্থানীয় উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ী ভাবেন। কিন্তু আসলে এই ধারণা নির্ভুল নয়। আইন দুটি এখানে প্রণিধান যোগ্য যথা ঃ

পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধি ধারা ৫১। Expulsion of undesirables. If the Deputy commissioner is satisfied that the presence in the district of any person who not a native of the district is or may be injurious to the peace of good administration of the district. he

may for reasons to be recorded in writing. order such person, if he is within the district, to leave the district within a given time, or if he is out side the district forbid him to enter it.

বাংলা ঃ ধারা ৫১ অবাঞ্ছিত লোকদের বিতাড়ণ।

যদি জেলা প্রশাসক সন্তুষ্ট হোন যে, এ জেলার স্থানীয় বাসিন্দা নয়, এমন ব্যক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান, যা এ জেলার সুষ্ঠ শান্তি-শৃংখলার পক্ষে ক্ষতিকর, অথবা ক্ষতির সম্ভাবনা যুক্ত, তা হলে তিনি লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক ঐ ব্যক্তিকে যদি সে জেলার ভিতরে থাকে, তবে প্রদত্ত সময়সীমার ভিতর, এ জেলা ত্যাগ করতে, অথবা বাহিরে থাকলে, প্রবেশ নিষেধ করে, আদেশ জারি করতে পারবেন।

ধারা ৫২ ঃ Immigration in to the Hill tracts. Save as here in after provided no person other Than a chakma, mogh, or a member of any hill tribe, indigenous to the Chittagong. Hill tracts, The Lushai Hills the Aracan Hill Tracts or the State of Tripura shall enter or reside within the Chittagong Hill Tracts unless he is in possession of a permit granted by the Deputy Commissioner at his discretion.

বাংলা ঃ পর্বতাঞ্চলে অভিবাসন। নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি থাকা ব্যতিরেকে চাকমা মগ অথবা কোন পাহাড়ী উপজাতীয় সদস্য যে পার্বত্য চট্টগ্রাম, লুসাই পাহাড় আরাকান পর্বতাঞ্চল, অথবা ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী, এমন লোক ব্যতীত অপর কেউই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ ও বসবাস করতে পারবে না, যদি না তার কাছে জেলা প্রশাসকের বিচেনা বলে মঞ্জুরকৃত কোন অনুমতিপত্র থাকে।

৫১ ধারা মতে এ জেলার নেটিভ বা দেশী অথবা স্থানীয় নয়, এমন ব্যক্তি আইন শৃঙ্খলা ভাঙ্গার অপরাধে এ জেলায় নিষিদ্ধ ও বিতাড়িত হওয়ার যোগ্য। ৫২ ধারা মতে চাকমা ও মগ সম্প্রদায় সহ ঐ সব পাহাড়ী উপজাতিভুক্ত লোক এতদাঞ্চলে অভিবাসন পাওয়ার যোগ্য, যারা পার্বত্য চট্টগ্রাম লুসাই পাহাড় আরাকান পর্বতাঞ্চল ও ত্রিপুরা রাজ্যের আদিবাসী। অথচ বর্ণিত লোকেরা স্থানীয় আদিবাসিন্দা নয়। এটা অন্যায় সুযোগ দান।

৫১ ধারায় ব্যক্ত এ জেলার নেটিভ বা দেশী অর্থ হলো স্থানীয় স্থায়ী আদি বাসিন্দা, অভিবাসী বা বিদেশাগত লোক নয়। ৫২ ধারায় তিন শ্রেণীর লোককে অভিবাসনের সুযোগ দেয়া হয়েছে, যথা (১) চাকমা (২) মগ ও (৩) আদিবাসী। তৃতীয় ভাগে বর্ণিত আদিবাসীরা কোন সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত নয়। এখানে সাম্প্রদায়িক নামে চিহ্নিত চাকমা ও মগদের পাহাড়ী উপজাতি ও আদিবাসী বিশেষণ ভুক্ত করা হয়নি। বর্ণিত বাক্যে ওর বা অথবা শব্দ যোগের দ্বারা এই পরিচয় গত বিভক্তি টানা হয়েছে। সুতরাং হিল ট্রাকট্স ম্যানুয়েল বা পার্বত্য শাসনবিধি মতেও চাকমা ও মারমা নামীয় জনগোষ্ঠী

পাহাড়ী উপজাতি ও আদিবাসী স্বীকৃত নয়। এই দাবী, আইনটির ভুল ব্যাখ্যা প্রসূত। তত্ত্ব বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে ঐ সব লোকই উপজাতি ও আদিবাসী, যারা নিজ জাতীয় আবাস ভূমিতে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, আচার অভ্যাস নিয়ে জীবন-যাপনে অভ্যস্ত, যারাসভ্য ভাবধারা থেকে মুক্ত, আর আদিম ধারণাভুক্ত টাবু মানে ও টুটেমে বিশ্বাস করে এবং বসবাস সূত্রেও স্থানীয়। বলা যায় হাল আমলের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী কোন সংখ্যা লঘুই এই শ্রেণীতে পড়ে না। নিঃসন্দেহে তারা সভ্য সমাজের লোক, কোনক্রমেই পাহাড়ী উপজাতীয় লোক নয়। ত্রিপুরা ও গারোদেরও উক্ত শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। এরা শাব্দিক অর্থে শাখা জাতি তথা সংখ্যালঘু স্বীকার্য্য। আদি বসবাসের সুত্রে ও কখনো স্থানীয় আদিবাসী নয়। এই অভিবাসন আইনটির নিষেধাজ্ঞা স্বদেশী বাঙ্গালীদের প্রতিও প্রযোজ্য নয়। এরা বাংলাদেশী সূত্রে স্থানীয় আদিবাসিন্দা। বর্ণিত আইনে বাঙ্গালীদের কোন উল্লেখ ও নেই।

পরিশেষে আরেকটি প্রশ্নেরও জবাব দিতে হবে যে, বাংলাদেশে কি আদৌ কোন উপজাতিও আদিবাসী নেই? এর উত্তর হলো কিছু সাওতাল, বেদে, উত্তর বঙ্গীয় কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু, এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের বিলীয়মান জুমজীবী কুকি ও অন্যান্য বন্য পরিবেশবাসী কিছু ক্ষুদ্র সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী আদিবাসী পদবাচ্য । তবে নিসন্দেহে চাকমা, মগ ও ত্রিপুরারা এই দলভুক্ত লোক নয়। তারা মূলত অস্থানীয়। কোন স্থানীয় লোকের উপরই স্বদেশে অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন প্রযোজ্য নয়।

৯ • কিছু কথা কিছু প্রশ্ন।

সুত্র ঃ জার্মান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকায় অনুষ্ঠিত সেমিনারে রাজা দেবাশীষ রায় কর্তৃক উপস্থাপিত প্রবন্ধ, তাং ২রা জুন ১৯৯৫।

পার্বত্য চট্টগ্রামের কথা কাহিনী নিয়ে অজ্ঞতা ও বিভ্রান্তি প্রচুর। যারা লেখেন ও মতামত ব্যক্ত করেন তাদের অনেকের মাঝে কষ্টকর তথ্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা বিরল। অনেকের মাঝে কষ্টকর তথ্য উদঘাটনের প্রচেষ্টা নেই। রেডিমেড কিছু মনকাড়া বক্তব্যই তাদের প্রতিপাদ্য। আমিও এক কালে এখানকার আজগৌবী কথা কাহিনীতে বিশ্বাস করতাম। কিন্তু প্রচুর পড়া শোনা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এখন সন্দেহাতীত ভাবে জানতে পেরেছি যে, এখানকার উপজাতিদের পরিচয় সংক্রান্ত কথা কাহিনীর বৃহদাংশই অতিরঞ্জিত। প্রচারিত গল্প আর ধারণার বাহিরেও কথা আছে। রং গঠন পরিবেশ ও জীবন-যাপনের পৃথক এক চমৎকারিত্বই প্রাথমিকভাবে আমাদের আচ্ছন্ন করে দেয়, যদ্দরুণ আমরা এতদাঞ্চল ও তার উপজাতীয় অধিবাসীদের সম্বন্ধে ভাবালু হয়ে পড়ি। একটানা দীর্ঘদিন পর্যবেক্ষণ ও বসবাস না করা পর্যন্ত, সে ভাবালুতা কাটে না। অন্য অনেকের মত এ ধারণা আমার ও বদ্ধমূল ছিলো যে, এতদাঞ্চল মূলতঃই উপজাতীয় আদি বসবাস অঞ্চল, এবং এখানকার কথিত রাজারা প্রকৃতই বংশানুক্রমিক রাজ্যাধিপতি। এখানে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন মানে মানব আগ্রাসন। কিন্তু ক্রমে আমার এ ধারণায় ফাটল ধরেছে।

তথ্যানুসন্ধ্যানী ইতিহাস পাঠকদের এ কথা জানা সম্ভব যে বৃটিশদের হাতে সাবেক ভারতের মোটামুটি ৫৬৫টি দেশীর রাজ্যের পতন ঘটে। তাদের স্বাতন্ত্র্য ক্ষমতা ও মর্যাদার প্রশ্নে চুক্তিপত্র, সনদ অঙ্গিকারপত্র ইত্যাদি প্রদত্ত হয়। ঐ দেশীয় রাজ্য সমূহের তালিকায় নিকটবর্তী অঞ্চলের ত্রিপুরাও ছিলো। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলভুক্ত কোন দেশীয় রাজ্যের অস্তিত্ব তাতে স্বীকৃত নয়। তবু বিস্ময়কর হলো ঃ এতদাঞ্চলে তিনটি রাজ পরিবার আছে। তাদের দীর্ঘ রাজত্ব আর রাজকীয় ঐতিহ্যের কথাও শোনা যায়। এই সুত্রে চাকমা প্রধান মাননীয় দেবাশীষ রায় ৪৮তম চাকমা রাজা। এভাবে মাং ও বোমাং বংশীয় অপর দু দল রাজাও আছেন। এরা খান্দানী সম্মানিত ব্যক্তি। তারা সবার কাছে নমস্য। কিন্তু এখানে রাজনীতি, ও ইতিহাসের প্রশ্ন জড়িত। তাই এই রাজ তথ্যের মূল তালাস করা ছাড়া উপায় নেই। এখানে প্রথম প্রশ্ন হলো ঃ তাদের কেউ কি আদিতে এতদাঞ্চলের কোথাও কোন স্বাধীন রাজ্য বা রাজত্বের অধিকারী ছিলেন, না তারা উপাধিপ্রাপ্ত সামন্ত রাজা? তাদের এই উপাধিটির সুত্র কী? ১৯০০/১ রেগুলেশন ভুক্ত পার্বত্য চট্টগ্রাম শাসন বিধির ধারা নং ৩৫/৩৮/৩৯/৪০/৪৮ ইত্যাদিতে বর্ণিত ক্ষমতা মর্যাদা ও উপাধির তালিকায় এই রাজা উপাধিগুলোর স্বীকৃতি নেই। তবে এর একটা ক্ষীণ আভাস নিম্নোক্ত চিঠিতে ব্যক্ত আছে যথা ঃ

"The Rajas of the Chittagong Hill Tracts were originally appointed by the suffrage of the Jhoomias Kukces and other inhabitants, and not by the sovcreign of the country as usual.

Ref : Revinue letter no 1499 dated 10th 1866.

বাংলা ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজাগণ, দেশের কোন সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের দ্বারা নিযুক্ত স্বাভাবিক রাজা নন, তারা মূলত ঃ সাধারণ জুমিয়া কুকিও অন্যান্য অধিবাসীদের দ্বারা মান্য রাজা। সুত্র ঃ রাজস্ব চিঠি নং ১৪৯৯ তাং ১০ সেপ্টেম্বর ১৮৬৬।

এখন আপত্তির বিষয় হলো ঃ এই রাজা উপাধির অবাধ ব্যবহারের আড়ালে, এ সাধারণ ধারণাটি লোক্কায়িত আছে যে, এতদাঞ্চল আদতে এক প্রাচীন উপজাতীয় রাজ্য এবং বাঙ্গালীরা এখানে হালের বহিরাগত আগ্রাসী লোক। ঠিক এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে, রাজা বাবু দেবাশীস রায়ের উপরোক্ত সেমিনারের বাক্তব্যে যথা ঃ

The hilly regeon of the Chittagong Hill Tracts in south eastern Bangladesh is the ancestral home of numerous indigenous people.

বাংলা ঃ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো, বহু সংখ্যক আদিবাসী লোকের প্রাচীন পৈতৃক স্বদেশ। (সুত্র ঃ ঐ সেমিনার পত্র)।

এই বক্তব্যে বাঙ্গালী আদিবাস ও বাংলাদেশের প্রাচীন ভৌগোলিক অখন্ডতার স্বীকৃতি

নেই। এখন দেখা দরকার উপরোক্ত বক্তব্যের তথ্য নির্ভরতা কতটুকু। বাস্তবে এখনকার পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো মূল চট্টগ্রামেরই পর্বতময় পূর্বাঞ্চল, যা প্রশাসনিক প্রয়োজনে ১৮৬০ খ্রীঃ সনে পৃথক করা হয়েছে। পৃথক হওয়ার আগে স্থানীয় উপজাতীয় অধিবাসীরা প্রতিবেশী সংখ্যালঘু রূপে পরিচিত ছিলো। আর এখনো এতদাঞ্চল পার্বত্য বিশেষণসহ চট্টগ্রাম নামেই আখ্যাযিত হয়। পেশাগতভাবে চিরকালই উপজাতিরা জুমচাষী, তাই তারা পাহাড়াশ্রয়ী, আর বাঙ্গালীরা লাঙ্গল চাষী তাই তারা সমতলবাসী। এই মৌলিক পেশাগত পৃথক অবস্থানের অর্থ উভয়ের মাঝে অঞ্চল বা দেশ ভাগ নয়। তাই কখনো পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী বর্জিত উপজাতীয় অঞ্চল, আর চট্টগ্রাম উপজাতি বর্জিত বাঙ্গালী অঞ্চলের পরিণতি লাভ করেনি। এই অর্থে বিভক্তি ও ঘটেনি। আগের আদম শুমারী গুলো পরীক্ষা করে দেখা যায়। সংখ্যা ও তার অস্বাভাবিক হ্রাস বৃদ্ধি সত্বেও, পার্বত্য অঞ্চল কদাপিও বাঙ্গালী মুক্ত ছিলো না, এবং চট্টগ্রামে ও উপজাতিদের বসবাস ছিলো। শুধু সাময়িক সংখ্যাধিক্য ঘটাতেই বাঙ্গালী ভূমি বা উপজাতীয় ভূমি নামে কোন অঞ্চল আখ্যায়িত হতে পারে না। প্রাথমিক ভাবে যখন পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল, তখনো চাকমা রাজবাড়ী ও সদর দপ্তর ছিলো চট্টগ্রামের অধীন রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে। এ হিসাবে রাজ পরিবার হলেন চট্টগ্রামী। তা ছাড়াও অধিকাংশ উপজাতি এতদাঞ্চলের আদি বাসিন্দা নন। মোগল আমলের শেষে জনৈক শের মস্ত খাঁর নেতৃত্বে একদল চাকমা সর্ব প্রথম, তাদের স্বদেশ আরাকান ত্যাগ করে, দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়া অঞ্চলে এসে অভিবাসন গ্রহণ করেন। আদি চাকমা রাজা নামধেয় ঐ শের মস্ত খাঁই, দেবাশীষ বায়ের এ দেশীয় আদি পূর্ব পুরুষ। স্বল্পসংখ্যক চাকমা ঐ আদি অভিবাসন কাল হালো ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দ সাল। তৎপর ও গোটা বৃটিশ আমল জুড়ে, অধিকাংশ চাকমা ও অন্যান্য উপজাতির অবাধ বহিরাগমন, ও এতদাঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে। শাসক বৃটিশরাই উপজাতিদের অবাধ বগিরাগমন, ও এতদাঞ্চলে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটিয়েছে। শাসক বৃটিশরা এতদাঞ্চলে বহিরাগত উপজাতিদের অবাধ অভিবাসনে ছিলেন উদার। তারা স্থানীয় ভাবে উপজাতিদের সংখ্যাধিক্য গড়ার উদ্দেশ্যে বাঙ্গালী বসবাস ও আবসনকে নিরুৎসাহিত আর বাধাগ্রস্ত করেন। জারি হয় অভিবাসন সুযোগ সুবিধা সম্বলিত উপজাতীয় আধিপত্যবাদী আইন, এবং তাদের সর্দারী ও মাতবরীর প্রথা। ধারা নং ৫১ হলো বাঞ্ছিত নয়, এমন সব লোকদের বিতাড়ন আইন, এবং ধারা ৫২ হলো অভিবাসন প্রদান আইন, যে আইনে প্রকাশ্যে অস্থানীয়দের অবাধ অভিবাসন মঞ্জুর, আর দেশীয় ভিন্ন সম্প্রদায় ও সমাজের লোকদের প্রবেশ ও বসবাস নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ঐ আইনের বৈধতা শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু উপজাতীয় সর্দার মাতবর ও রাজনীতিকরা অব্যাহত রাখতে চান তাদের অর্জিত সংখ্যাধিক্য আর আধিপত্য। তারা বাঙ্গালী প্রতিবেশীদের প্রতি অনুদার। একটি বারও রাজা থেকে প্রজা পর্যন্ত উপজাতীয় কারো মুখে বাঙ্গালী অধিকারের স্বীকৃতির কথা শোনা যায় না। তাদের মুখে এ কথা বলা শোভন হতো যে, এতদাঞ্চল একা উপজাতিদের নয়, বাঙ্গালীদেরও স্বদেশ ভূমি। উভয়ের শান্তিপুর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা ভোগের শরিকানায়, পাহাড়ী বাঙ্গালী ভেদাভেদ ও প্রতিহিংসার দ্রুত অবসান হওয়া আবশ্যক।

এই বিভেদ বিসম্বাদ ও চিন্তার পরিণতি হবে, বাঙ্গালীদের ও একজন রাজা বানাবার দাবীতে সোচ্চার হওয়া, অথবা তাদেরও একটি সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তোলা। কারণ তারা আজ মুরব্বীহীন, মুখপাত্রহীন, অস্ত্র-বন্দি, বলতে গেলে ও উপজাতি নামে সমাজচ্যুত ও নির্বাসিত। তারা এই অসহায় বন্দি দশা থেকে মুক্তি চায়।

রাজা বাবু আপনি ও বাঙ্গালীদের নেতা হতে পারতেন। আপনার পূর্ব পুরুষ শেরমস্ত খাঁ থেকে ধরম বখশ খাঁ পর্যন্ত একাদিক্রমে দশজন চাকমা প্রধানই মুসলিম ঐতিহ্যের অধিকারী। রাজকীয় সীল মোহর গুলো পর্যন্ত আরবীতে লেখা। তাতে আল্লার প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত। এই আনুকূল্যে আপনার বাঙ্গালী সমর্থন আকর্ষণের সুযোগ ছিলো যথেষ্ট। বিস্ময়কর ভাবে রাজা নগরবাসী বাঙ্গালীরা এখনো আপনাকে সহ পুর্ববর্তী রাজাদের নিজেদের রাজা জ্ঞান করেন। এই বাঙ্গালী অনুভূতিকে, একমাত্র চাকমা ও উপজাতীয় পক্ষপাতিত্বের দ্বারা ক্ষুণ্ন করা দুঃখজনক।

ক্ষতিপূরণ দানের মাধ্যমে বাঙ্গালী প্রত্যাহারের প্রস্তাবটি উপস্থাপন করে আপনি এতদ সংক্রান্ত জন সংহতি সমিতির দাবীরই প্রতিধ্বনি করেছেন। আপনার এ ধারণাও সঠিক নয় যে, ক্ষতিপূরণের টাকা হাতের মুঠোয় পেয়ে আবাসিত বাঙ্গালীরা এতদাঞ্চল থেকে প্রত্যাহৃত হবে। আপনি এই বর্ণনায় বাঙ্গালীদের উপজাতীয় জায়গা জমির জবর দখলকার বানিয়েছেন। ভোরের কাগজ ও সেমিনারের বক্তব্যে আপনার একদসংক্রান্ত উপস্থাপনা আরো বিশদ ও পরিষ্কার। কিন্তু বর্ণনাটি পক্ষপাত দুষ্ট। ভেবে দেখা উচিত, বাঙ্গালী প্রত্যাহার ও প্রত্যাবাসন, কোন সরকারী আদেশ নিষেধের দ্বারা কার্যকর করা কখনো সম্ভব নয়। কোটি কোটি বেকার ও ভূমিহীন বাঙ্গালীর জনস্রোত নিয়ন্ত্রণ করা ও এতদাঞ্চলকে একমাত্র উপজাতীয় অঞ্চল রূপে সংরক্ষিত রাখা, বাস্তবে নয় কল্পনায়ই সম্ভব। বাস্তব হলো উভয়কে সহ অবস্থান করতে হবে। এই সহাবস্থানকে শান্তিপুর্ণ করার উপায় নিয়েই ভাবা দরকার। যা অসম্ভব তা নিয়ে শক্তিক্ষয় সংগ্রাম ও ভাবনা চিন্তায় কোন লাভ নেই। সংঘর্ষ সংঘাতে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র উপজাতীয় সমাজেরই ক্ষতি হবে দেশী। বাঙ্গালীর এক বছরের প্রজন্ম সংখ্যায় উপজাতিদের চারগুণেরও বেশী হবে। নৃশংসতার দ্বারা বাঙ্গালী সম্প্রসারণকে বাগে আনা উপজাতিদের পক্ষে সম্ভব ভাবা ঠিক নয়। পরিবর্তে বাঙ্গালী নৃশংসতারই জন্ম হবে। সে হানাহানিতে সংখ্যায় কম ক্ষতিগ্রস্ত হলেও, উপজাতিদের অস্তিত্ব হবে বিপন্ন। তাই হিংস্র প্রতিযোগিতা ও মোকাবেলার নীতি হবে বিপজ্জনক। বিবেকবান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের সপক্ষচিন্তা ত্যাগ করে, মিলন ও সহযোগিতার প্রশ্নে অবদান রাখা উচিত। আজ এতদাঞ্চলে এমন একটা সার্বজনীন শান্তি আন্দোলনের উদ্ভব ঘটানই আবশ্যক, যা পাহাড়ী বাঙ্গালীদের এক কাতারে এনে দাঁড় করাবে। সবাই ভাববে আমরা মানুষ। সমান অধিকার ও সুবিধা নিয়ে সবাইকে প্রতিবেশী হয়ে বাঁচতে হবে। সংঘাত হিংসা ও প্রতিযোগিতা নয়, সম্প্রীতি ও সহযোগিতাই হতে হবে জীবন-যাপনের মূলমন্ত্র। পক্ষপাতিত্ব, উস্কানী, আর বাড়াবাড়িতে এ পর্যন্ত ক্ষতি ছাড়া উপকার হয়নি। এ পথ পরিত্যাজ্য। শান্তি স্থাপনে অগ্রণী ভূমিকা রাখার সুযোগ সমাজপতিদেরই বেশী। এই সম্ভাব্য শান্তি আন্দোলনের

ভিত্তি ভূমি হবে এতদাঞ্চল, আর ভুক্তভোগী জন সাধারণকেই হতে হবে তার সমর্থক পক্ষ। তবে সমাজ মান্য ব্যক্তিদেরই নিতে হবে এর নেতৃত্ব। ঐতিহ্যগতভাবে উপজাতীয় রাজপুরুষদের সে সার্বজনীন গ্রহণ যোগ্যতা আছে। তাই রাজা বাবুর পক্ষে সংকীর্ণ উপজাতীয় মুখপাত্রের ভূমিকা গ্রহণ বাঞ্ছিত নয়। বাঙ্গালীরা সম্ভাব্য নিরপেক্ষ শান্তি উদ্যোগকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। তবে তার লক্ষ্য হতে হবে, শান্তি, সহাবস্থান ও সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা। সেমিনারে উপস্থাপিত বক্তব্যে রাজা বাবুর প্রতিপাদ্য হলো ঃ পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা অভিবাসী আর তারা উপজাতীয় লোকদের জায়গা জমির জবর দখলকার। বক্তব্যটি তথ্য নির্ভর নয়, পক্ষপাতদৃষ্ট। বন্দোবস্তি ছাড়া জায়গা জমির স্বত্ব অনন্তকাল স্বীকার্য্য নয়। বিদেশের মাটিতে পুনর্বাসন গ্রহণকেই অভিবাসন বলে। মূল ইংলিশ শব্দ ইমিগ্রেশনের এটি বাংলা প্রতিশব্দ। পার্বত্য চট্টগ্রামের বাঙ্গালীদের আবাসন গ্রহণকে অভিবাসন বলা যায় না। এটি তাদের স্বদেশের ভিতর স্থানান্তর মাত্র। বরং উপজাতিদের বলা যায় অভিবাসী। তাদের মূল পিতৃ ভূমি সীমান্তের বিপরীতে বিদেশে অবস্থিত। রাজা বাবুর নিজ উর্ধ পুরুষ রাজা ভুবন মোহন রায়ের লিখিত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস পাঠে, ও চাকমা লোক কাহিনী শ্রবণের মাধ্যমেও অবগত হওয়া যায়, তাদের মূল পিতৃভূমি অজ্ঞাত এক চম্পক নগর। বাংলাদেশে আগমনের আগে তাদের আবাস স্থল ছিলো আরাকান। দ্বিতীয় প্রধান উপজাতীয় জনগোষ্ঠী ত্রিপুরাগণ ও সন্দেহাতীতভাবে সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী মগেরাও আরাকান বাসী। এখানে অন্যান্যের কথা উল্লেখ যোগ্যই নয়। এই বহিরাগত লোকজনকে ভৌমিক অধিকার দেওয়ার উদ্দেশ্যেই হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের অভিবাসন নামীয় ৫২ ধারাধীন আইনটি জারি করা হয়েছিলো। এটিকে বাঙ্গালীদের অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ আইন বলা ভুল। এরা অভিবাসী নয়। উপজাতীয়দের চেয়ে অধিক অনুন্নত পশ্চাদপদ বাঙ্গালী নামধেয় কোটি কোটি অপগন্ড মানুষ এদেশেরই বাসিন্দা হয়ে আছে। অধিকন্তু উপজাতীয় আখ্যাটিও অযৌক্তিক। প্রতিবেশী দেশ সমূহে তাদের জাত ভাইরা উপজাতি বা আদিবাসী আখ্যায়িত নন। বার্মায় মগ বা মার্মারা মূল ঐতিহাসিক জাতি। সাবেক ত্রিপুরা রাজ্যের মূল বাসিন্দারা ও ত্রিপুরা নামীয় জাতি। চাকমারা ও নিঃসন্দেহে এক অগ্রসর সুসভ্য সম্প্রদায়। আদিম জীবন যাপন পদ্ধতি থেকে তারা সম্পুর্ণ মুক্ত। এই লোকদের অসভ্য অনুন্নত আদিমতার আচ্ছাদনে ঢেকে রাখার প্রচেষ্টা বেদনা দায়ক। তাদের দুঃখ কষ্ট ও দারিদ্র্য গোটা জাতীয় অবস্থারই প্রতিচ্ছবি, পৃথক কিছু নয়।

জমির মালিকানার জন্য বন্দোবস্তি লাভ, দীর্ঘ অবলম্বিত ঐতিহ্য। খোদ আদি রাজা শের মস্ত খাঁকেও কোদালার মাওদায় জমি বন্দোবস্তি নিয়ে এদেশে বসবাস শুরু করতে হয়েছিলো। এই অনুসরণীয় বন্দোবস্তি প্রথাকে অবজ্ঞা করে শুধু দখলের দ্বারা জায়গা জমির মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। এই ভুলের মাশুল অবশ্যই দিতে হবে। জমি খাস রেখে মালিক হওয়ার উপজাতীয় প্রক্রিয়া ভুল। বাঙ্গালীরা সরকার প্রদত্তচিহ্নিত খাস জমির বন্দোবস্তি প্রাপ্ত খাটি বৈধ মালিক। তাদের অধিকার আইনতঃ চ্যালেঞ্জ যোগ্য নয়। আর গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে উপজাতীয়দের লাখেরাজ সম্পত্তিও

ভাবা অনুচিত। বিদেশী মদদ আর অস্ত্রের শক্তি মত্তায় ন্যায়-অন্যায় ভুলে যাওয়া যুক্তির কথা নয়। বাঙ্গালী বিতারণে বেশি উৎসাহ প্রদর্শনকে সন্দিগ্ধ বাঙ্গালী পক্ষ ভুল বুঝতে পারে। এই ভুল বুঝাবুঝি, আর এক তরফা আত্ম-স্বার্থ-চিন্তা, পরিহার করা ছাড়া, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে না। অযৌক্তিক বাগাড়ম্বরে আত্মতুষ্টি লাভ সম্ভব হলেও, তার কোন সুদূর প্রসারী সুফল আশা করা যায় না। লাখেরাজ বা নিষ্কর সম্পত্তির মালিকানার পক্ষে ও বন্দোবস্তি থাকা জরুরী হয়। সম্প্রদায় ও ধর্ম বিদ্বেষকে আলোচনার উপজীব্য করা ঠিক নয়। মাননীয় রাজা বাবু উল্লেখিত সেমিনারের প্রবন্ধে পবিত্র ধর্মকেও টেনে এনে বাঙ্গালী ইসলাম, ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করেছেন। প্রাসঙ্গিক ভাবেই তার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। আপনার বক্তব্যটি যথা ঃ

Almost all the recent migrants to the C.H. Ts are ethnically Bengali and largely of Islamic faith. The vast majority of hill people are Budhist, followed by Hindus and Christians.

বাংলা ঃ মানবগোষ্ঠী গত বিচারে পার্বত্য চট্টগ্রামে আগত সাম্প্রতিক কালের উদ্বাস্তুদের প্রায় সবাই বাঙ্গালী, যাদের অধিকাংশ ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী। পাহাড়ী উপজাতিদের গরিষ্ঠতম অংশ বৌদ্ধ, তৎপর হিন্দু ও খ্রীষ্টান (সুত্র ঐ)

এখন প্রথমে পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক পরিচয় সন্ধানই প্রয়োজন। এরা কি পৃথক দুই নৃগোষ্ঠী? ভাষা সংস্কার সংস্কৃতি, সাজ পোষাক, আচার আয়োজন ও দৈহিক রং গঠনে চাকমা ও বাঙ্গালীতে পার্থক্য অতি ক্ষীণ। কেবল লৌকিকতা ও পরিবেশ পরিস্থিতিগত ভিন্নতা ব্যতীত, এ দুষসম্প্রদায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে অভিন্ন। বোচা গঠন, গোরা রং, আর পাহাড়ের অধিবাস বনাম ধার গঠন শ্যামলা রং আর সমতলের অধিবাস, নৃতাত্বিক পৃথক পরিচয়ের সুত্র নয়। এই পার্থক্য কারো পক্ষে একচেটিয়াও নয়। বাঙ্গালীদের বিপুল সংখ্যক লোক মঙ্গোলীয় রং ও গঠনের অধিকারী। চাকমা সমাজেও আর্য্য দ্রাবিড়ীয় মিশ্রণজাত তীক্ষ্ণ শ্যামলা রং গঠনের লোক, সংখ্যায় কম নয়। পেশাগত জুম ঐতিহ্যই চাকমাদের পাহাড়বাসী, আর বাঙ্গালীদের হাল চাষ ঐতিহ্যই সমতলবাসী করেছে। তবু লাঙ্গল চাষীতে পরিবর্তিত হয়ে অনেক চাকমা আজকাল পাহাড়ের উপত্যকায় সমতলের বাসিন্দায় পরিণত ও বাঙ্গালীর সম পরিবেশ গত অবস্থানে উপনীত হয়ে গেছেন। একই ভাষা ধর্ম সংস্কৃতি আচার ব্যবহার অবস্থান ও রং গঠন ধারণ করে চাকমারা এখন বাঙ্গালীদের নৃতাত্বিক নৈকট্য সম্পন্ন বর্ন বা গোষ্ঠী। একই সাথে তারা অন্যান্য প্রতিবেশী উপজাতীয়দের তুলনায় অধিক বঙ্গীয় পরিচয় সম্পন্ন। অন্যান্য পাহাড়ী সম্প্রদায় যেমন তাদের অবঙ্গীয় ভাষা ব্যবহার আচার ঐতিহ্য আর রূপ গঠনের গুণে পরিষ্কার অবাঙ্গালী, তদ্রুপ চাকমারা অধিক পরিমানে বঙ্গীয় ঐতিহ্য ধারী। চাকমা অভিজাতরা অতীত কাল থেকে এখনো বাঙ্গালী আত্মীয়তার সাথে সম্পৃক্ত। তাদের অনুকরণে সাধারণ চাকমারা ও বাঙ্গালী আত্মীয়তা থেকে মুক্ত নন। আদি রাজা শের মস্ত খাঁসহ পরবর্তী দশজন চাকমা রাজা ও রাণীর নাম ও তাদের সীল মোহরগুলো প্রমাণ

করে, তারা বাঙ্গালী অভিজাত মুসলিশ সমাজ ও তাদের ধর্মের সম্পৃক্ততা থেকে মুক্ত নন যথা ঃ

১. আদি চাকমা রাজা ঃ শের স্ত খা ১৭৩৭ খ্রীঃ

২. রাণী সোনাবি ১৭৪০ খ্রীঃ

৩. রাজা শের জব্বার খাঁ ১৭৪৯ খ্রীঃ

৪. রাজা নুরুল্লাহ খাঁ ১৭৬৫ খ্রীঃ

৫. রাজা ফতেহ খাঁ ১৭৭১ খ্রীঃ

৬. রাজা শের দৌলত খাঁ ১৭৭৩ খ্রীঃ

৭. রাজা জান বখর্শ খাঁ ১৭৮৩ খ্রীঃ

৮. রাজা তব্বার খাঁ১৮০০ খ্রীঃ

৯. রাজা জব্বার খাঁ ১৮০১ খ্রীঃ

১০. রাজা ধরম বখশ খাঁ ১৮১২ খ্রীঃ

রাজা ধরম বখশ খাঁর বিধবা পত্নী রাণী কালিন্দি স্বীয় নামের শেষে মুসলিম ঐতিহ্যযুক্ত বিবি উপাধি আমৃত্যু ব্যবহার করেছেন। এই রাজপরিবারের সমাজ ছিলো রাঙ্গুনিয়ার মুসলিমদের সাথে সম্পৃক্ত। রাজানগরের পরিত্যক্ত ঐ রাজ বাড়ীর দীঘির পাড়ে এখনো তখনকার রাজকীয় কবরস্থান ও মসজিদ বিদ্যমান আছে। পড়োমান রাজ প্রাসাদটি এখনো মোগল স্থাপত্য শিল্পের নির্দেশন হিসাবে দন্ডায়মান রয়েছে। অদ্যাবধি রাজকীয় অভিষেক অনুষ্ঠানে মুঘলাই সাজে সজ্জিত হয়ে চাকমা রাজা, স্বীয় প্রজাদের কুর্নিশ খাজনা ও নজরানা গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণ চাকমা প্রজারা এখনো তাদের হুজুর ও বিবি সম্বোধন করে।

এখানে স্মর্তব্য যে, আমি রাজাদের যে তালিকা ও তাদের কার্য্যকাল সাজিয়েছি তার ভিত্তি হলো ঃ কতিপয় রাজকীয় সীল মোহর। এর সাথে অধ্যাপক এ এম সিরাজ উদ্দিন রচিত রাজাজ অফ দি চিটাগাং হিল ট্রাক্টস প্রবন্ধ ও সরকারী দলিল পত্র। রাজা ভুবন মোহন রায়কৃত চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাস ও অন্যান্য কতিপয় লেখকের বর্ণনার কিছু অমিল আছে।'

রাজা ধরম বখশ খাঁর নাতি রাজা হরিশচন্দ্র রায় থেকেই মুসলিম নাম ও খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত। ১৯৭২ খ্রীঃ সালে বৃটিশ কর্তৃপক্ষই তাকে রায় উপাধি প্রদান করেন। তৎপুর্বে তদীয় পিতৃপক্ষের দ্বিতীয় উর্ধপুরুষ অর্থাৎ দাদা মাল্লাল খা পর্যন্ত মুসলিম নাম খেতাবের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন ছিলো। পিতা গোপীনাথ থেকেই অমুসলিম নাম করণের শুরু।

মা রাজা ধরম বখশ খাঁ কন্যা চিকন বিবি পর্যন্ত বিবি উপাধি অনুসৃত হয়েছে। এই মুসলিম ঐতিহ্য হলো তাদের প্রাচীন আভিজাত্যের প্রতীক।

অপর দিকে সাধারণ চাকমা ভাষা ও নামকরণে মুসলিম ঐতিহ্য অনুসৃত হওয়ার প্রমাণ হলো সৃষ্টিকর্তাকে খোদা সম্বোধন, সময়কে ওক্ত বলা, বউ ছাড়াকে তালাক আখ্যা দান, অভিবাদনকে সালাম বলা, ইত্যাদিসহ তান্যাবি, ধন্যা বি, জুম্যা বি, চেঙ্গীজ খাঁ, বাঙ্গাল্যা ইত্যাদি নাম করণ। এটা চাকমাদের অনস্বীকার্য মুসলিম ধারা ঐতিহ্য। এই ঘোর উপজাতীয় ঐতিহ্য প্রীতির যুগেও বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানদের সাথে আত্মীয়তা রচনার প্রবণতা তাদের মাঝে অব্যাহত আছে। খোদ রাজা বাবু, রাণী বিনীতা রায়ের নাতি, যিনি একজন বাঙ্গালী হিন্দু মহিলা। তদীয় অপর পক্ষীয় পিতৃব্যরা ও হিন্দু মহিলা সুধীরা রায়ের গর্ভজাত সন্তান। সুতরাং জাত ও ব্যক্তিগত অহমিকা দেখাবার মত সঠিক ভিন্নতা চাকমাদের নেই। তারা বড়জোর বাঙ্গালী সংকর মঙ্গোলীয় শাখা। বাঙ্গালী ও মঙ্গোলীয় মা বাপের দীর্ঘ ও বংশানুক্রমিক সংমিশ্রণের ধারায় এরা উভয় চরিত্র সম্পন্ন একটি মানব গোষ্ঠী। এদের পৃথক পরিচিতি জোরালো নয়। কেবল রাজনৈতিক উচ্চাশা পূরণের সুযোগ হিসেবে নিজেদের তারা অবাঙ্গালী আখ্যায়িত করেন, এবং তাই তারা কখনো পাহাড়ী কখনো উপজাতি আর কখনো আদিবাসী। তারা বাঙ্গালী পরিচিত হতে অস্বীকৃত। তবে প্রতিবেশী অন্যান্য উপজাতীদের মত পরিষ্কার অবাঙ্গালী নন। বাংলা ভাষা আর বাঙ্গালী নামকরণ তাদের বাঙ্গালীত্বের একটি অকাট্য দলিল। বাঙ্গালীত্বের সুত্রে অঢেল সুযোগ-সুবিধা উপচে পড়তে শুরু করলে, পর মুহূর্তেই তাদের বাঙ্গালীত্বে উত্তরণ জোরদার হবে এমনটি অনুমান করা যায়।

১০· সন্তু বাবুদের রাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ

কথায় বলে ঃ কারো পৌষ মাস, আর কারো সর্বনাশ। সন্তু বাবুরা বাংলাদেশের সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনায়আনতে মোটেও রাজি নন। তাদেররাজনৈতিক লক্ষ্য আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ। এর চেয়ে কম কিছুতে তারা সন্তুষ্ট নন। বর্তমানে পার্বত্য চুক্তির আওতায় উপজাতীয় পক্ষ, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় পরিচালনা, তিন পার্বত্য জেলায় সমন্বিত আঞ্চলিক পরিষদ নিয়ন্ত্রণ করছেন, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও তাদের প্রাধান্যাধীন। এটাকে তারা যথেষ্ট বলে ভাবছেন না। তাদের আরো অধিক নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা চাই, যে ক্ষমতা সার্বিক প্রশাসনিক। তারা সরাসরি স্বাধীনতার দাবি করছেন না বটে। তবে স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার হলো স্বাধীনতারই পূর্ববর্তীধাপ,যা একটি ঘোষণার বিষয় যা স্থানীয় জনসমর্থন ও আন্তর্জাতিক অনুমোদনে সহজেই অর্জিত হতে পারে। সামরিক দমনপীড়ন তখন কোন কাজে আসবে না। এর উদাহরণ হলো বসনিয়া ও পূর্ব তিমুর। বালাদেশ নিজ ভূমে এমন পরিস্থিতির শিকার হতে পারে না। এই অনভিপ্রেত পরিস্থিতি ঠেকানো বাংলাদেশের বাঁচা মরার বিষয়।

বাংলাদেশ তার সাধ্যমত উপজাতীয় কল্যাণ ও তোষণে লিপ্ত। আইন ও স্বাধীনতার পরিপন্থী হলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সামান্ত ব্যবস্থা, তথা তিন উপজাতীয় সার্কেল, তিন শত তেহাত্তর মৌজা, ও শতাধিক বাজার শাসন ব্যবস্থা চালু আছে। ভূমি প্রশাসন ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা তাদের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং বিস্ময়কর হলো, ভূমি রাজস্বের ১০-১২% এবং জুম করেন ৮৫% উপজাতীয় রাজা ও হেডম্যানেরা আগাম ভোগ করে থাকেন। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় বনভূমির ৩১৬৬.৪০ বর্গমাইল এলাকা উপজাতীয় লোকদের অবাধ জনভূমিতে পরিণত হয়ে আছে, যে জন্য তারা প্রশাসনিক অনুমতিরও ধার তারা ধারেন না। অথচ প্রচলিত পার্বত্য শাসনবিধির ধারা নং-৪১ ও ৪১(ক) উপজাতীয়দের কোনরূপ অবাধ জুম চাষের অধিকার দেয় না। এই বিস্তৃত রাষ্ট্রীয় বনভূমির প্রাকৃতিক সম্পদ রাজি যেমন বাঁশ গাছ লতাপাতা, পশু-পাখী, খনিজ পদার্থ, ভূমি ইত্যাদি জাতীয় সম্পদ হলেও তা উপজাতীয়রা বেআইনিভাবে ধ্বংস, আহরণ, খরিদ, বিক্রি, ব্যবহার ইত্যাদি কাজেও অবাধে তৎপর। অথচ প্রচলিত পার্বত্য শাসন ও বিধি ধার নং-৫০ তাদের শহর বহির্ভূত অঞ্চলে বাসা বাড়ীর প্রয়োজন মিটাতে বিনা বন্দোবস্তিতে মাত্র তিরিশ শতক জায়গা ভোগ দখলের

অধিকার দিয়েছে,তাও ঐ দখলকারীকে কেবল উপজাতীয় হলে হবে না, তাকে পাহাড়ী সংজ্ঞাভুক্ত লোক হতে হবে; যার অর্থ আদিম ও স্থানীয় পাহাড়বাসী লোক হওয়া। এই সংজ্ঞাভুক্ত স্থানীয় উপজাতীয় লোক এখানে বিরল। মারমারা নামেই বর্মী,মগ ও রাখাইনরা আরাকানী, ত্রিপুরারা ত্রিপুরা রাজ্যের অধিবাসী, লুসাই ও মিজোরা মিজোরামবাসী, চাকমারা ও মগ বিতাড়িত আরাকানী। অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী ও বহিরাঞ্চলের লোক। এদের সবাই এদেশে অভিবাসী বংশধর। এরা এদেশের স্থানীয় আদিবাসিন্দা পাহাড়ী নয়। তাদের স্থানীয় আদিমতা ও সন্দেহজনক। এতসব দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ রাষ্ট্র তাদের প্রতি উদার। তাদের ভূমিদখল ও সম্পদ ধ্বংস করা কে অপরাধরূপে আমলে আনা হয় না। তদুপরি তাদের শান্ত ও সন্তুষ্ট করতে পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীপদ, আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসন টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদ, তিনসার্কেল চীফ ও বহুবিধ মৌজা হেডম্যান পদ ইত্যাদিতে সমাসীন করে রাখা হয়েছে। জন প্রতিনিধিত্বমূলক এমপি পদ, ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান পদ এমন কি প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্র প্রধান পদের জন্য পর্যন্ত তারা যোগ্য। অধিকাংশ স্থানীয় ইউনিয়ন কাউন্সিল চেয়ারম্যান ও সদস্য পদে এবং তিনজেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের সদস্য পদেও তারা বরিত। উচ্চ শিক্ষা আর কর্মসংস্থানেও তারা অগ্রগণ। তারা শিক্ষা-দিক্ষা, কর্মসংস্থান, আর আয়-রোজগারেও পিছিয়ে নেই।এখন তারা বঞ্চিত পশ্চাৎপদ আদিম 'আদিবাসী' লোক নয়। বাংলাদেশের গত তিরিশ বছরের ভিতর তাদের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তাদের তুলনায় এখন বাঙ্গালীরা বৃহদাংশে পশ্চাৎপদ জাতি। বাংলাদেশস্বীয় সাধ্যাতীত প্রয়াসে উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধন করেও উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধানে অক্ষম। তারা বাংলাদেশকে অত্যাচারী, উৎপীড়ক ও উপজাতি বৈরী আখ্যায়িত করে শাসন প্রশাসনকে উপজাতীয় করণের দাবি তুলছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভকেই রাজনৈতিক লক্ষ্য করে আন্দোলনে উত্তপ্ত। এটা বিচ্ছিন্নতার পূর্বাভাস। এই লক্ষ্য উদ্দেশ্যের প্রতি নমনীয় হলে উপজাতীয়রা বাংলাদেশকে জিন্দাবাদ জানাবে এবং অস্ত্রত্যাগ করে শান্ত সুবোধ হয়ে উঠবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। বরং তাতে এই অঞ্চলের বিচ্ছিন্নতা ও স্বাধীনতার পথ সুগম হবে, সে সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা যায় না। এই আশঙ্কাকে বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশকে এই অঞ্চলভিত্তিক নীতি নির্ধারণে মনোযোগী হতে হবে।

রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণে আমাদের রাজনীতি অঙ্গনে চিন্তা-চেতনার দৈন্য চলছে বলেই মনে হয়। উপজাতীয় রাজনীতির সফল বিকল্প উদ্ভাবনে আমরা অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছি, যার পরিণতি সুখকর ভাবার অবকাশ নেই। উপজাতীয়দের বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বিষয় এবং দাতা রাষ্ট্রসমূহের অসন্তোষকে আমরা মাত্রাতিরিক্ত ভয় করি। এ কারণে বাঞ্ছিত নীতি নির্ধারণ থেকে আমাদের জাতি ও সরকার পিছপা। এ কাজটি আমাদের কাছে অপ্রিয়। আসলে আমরা জানি উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী এবং তা দমনের কৌশলও আমাদের করায়ত্ত। উপজাতীয় বিচ্ছিন্নতার বিরুদ্ধে আমাদের যুক্তি হলোঃ তারা চট্টগ্রাম মূলের স্থানীয়

অধিবাসী নয়, বহিরাগত অভিবাসী বংশধর। সুতরাং সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে, তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার দাবি অযৌক্তিক। এতদসত্ত্বেও তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণ দাবি দুর্দমনীয়,আর বহিরবিশ্ব কর্তৃক সমর্থিত হয়ে উঠলে আমাদের নিরুপায় করণীয় হবে, বাঙ্গালী লোক বন্যায় এতদঞ্চলকে ভাসিয়ে দেয়া, অথবা চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সাথে কিছু সীমান্ত অঞ্চলের যোগ-বিয়োগ সাধন, যাতে স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালী সংখ্যা প্রাধান্য রচিত হয়। যখন সাধ্যাতীত কল্যাণ ও তোষণের মাধ্যমেও উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধান সম্ভব হচ্ছে না, তখন রাষ্ট্রের অখন্ডতাকে নিরাপদ করতে কঠোর হওয়া ছাড়া উপায় কী। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাস যতই অপ্রিয় হোক, অখন্ডতা রক্ষায় বাংলাদেশকে তা করতেই হবে। উপজাতীয়দের পূর্বাহ্নে এভাবে সতর্ক করে দেয়া আবশ্যক, রাষ্ট্রীয় সর্বোচ্চ আইন সংবিধানের আওতায় তাদেরকে গণতন্ত্র ও সমঅধিকারের প্রতি অনুগত হয়ে সন্ত্রাস ও রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি ত্যাগ করতে হবে। এভাবে শান্তি ও সুবোধ নাগরিকের পরিচয় দিয়ে বাঙ্গালীদের প্রতি শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান দেখালে, 'বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও আঞ্চলিক পুনর্বিন্যাসের পরিকল্পনা পরিহার করা যাবে। নতুবা তা অবশ্যম্ভাবী।

উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফসল বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। হত্যা ও সন্ত্রাস তার বিকল্প নয়। পার্বত্য চুক্তিকে বিদ্রোহের ফসল ভাবা যথার্থ নয়, এটা রাষ্ট্রীয় উদারতারই ফল। উপজাতীয়রা রাষ্ট্রের পক্ষে বৈরী না অনুগত নাগরিক, তা প্রমাণের দায়িত্ব তাদের নিজেদের। বাঙ্গালীরা পর্বতাঞ্চলে ব্যাপক হত্যার শিকার হওয়া কালেও দেশের কোথাও কোন উপজাতীয় লোক প্রতিহিংসার শিকার হয়নি। এটাই প্রমাণ উপজাতীয়দরে প্রতি দেশ ও জাতি যথেষ্ট সহনশীল ও উদার। এই অনুকূল পরিস্থিতি উপজাতীয়দের কল্যাণ ও উন্নতির সহায়ক। বিপরীতে উগ্র রাজনীতি ক্ষতিকর।

১১- বাংলাদেশের অখন্ডতার উপর পার্বত্য চট্টগ্রামের বিরূপ প্রভাব ও তার প্রতিবিধান

বাঙ্গালী জাতি সত্তার ইচ্ছা ও প্রাধান্যই, বাংলাদেশকে পৃথক এক স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছে। বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে দেশ ভিত্তিক বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হলেও বাস্তবে এই সমন্বিত জাতি সত্তার ৯৯% হলো বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী সমন্বিত। এই বাস্ত বতার বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হলো পার্বত্য চট্টগ্রামে আঞ্চলিক ভাবে উপজাতীয় প্রাধান্য মন্ডিত জন্ম জাতিয়তাবাদও তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা। এতদাঞ্চলে বাংলাদেশী চরিত্র আরোপই এর সমাধান।

বিশেষ জাতিসত্তার আধিপত্য মন্ডিত এলাকা সমূহে স্বায়ত্ত শাসন স্বাধিকার বা আত্মনিয়ন্ত্রনাধিকার দাবী উত্থিত হয়, তার পক্ষে আন্দোলন গড়ে উঠে এবং চুড়ান্ত পর্যায়ে সশস্ত্র বিদ্রোহের অবতারনা হয়ে থাকে। এই আন্দোলন সংঘাত ও সংঘর্ষের পরিনতিতে ঐ অঞ্চলে অশান্তি, দুর্ভোগ ও মানবিক বিপর্যয় দেখা দেয়। তাতে লোকেরা বিপুল সংখ্যায় হতাহত হয় এবং আত্ম রক্ষার্থে দেশ ত্যাগ করে প্রতিবেশী দেশে আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য হয়। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় শান্তি স্থাপনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কোন কোন মুরব্বী রাষ্ট্র এমন কি জাতিসংঘ পর্যন্ত তাতে হস্তক্ষেপ করে। এর সাম্প্রতিকতম নিদর্শন হলো বসনিয়া, ক্রোশিয়া ও সার্ভিয়ার পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হওয়া,গণভোটে প্রদত্ত সংখ্যাগরিষ্ট রায়ের ভিত্তিতে পূর্ব তিমুরেরস্বাধীনতালাভ এবং বিদ্রোহী দক্ষিন সুদানেরও অনুরূপ সম্ভাবনার দিকে অগ্রযাত্রা। অনুরূপ জাতিগত উত্তেজনার প্রধান ক্ষেত্র হলো ফিলিস্তিন ও কাশ্মীর। বাংলাদেশের উপজাতীয় অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রামও অনুরূপ একটি অশান্তঅঞ্চল। এখানেও ভিন্নজাতিগত প্রাধান্যে রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা ক্রিয়াশীল। একে নিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার উপায় নেই। দাতা মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহকে পার্বত্য জনসংহতি সমিতি, তাদের ক্ষমতা লাভের পক্ষে উত্যক্ত করে চলেছে। সে ক্ষমতা শান্তিচুক্তি ভিত্তিক হলেও তাতে তারা সীমাবদ্ধ থাকছেনা। চুক্তির বাহিরে তারা দাবী জানিয়ে আসছেঃ প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলের আবাসিত বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এবং চুক্তির অন্যতম দফা স্থানীয় আদিও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে ভোটার তালিকা সংশোধন করতে হবে। মুল পাঁচ দফা দাবী নামায় এ দাবীও ছিলো

যে, ১৯৪৭ সালের পরবর্তী বসতি স্থাপন কারী বাঙালীদের সবাই অনু প্রবেশকারী এবং তাদের সহায় সম্পত্তি ও বেআইনী। উপজাতীয় বুদ্ধিজীবিরা যুক্তি দেখাচ্ছেন, ১৯৪৭ পর্যন্ত এতদাঞ্চলে বাঙ্গালীদের সংখ্যানুপাতে ছিলো ২.৫০ যা বর্তমানে হয়ে দাঁড়িয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ। উপজাতীয়দের ভূমিহীন সংখ্যালঘু করার এই প্রক্রিয়াকে জোরদার করেছে বাঙ্গালী শাসন প্রশাসনও বাহিনী প্রাধান্য। এসবের উপজাতীয়করন আবশ্যক। নতুবা উপজাতীয়রা নির্যাতন ও অবিচার থেকে রেহাই পাবেনা। বাঙ্গালী উপনিবেশবাদ ও ইসলামী করনে তারা অতিষ্ঠ। তাদের ধর্ম, সংস্কৃতি, মানবিক অধিকার ও অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

এই এক তরফা অভিযোগের তীব্রতায় তাদের প্রতি অধিকাংশ মুরব্বী রাষ্ট্র সহানুভূতিশীল। তাদেরই চাপের মুখে অসম শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়েছে এবং তারাই অবাস্তবায়িত দফা সমূহ বাস্তবায়নে চাপ দিচ্ছেন। এখন বাংলাদেশ কেবল উপজাতীয়দের চাপে জর্জরিত নয়, মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহের অসন্তোষবিদ্ধও বটে।

উপজাতীয় রাজনৈতিক বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে বিপুল অকাট্য যুক্তি আছে, এবং ভুল যুক্তি ও তথ্যের উপর উপজাতীয় দাবী ও আন্দোলন পরিচালিত ও তাতে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এ বিষয়গুলোর আড়াগোড়া পুনর মূল্যায়ন আবশ্যক।

উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ ও তাদের আন্তর্জাতিক মুরব্বীরা, পূর্ব তিমুরের মত গোলের উদ্দেশ্যে অগ্রসর হচ্ছেন। অশান্তি দমন করার উদ্দেশ্যে তারা প্রথমেই জোর দিচ্ছেন বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের প্রত্যাহার করে, পূর্বাবস্থা বহাল এবং চুক্তি অনুযায়ী ভোটার তালিকাও সংশোধিত হোক। অতঃপর দাবী উঠবে স্থানীয় রাজনৈতিক আকাঙ্খা নিরূপনে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে গণভোট অনুষ্ঠিত হোক। বাংলাদেশ তো চুক্তির মাধ্যমে ফাঁদে পড়েই আছে এবং সাহায্য নির্ভরতা হেতু মুরব্বী রাষ্ট্র সমূহকে অবজ্ঞা করতে অক্ষম। সুতরাং তার পক্ষে করুন অসহায় অবস্থা মেনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকবেনা।

পাকিস্তান ভারত ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মত বাংলাদেশ দৃঢ় হতে পারবেনা। আন্ত র্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তান, ভারত, ইসরাইল; ও ফেলিস্তিনের অবস্থা দৃঢ়। ফেলিস্তিন বাদে বর্ণিত তিন রাষ্ট্র পারমানবিক অস্ত্রের জোরে বলিয়ান। তাদেরকে চাপিয়ে দেয়া মীমাংসায় বাধ্য করা যায়নি, যাবেও না। কিন্তু দরিদ্র দূর্বল বাংলাদেশের সে শক্তি অবস্থান নেই। তার নেতৃ আসনেও শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব নেই। এ পর্যন্ত তার পক্ষে ঐতিহাসিক ও তথ্যগত যুক্তি প্রদর্শনও সম্ভব হয়নি যে, আত্ম নিয়ন্ত্রনকামী পার্বত্য উপজাতীয়রা স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়। তাদের আদি জাতীয় ভূমি আরাকান, বার্মা, মিজোরাম, ত্রিপুরা ইত্যাদি বহিরাঞ্চলে। তারা বৃটিশ আমলের অভিবাসী নাগরিক। এর পক্ষে অকাটা দলিল ও ইতিহাস বিদ্যমান। তাদের প্রতি নির্যাতন ও অবিচার অনুষ্ঠানের দাবী অতিরঞ্জিত। বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে তারা অশিক্ষিত অস্বচ্ছল আর পশ্চাদপদ ছিলো। কিন্তু বাংলাদেশ আমলের গত তিন দশক সময়ের মধ্যে অতি দ্রুততার সাথে, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও উপজাতীয়দের বিস্ময়কর উন্নতি

সাধিত হয়েছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের হার উপজাতীয়দের মাঝে সর্বাধিক। আর্থিক সঙ্গতি আর ভূমি সংস্থানের হার ও তাদের মাঝে সর্বোচ্চ। বাংলাদেশের শহর বন্দর ও রাজধানীর অফিস আদালত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, নির্মাণ প্রতিষ্ঠান শিল্প ও বাণিজ্য সংস্থা ইত্যাদিতে কর্মকর্তা কর্মচারী ছাত্র শিক্ষক ইত্যাদি পদে উপজাতীয়রা গিজ গিজ করছে। তাদের সাজ পোষাক স্বাস্থ্য স্বাচ্ছন্দ্য ঈর্শনীয়। তারা এখন আদিম ও পশ্চাদপদ নয়। এই অঞ্চলে পাকা রাস্তা, বাড়িঘর, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রচুর। দেশের অলংঘনীয় সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে সমাধিকার, সমান পদ মর্যাদা ও মৌলিক মানবাধিকার সবার জন্য নির্দিষ্ট। কিন্তু চুক্তির আওতায় তাতেও শৈথিল্য প্রদর্শন করে, উপজাতীয়দের সম্পত্তি লাভ, কর্ম সংস্থান, উচ্চ শিক্ষা, জনপ্রতিনিধিত্ব ইত্যাদিতে অগ্রাধিকার, মন্ত্রীপদ, ও পরিষদীয় চেয়ারম্যান পদে একাধিকার মঞ্জুর করা হয়েছে। আইনত এটা অন্যান্য জনগোষ্ঠীর জন্য অবিচার।

ভৌগোলিক ভাবে পার্বত্য অঞ্চল, চট্টগ্রামের অংশ। চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী হলো এর আদি বাসিন্দা। স্থানীয় উপজাতীয়রা নিজেদের আদি চট্টগ্রামী লোক বলে দাবী ও করেনা। মগেরা নামেই আরাকানী, মারমারা বর্মী, লুসাই ও মিজোরা মিজোরামবাসী, ত্রিপুরারা ত্রিপুরা রাজ্যবাসী, চাকমারা মগ বিতাড়িত আরাকানী এবং নিজেদের কথা কাহিনী অনুযায়ী কোন এক অজ্ঞাত চম্পক নগর রাজ্যের প্রতি অনুগত। বাংলাদেশ তাদের জাতিগত স্বদেশই নয়। এখানে উপজাতীয়দেরসবাই আশ্রিত। এ দেশে তাদের সংখ্যা প্রাধান্যের ভিত্তিতে স্বাধিকার, স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের প্রয়োগ হতেই পারেনা।

বৃটিশ আইন পার্বত্য শাসন বিধির ৩৫ নং ধারা পার্বত্য চট্টগ্রামকে ৫টি সার্কেলে বিভক্ত করেছে, ৪৬৫২ বর্গমাইল ব্যাপ্ত জাতীয় সম্পত্তি, যা রাষ্ট্রীয় বন, সংরক্ষিত বন, পাহাড়,ও হ্রদ বাসভূমি ইত্যাদি। গোটা ৫০৯৩ বর্গ মাইল সম্বলিত পার্বত্য চট্টগ্রাম তিন উপজাতীয় সার্কেল তথা চাকমা সার্কেল, মং সার্কেল, ও বোমাং সার্কেলের অন্তর্ভূক্ত নয়। আদিকাল থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বৃহদাংশ জাতীয় বন ভূমি। এখন আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকারের ভিত্তিতে এই গোটা অঞ্চল উপজাতীয়দের প্রাপ্য নয়। তারা দেশীয় জনসংখ্যার মাত্র আধা শতাংশ। তাদের প্রাপ্যভূমির অনুপাত ৫০০ বর্গমাইলের বেশী হয়না। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম দেশের এক দশমাংশ। এখানকার জাতীয় অঞ্চলে ভূমিহীন বাঙ্গালীদের ব্যবসা বাণিজ্য ও বসতি বিস্তারের অধিকার প্রাপ্য। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৬ ও ৪২ ধারা তাদের সে অধিকার মঞ্জুর করেছে।

এটা দুঃখজনক যে, দেশের অখন্ডতা রক্ষায় ইতিহাস, ঐতিহ্য, আইন ও যুক্তিকে কাজে লাগান হচ্ছে না, নিশ্চুপ সময় ক্ষেপন করা হচ্ছে, এবং একদল রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবি উপজাতীয়দেরই মদদ যোগাচ্ছেন, যা আত্মহত্যারই শামিল্।

কেউ কেউ এই অভিমত পোষন করেন যে, সেনা মোতায়েন ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের কারনেই উপজাতীয়রা নিজেদের ভূমি অধিকার ও অস্তিত্ব বিপন্ন মনে করছে। শান্তিপূর্ণ

উপায়ে এর কোন প্রতিকার না হওয়ার হতাশাতেই তারা বিক্ষুব্ধ ও বিদ্রোহী। শান্তিচুক্তি সম্পন্ন হলেও তা পরিপূর্ণ ভাবে বাস্তবায়ন হচ্ছে না। এতে ও অশান্তি অব্যাহত রয়েছে। এখন উপজাতীয়দের সন্দেহ আর অবিশ্বাস না করে, পরিপূর্ণ ভাবে চুক্তি বাস্তবায়ন করাই সঙ্গত। উপজাতীয় কল্যাণ ও তাদের প্রতি সদিচ্ছা পোষণের আন্তরিকতা প্রমাণ করার লক্ষ্যে চুক্তির অতিরিক্ত কিছু সুযোগ সুবিধা ও দেয়া যেতে পারে। যাতে তারা আশ্বস্ত হয় যে, তারা আর ষড়যন্ত্রের শিকার নয়, বাংলাদেশ তাদের প্রতি বাস্তবিকই আন্তরিক।

বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালী ও সেনা প্রত্যাহার, এবং আত্মনিয়ন্ত্রন অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চুক্তি না হলেও এগুলো উপজাতীয়দের প্রধান দাবী। তাদের ক্ষোভ অসন্তোষ ও বিদ্রোহ দমাতে, ও বাংলাদেশের প্রতি আস্থাশীল করে তুলতে, এই অবশিষ্ট দাবীগুলো পূরণ উপকারীহতে পারে। এতদসত্ত্বেও অশান্তি অব্যাহত থাকলে, এবং বিচ্ছিন্নতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠলে, চরমপন্থা অবলম্বন যুক্তিযুক্তহবে। ভাবতে হবে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও সেনা মোতায়েন সত্ত্বেও শান্তি সুনিশ্চিত হয়নি। সুতরাং পরীক্ষামূলক ভাবে হলেও বর্ণিত তিন দাবী বাঙ্গালী ও সেনা প্রত্যাহার, চুক্তির পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন ও স্বায়াত্তশাসন অধিকার মঞ্জুর করা উচিত। এই চরম উদারতার ব্যর্থতাতেই চরম পন্থা অবলম্বিত হতে পারে।

উপরোক্ত পরামর্শগুলো যথার্থ নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামে উপজাতীয় সংখ্যাপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠারই পদক্ষেপ হবে বাঙ্গালী প্রত্যাহার, যা বাংলাদেশের স্বার্থ পরিপন্থি, এবং তাতে এটাও সুনিশ্চিত হবে যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অবাঙ্গালী প্রধান অঞ্চল। অতীতে তার বাংলাদেশ ভূক্ত হওয়া, এখানকার ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকদের রাজনৈতিক অধিকারের পক্ষে নেতিবাচক। স্থানীয় জনমত স্বাধিকারের পক্ষপাতি হলে শান্তি ও কল্যানের স্বার্থে এই দাবীর প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন প্রদেয় হবে। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় অঞ্চল হওয়ার বলে, তারপক্ষে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার পথ খোলাসা হয়ে যাবে। তৎপর সামরিক নিয়ন্ত্রন ও বাঙ্গালী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হবে, আন্তর্জাতিক শান্তি প্রক্রিয়ার পরিপন্থী। বাংলাদেশের এই দশ শতাংশ অঞ্চল, তখন নীতিগতভাবে হবে বিচ্ছিন্নতার মুখোমুখী। উপজাতীয়রা যে সুযোগে স্বাধীনতা চাইবেনা, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং বাঙ্গালীও সেনা প্রত্যাহার মানে, এতদাঞ্চল থেকে চরিত্রগতভাবে বাংলাদেশকে প্রত্যাহার করে নেয়া। ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগ আর ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের অর্জন, এই প্রত্যাহারের দ্বারা বিসর্জিত হবে। দেশ বিভাগ ও মুক্তিযুদ্ধ এতদাঞ্চলে উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র স্বাধীনতাকে সমর্থন করেনি। ঐ মৌলিকত্বকে বানচাল করার কৌশল বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের এতদাঞ্চলে দূর্বল আর অকার্যকর করে তুলা। এই রাজনীতি ধ্বংসাত্মক। বাংলাদেশের এ ব্যাপারে কঠোর হওয়ার আরো যুক্তি হলোঃ এতদাঞ্চলে উপজাতীয় প্রধান্য কৃত্রিম। তারা স্থানীয় চট্টগ্রাম মুলের লোক নয়, বহিরাগত অভিবাসী বংশধর। নিজ জাতীয় অঞ্চল না হওয়ায়, এতদাঞ্চলে তাদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রন প্রাপ্য নয়। তারা দেশীয় জনসংখ্যা বিস্তারে আপত্তি জানাবার অধিকারীও নয়। এটা তাদের বাড়াবাড়ি। শান্তি স্থাপনে উপজাতীয়

বাড়াবাড়ির বিপরীতে গ্রহনীয় উপায় মাত্র ২টি। ১। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। ২। চট্টগ্রামের সাথে এলাকাগত পুর্নবিন্যাস বা যোগবিয়োগ। অতীতের বিন্যাসেরই ফল পার্বত্য চট্টগ্রাম।

চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারের সাথে পার্বত্য তিন জেলার এলাকা যোগ বিয়োগ বা পূর্ন বিন্যাস অতি সহজেই করা সম্ভব। কক্সবাজারের পূর্বাংশ আগে পার্বত্য চট্টগ্রামেরই অংশ ছিল। রামুতে বৃহত্তর চট্টগ্রামের সর্ব প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত, এটি পার্বত্য উপজাতীয়দের দর্শনীয় অন্যতম প্রধান তীর্থ স্থান। পার্বত্যঞ্চলে সীমান্তে অবস্থিত এই উপজেলাটির সাথে বান্দরবান জেলার পুনঃসংযোগ ঘটালে এই অঞ্চলের সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যায়ভারসাম্য রচিত হবে।

চট্টগ্রামের পূর্ববর্তী উপজেলা রাঙ্গুনীয়ার দক্ষিনাংশে অবস্থিত শুক বিলাস ও রাজভিলা, যা আগে চাকমা প্রধানদের তরফে শুক রায় দেব নামীয় বন্দোবস্তিভূক্ত এলাকা ছিলো। পরে সেখান থেকে চাকমা রাজবাড়ী উত্তর রাঙ্গুনীয়ার রাজানগরে স্থানান্তরিত হয়। এটি চাকমা ঐতিহ্য মন্ডিত অঞ্চল। রাঙ্গামাটি জেলার সাথে এই অঞ্চলের আংশিক সংযোগ ঘটালেও উপজাতীয় সংখ্যাধিক্যের অবসান হবে। খাগড়াছড়িপার্বত্য জেলার পশ্চিম সীমান্ত বর্তী উপজেলা হলো উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি। এটি অনেকাংশে পাহাড়ময় ও উপজাতি অধ্যুষিত। এই অঞ্চলটি আংশিকভাবে রামগড়, মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ির সাথে জুড়ে দিলে, খাগড়াছড়ি জেলায় ও উপজাতীয় সংখ্যাধিক্য লোপ পাবে।

এলাকা বিন্যাসের এই কৌশল অবলম্বন করা হলে, বাঙ্গালী পুর্নবাসন বা বসতি বিস্ত ারের প্রয়োজন হবেনা। এমনিতেই স্থানীয় বাঙ্গালী অধিবাসীদের দ্বারা উপজাতীয়রা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যাবে, এবং এটি ত্বরিত গতিতে করাও সম্ভব। তৎপর সংবিধান পরিপন্থী আইন ও চুক্তি ধারা সমূহ ঝেড়ে ফেলাও গনতন্ত্রকে বিনা বাধায় কার্যকর করা হবে সহজ। বিদ্রোহ আর বিচ্ছিন্নতাকে এভাবে অসম্ভব করে তুলার পথ অবলম্বনই একান্ত দরকার। এ পথে সময় ক্ষেপন মারাত্মক।

১২. পার্বত্য সমস্যার সমাধান কী ?

বাংলাদেশের জাতীয় সমস্যা সমূহের মাঝে অন্যতম বড় সমস্যা হলো, পার্বত্য অঞ্চলের অশান্তির বিষয়টি। এর পক্ষে এ পর্যন্ত দুবার দুটি বড় ধরনের সরকারী পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছে। কিন্তু তাতে উপজাতীয় অসন্তোষের পুরাপুরি সুরাহা এখনো হয়নি। এখন আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে জাতিগত ভিন্ন অবস্থানের সমস্যাটি, যা বিগত আওয়ামী সরকারের সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তি ও এরশাদ সরকারের স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনের দ্বারা সৃষ্ট। এই চুক্তি ও আইনের বলে উপজাতিরা হয়েছে সংরক্ষিত পদের অধিকারী ও অগ্রাধিকার প্রাপ্ত সুবিধাভাজন, আর বাঙ্গালীরা তাদের প্রতিপক্ষ অবহেলিত সমাজ। এই বৈষম্য আর অগণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা এশাধারে সংবিধান বিরুদ্ধ তো বটেই, সাম্প্রদায়িক শান্তি রচনার পক্ষে ও তা সহায়ক নয়।

বিএনপি সরকার গত ১৯৯১-৯৬ সালে স্বীয় কার্য কালে শান্তি স্থাপনে, বিদ্রোহী উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সাথে সমঝোতার উদ্দেশ্য দীর্ঘ সংলাপ চালিয়ে ও কোন মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেনি। পরিপূর্ণ মীমাংসার আশায়, ইতিপূর্বে এরশাদ সরকার প্রদত্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় মঞ্জুরকৃত উপজাতীয় সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে ও কোনরূপ যোগ বিয়োগ করা সে থেকে বিরত থাকে। বিএনপি কোনরূপ শূণ্যতা সৃষ্টি করতে চায় না, এবং কোন উগ্রভাকে ও প্রশ্রয় দেয়না। এ কারণেই তার নির্বাচনী ইশতেহারে আলাপ আলোচনা ও সমঝোতার উপর জোর দেয়া হয়। যদি ও তার পূর্ব ঘোষিত নীতি ছিলোঃ আওয়ামী শান্তি সংলাপের সাথে শরিক না হওয়া, পার্বত্য শান্তি চুক্তি প্রত্যাখান ও বাতিল করা। এই উদ্দেশ্যেই সে চুক্তিটিকে কালো চুক্তি নামে আখ্যায়িত করেছিল। তবে দায়িত্বশীল বিবেচনায় সে নিজ পার্বত্যনীতিকে নতুন পরিস্থিতির আলোকে পুনরায় ঢেলে সাজিয়েছে, যার প্রতিফলন ঘটেছে ২০০১ সালের প্রচারিত নির্বাচনী ইশতেহারে। এই সাথে সে উপজাতীয় সমাজে স্বীয় আসন পাকা পোক্ত করার লক্ষ্যে রাঙ্গামাটি আসনে একজন প্রাক্তন শান্তিবাহিনী কর্মকর্তা মনি স্বপন দেওয়ানকে এবং বান্দরবান আসনে মারমা নেত্রী মামা চিং কে মনোনয়ন দিয়ে প্রমাণ করেছে, সে উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী নয়। তিন আসনের অপরটি খাগড়াছড়িতে আবদুল ওয়াদুদ ভূইয়াকে মনোনয়ন দানের দ্বারা পার্বত্য বাঙ্গালীদের স্বার্থে ভারসাম্য রচনাই তার লক্ষ্য হওয়া ব্যক্ত হয়েছে। তার পার্বত্য নীতিতে কোন একতরফা ব্যবস্থা গৃহীত হয়নি। উভয় পাক্ষিক রাজনৈতিক আশ্বাসই ব্যক্ত হয়েছে তার নির্বাচনী নীতি আদর্শ সম্বলিত ইশতেহারে। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি এখানে বিবেচ্যঃ

"শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে আওয়ামী লীগ সরকার গোপনে ও জাতীয় সংসদকে পাশ কাটিয়ে, সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য পূর্ণ যে চুক্তি করেছে, তা এই অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে ব্যর্থ হয়েছে। এই বাস্তবতার আলোকে সমস্যাটির সংবিধান সম্মত এবং সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য সমাধানের জন্য আলোচনার মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো হবে।"

এই নীতি আদর্শের ভিত্তিতে বিএনপি দুই বিজয়ী এমপি মনি স্বপন দেওয়ান ও আব্দুল ওয়াদুদ ভুইয়ার প্রধান দায়িত্ব হলোঃ মীমাংসার ফর্মূলা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করা, যে ফর্মূলা হবে পাহাড়ী বাঙ্গালীর বৈরীতা নয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানকে জোরদার করা, ও সম্প্রীতি রচনা। জনসংখ্যার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী পাহাড়ীর সংখ্যা সাম্যকে বজায় রাখা। ক্ষমতা থেকে সংরক্ষণাবাদকে বিদায় করে গণতান্ত্রিক নিয়ম নীতির প্রতিষ্ঠা। সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে একের অগ্রাধিকার আর অপরের বঞ্চনা নয়, বরং দেশ ও জাতীয় পর্যায়ে বর্ধিত মঞ্জুরী অর্জন। ক্ষমতা ভোগের ক্ষেত্রে মিয়াদ ভিত্তিক বারি প্রথা আরোপ তথা বিরতি মানা এবং স্থানীয় জন প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের বিকল্প পদের সংস্থান করা, যাতে বারি ভিত্তিক বিরতি কালে, ক্ষমতার ভাগ বিপক্ষেরও নাগালে থাকে।

এই পার্বত্য অঞ্চলের বাসিন্দা একা পাহাড়ীরা নয়, সমান সংখ্যক বাঙ্গালীরা ও তাদের প্রতিবেশী। যদি বাঙ্গালীদের অস্থানীয় সেটেলার অখ্যায়িত করে, তাদের প্রত্যাহারের দাবীতে পাহাড়ীরা সোচ্চার ও আন্দোলন মুখর থাকেন, তা হলে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলায় স্থানীয় বাঙ্গালীরাও এ বলে মুখর হবে যে স্থানীয় পাহাড়ীরা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা নয়,তারা অবাংলাদেশী অভিবাসীদের বংশধর। তাদের বাঙ্গালী প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক। পার্বত্য চট্টগ্রাম হলো চট্টগ্রাম নামীয় ভৌগোলিক অঞ্চলেরই অংশ, এবং এই গোটা অঞ্চলের আদি বাসিন্দা হলো চট্টগ্রাম মূলের লোক। পাহাড়ীদের নৃতাত্বিক মৌলিকত্ব নেই। এই যুক্তির ভিত্তিতে তাদের পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধান স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী, ও চট্টগ্রামী সহ বহিরাগত অপর বাঙ্গালীদের স্থানীয় নাগরিকত্ব অস্বীকার করা হলো ইচ্ছাকৃত বৈরীতা। পাহাড়ীদের নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষার পক্ষে এরূপ অসহনশীলতা মোটেও উপযোগী নয়।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ও তার বাসিন্দা উপজাতিদের সম্পর্কে বিএনপির উদার মনোভাব তার নির্বাচনী ইশতেহারে অত্যন্ত যৌক্তিক ও নমনীয় ভাবে প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে পূর্ববর্তী কঠোরতার লেশ মাত্র নেই। এই মনোভাবকে স্বাগত জানিয়ে উপজাতীয় পক্ষকে ও নমনীয় হতে হবে। তাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, পার্বত্য চুক্তিতে ইতিহাস ও সংবিধান লঙ্ঘনের মত গুরুতর ত্রুটির অবতারনা হয়েছে, যা সংশোধন করা ছাড়া উপায় নেই। জাতি ও রাষ্ট্রের অখন্ডতা আর সার্বভৌমত্বকে ও চুক্তিতে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে, যে ব্যাপারে ছাড় দেয়ার কোন সুযোগ নেই।

চুক্তির মুখবন্ধে সুন্দর করে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল অনুগত্য বজায় রেখে, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত, এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা, এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব-স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষে

পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি এই চুক্তি সম্পাদন করেছেন।

এই মুখবন্ধই চুক্তির মূলনীতি, এবং তৎসঙ্গে চুক্তিবদ্ধ উভয় পক্ষই অঙ্গীকারাবদ্ধ। এখানে পালনীয় মূলনীতি আর অঙ্গিকার হলোঃ

(ক) চুক্তিটি হবে সংবিধান সম্মত ঃ

(খ) তাতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আর অখন্ডতা লঙ্ঘন করা হবে না।

(গ) পার্বত্য অঞ্চলে বসবাস ও অবস্থানকারী প্রতিটি নাগরিকের অধিকার ও উন্নয়ন সমুন্নত ও ত্বরান্বিত করা হবে।

চুক্তিকারী পক্ষদ্বয় উপরোক্ত তিন অঙ্গিকার ও মূলনীতি পালন করতে বাধ্য। যদি চুক্তির বিষয়বস্তু, ও তার বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় এর ব্যতিক্রম হয়, তা হলে তা সংশোধন যোগ্যত্রুটিরূপে গণ্য হবে। অঙ্গিকার ও মূলনীতির খেলাপ ত্রুটি সমূহ অবশ্যই সংশোধন যোগ্য।

পর্যালোচনায় দেখা যায়, চুক্তির বহু দফাতেই সংবিধানের নীতি নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম ক্ষমতা আর অখন্ডতা অক্ষুণ্ণ থাকে নি, এই সমালোচনা ও অভিযোগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ হলোঃ

<u>ক) সংবিধান লঙ্ঘন ঃ</u>

১) সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১-এ বলা হয়েছে ঃ (উপ অনুচ্ছেদ) (১)

"বাংলাদেশ এশটি একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যাহা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত হইবে।"

এই আইন ও আদেশ বলে বাংলাদেশ হলো একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। এতে ফেডারেল ও যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আরোপ যোগ্য নয়। গোটা দেশ একটি একক রাজনৈতিক কাঠামোতে আবদ্ধ। তাতে কেবল প্রশাসনিক ভাগ বিভাগই আঞ্চলিক পরিচিতির ভিত্তি। রাজনৈতিক অঞ্চল ও শাসন প্রশাসনের পরিবর্তে এই একক কাঠামোতে প্রশাসনিক অঞ্চল ভিত্তিক জনপ্রতিনিধিত্ব মূলক স্থানীয় শাসন বা সরকার পদ্ধতি সাংবিধানিক ভাবে অনুমোদিত, যথাঃ

<u>অনুচ্ছেদ নং ঃ ৫৯ (১) ঃ</u>

"আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমম্বয়ে গঠিত প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

এই সাংবিধানিক ব্যবস্থার বিপরীতে প্রশাসনিক এলাকা ডিঙ্গিয়ে কোন স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠান গড়ার কোন সংস্থান নেই। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছে, যা কোন প্রশাসনিক অঞ্চলভূক্ত নয়। সুতরাং এটি সংবিধান বহির্ভূত ব্যবস্থা।

<u>(২) অনুচ্ছেদ নং ২৭ (মৌলিক অধিকার) ঃ</u>

"সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয়ে লাভের অধিকারী"

<u>(৩) অনুচ্ছেদ নং ২৮ (১) মৌলিক অধিকার) ।</u>

"কেবল ধর্ম; গোষ্ঠী বর্ণ, নারী পুরুষ ভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করিবেন না।"

(২) রাষ্ট্র বা জন জীবনের সর্বস্তরে নারী, পুরুষের সমান অধিকার লাভ করিবেন।

(৪) নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবেন না।"

(৪) অনুচ্ছেদ নং ২৯ (১) (মৌলিক অধিকার)ঃ

"প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা থাকিবে।"

এই বিধান গুলো মৌলিক অধিকারযুক্ত তো বটেই, এর বিপরীতে আইন প্রণয়নের সাংবাবিধানিক নিষেধাজ্ঞা ও আছে যথা ঃ

" অনুচ্ছেদ নং ২৬ (১) (মৌলিক অধিকার) এই (তৃতীয়) ভাগের বিধানাবলীর সহিত অসমঞ্জস সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, এই সংবিধান প্রতর্বন হইতে সেই সকল আইনের ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

"(২) রাষ্ট্র এই ভাগের বিধানের সহিত অসামঞ্জস কোন আইন প্রণয়ন করিবেন না, এবং অনুরূপ কোন আইন প্রণীত হইলে তাহা এই ভাগের কোন বিধানের সহিত যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ, ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

"অনুচ্ছেদ নং ৭ (১) প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হইবে।"

"(২) জনগণের অভিপ্রায়ের চরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্য পূর্ণ ততখানি বাতিল হইয়া যাইবে।"

অনুচ্ছেদ নং ১১। প্রজাতন্ত্র হইবে একটি গণতন্ত্র যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকিবে, মানব সত্তার মর্যাদা ও মুল্যের প্রতি শ্রদ্ধা বোধ নিশ্চিত হইবে, এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হইবে।"

উপরোক্ত সংবিধানিক নীতি নির্দেশের দ্বারা প্রথমেই প্রচলিত আইন হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েল ধুলিস্বাৎ হয়ে যায়। স্থানীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা চীফশীপ তো থাকেই না, শাসন প্রশাসনে ও আমলাতান্ত্রিক প্রাধান্যের অবসান ঘটে।

প্রচলিত আইনের দ্বারা সংবিধান লঙ্ঘনকে এ পর্যন্ত পরোয়াই করা হয়নি। তদুপরি চাপিয়ে দেয়া হয়েছে অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইন, যা স্ববিরোধী ও বটে। এই অসাংবিধানিক চুক্তি ও আইনের পক্ষে সংবিধান থেকে গৃহীত পুঁজি হলোঃ অনুচ্ছেদ নং ২৮ এর উপ অনুচ্ছেদ (৪) যাতে বলা হয়েছে ঃ

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রনয়ণ হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

এখানে বিবেচ্য যে উপজাতি বা উপজাতিভুক্ত অনগ্রসর নাগরিকদের সবাই এই উপ অনুচ্ছেদ বলে উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিষয়ে বিশেষ বিধান লাভের অধিকারী। এই বিশেষ বিধান লাভের বেলায়, উপজাতি অউপজাতি বৈষম্য আরোপের কোন সুযোগ নেই। এ ব্যাপারে জাতি, ধর্ম বর্ণ, গোষ্ঠী ইত্যাদির তারতম্য করা, পদ সংরক্ষণ ও সুযোগ সুবিধায় অগ্রাধিকার দান, কোনক্রমেই অনুমতি যোগ্য নয়। কিন্তু চুক্তি ও পাবত্য আইনে উপজাতি আর অ উপজাতি সত্তার ক্ষেত্রে তারতম্য করা হয়েছে। সংবিধানভূক্ত তৃতীয় ভাগের আইন গুলো মৌলিক অধিকার সম্পন্ন। এগুলো লজ্ঘন ও এগুলোর সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোন বিধি বিধান প্রণয়ন নিষিদ্ধ তো বটেই, অনুরূপ আইন ও বিধি বিধান রচিত হলেও তা অকার্যকর ও বাতিল গণ্য হবে। অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) খোদ ঐ মোলিক অধিকার ভূক্ত অলজ্ঘনীয় আইন হলেও তদ্বারা অন্যান্য মোলিক অধিকার লজ্ঘন অনুমোদিত নয়, এবং ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নারী ও পুরুষে বৈষম্য আরোপের সুযোগও নেই। এই অনুচ্ছেদ সবার জন্য রক্ষা কবচ।

খ) চুক্তি ও পার্বত্য আইনের বিধান হলো ঃ

১) পার্বত্য চট্টগ্রাম উপজাতি অধ্যুষিত অজ্ঞল। কিন্তু তথ্য উপাত্ত বলে পার্বত্য চট্টগ্রাম বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর মিশ্র অধ্যুষিত অজ্ঞল। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং ১ এই দেশটিকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে আখ্যায়িত করেছে। এটি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র, যা রাজনৈতিক সাম্প্রাদয়িক ও অজ্ঞল ভিত্তিতে বিভক্ত নয়। অনুচ্ছেদ নং ৬ (২) নাগরিকদের অখন্ড বাংলাদেশী জাতি রূপে আখ্যায়িত করেছে। সুতরাং আঞ্চলিকতা ও সাম্প্রাদয়িকতা নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে পার্বত্য চুক্তিতে বাংলাদেশী জাতিভূক্ত লোকজন উপজাতি আর অউপজাতিতে বিভক্ত, আর দেশের এতদাঞ্চল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ইফনিট না হওয়া সত্ত্বেও, এক বিশেষ অঞ্চল রূপে চিহ্নিত। সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পৃথক পরিচয় অনুচ্ছেদ নং ২৩ এর পরিপন্থী না হলেও জাতীয় সংস্কৃতি ও সামাজিকতাই চর্চনীয়। নতুবা জাতীয় আর রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা রক্ষা হবে কঠিন। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামকে একক ভাবে উপজাতি অধ্যূষিত অঞ্চল বলা জাতি ও দেশের অখন্ডতার পরিপন্থী অসাংবিধানিক ব্যবস্থা।

২। চুক্তিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ অনুমোদিত। অথচ, প্রশাসনিক ইউনিট ভিত্তিতে জেলা পরিষদই সংস্থান যোগ্য, যথা অনুচ্ছেদ নং ৫৯। আঞ্চলিক পরিষদ ভূক্ত পার্বত্য চট্গ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট নয়, দেশের সব জেলার জন্য অভিন্ন জেলা পরিষদ আইন এখনো রচিত ও কার্যকর হয়নি। বিশেষ অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ও অগ্রাধিকার মঞ্জুর বৈষম্যের সৃষ্টি করবে, যা অনুচ্ছেদ নং ২৭ ও ২৮এ নিষিদ্ধ। আগামীতে সাধারণ জেলা পরিষদ আইন এই তিন পার্বত্য জেলায় প্রচলিত না হলে, স্থানীয় বর্ধিত সুযোগ সুবিধা আর

অগ্রাধিকারের ব্যাপারটি দেশ জুড়ে, অশান্তি উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। সাম্প্রদায়িক পদ সংরক্ষণ ও আসন কোটা ভিত্তিক নির্বাচনের স্থানীয় বিধি বিধানটিও আইন সম্মত নয়। অবাধ অসাম্প্রদায়িক নির্বাচনই হলো আইন। জনগণের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায় ও প্রতিনিধিত্বই অনুচ্ছেদ নং ১১ তে প্রাধান্য পেয়েছে। তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও সংরক্ষণ বাদের কোন স্থান নেই। এই আইনী বিবেচনায় কেবল জেলা পরিষদ টিকে থাকতে পারলে ও, তার নির্বাচন পদ্ধতি অনুমোদনীয় নয়। মন্ত্রী পদ, চেয়ারম্যান পদ, সদস্যপদ আইনতঃ অবাধ আর অসংরক্ষিত। এর কোন ব্যতিক্রম মান্য নয়। কোনরূপ অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন মূল নির্বাচনী আইন অনুমোদন করে না। অথচ আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন ব্যবস্থায় তাই গৃহীত হয়েছে। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ব্যতীত অন্যদের ভোটাধিকার বাতিলের ব্যবস্থা অনুচ্ছেদ নং ১২১ ও ১২২ অনুসারে গ্রহন যোগ্য নয়। প্রত্যেক বৈধ বাংলাদেশী নাগরিক সে নিজ বসবাস ও কর্মক্ষেত্রে ভোট প্রার্থী ভোটার তালিকা ভূক্ত হওয়ার ও নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। অনুচ্ছেদ নং ১১ অনুযায়ী এটা তার গণতান্ত্রিক অধিকার। পার্বত্য চুক্তি ও পরিষদ আইনে প্রণীত ভিন্ন বিধি বিধান তাই অসাংবিধানিক।

৩। তিন উপজাতীয় রাজা বা সার্কেল চীফের নিযুক্তি হলো ঔপনিবেসিক সামন্তবাদী ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থা স্বাধীনতার পরিপন্থী। অনুচ্ছেদ নং ১ ও ১১ এই ব্যবস্থাকে অনুমোদন করে না। আইনতঃ জনগণের উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব নেই। অথচ পার্বত্য চুক্তিতে তারা পদাধিকার বলে স্থায়ী বাসিন্দা সদনপত্র প্রদান, পরিষদে আসন গ্রহন ও বক্তব্য দানের অধিকারী। ভূমি কমিশনে ও তারা পদাধিকার বলে অন্তর্ভূক্ত সদস্য।

জমি বন্দোবস্ত, মালিকানা, ব্যবসা বাণিজ্য, আর কর্ম সংস্থানে উপজাতীয় অগ্রাধিকার, বাঙ্গালীদেরকে অবিচার ও বঞ্চনার অতল গহবরে নিক্ষেপ করেছে। তাদের বাঙ্গালী পরিচয়টা ও অস্বীকৃত। উপজাতিদের একটি সাম্প্রদায়িক তালিকা আছে, কিন্তু অউপজাতিদের কোন তালিকা নেই। সুতরাং অউপজাতীয় স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দাদের পরিচয়টা ও বিতর্কিত। দয়া করে রাজা বাবুরা প্রজা বলে স্বীকার করলেই মাত্র রক্ষা। এরূপ ভাগ্যবান বাঙ্গালীদের তালিকায় সেটেলার বাঙ্গালীরা নেই।

রেডক্লিফ রোয়েদাদে পার্বত্য চট্টগ্রাম পূর্ব পাকিস্তানভূক্ত হয়েছে, মুসলিম সংখ্যাধিক্যের বলে নয়। বাঙ্গালী আধিপত্যের বলে বাংলাদেশের জন্ম হয়েছে। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী সংখ্যাধিক্য ছিলো না। সুতরাং এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে টিকে থাকার উপায় মাত্র দুটি। একঃ উপজাতিদের স্বেচ্ছায় বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার করে থাকা। দুইঃ স্বপক্ষীয় জনশক্তি বাঙ্গালীদের পৃষ্ঠপোষন ও শক্তিবৃদ্ধি।

ইতোমধ্যে প্রমাণিত হয়েছে, প্রথম উপায়টি নির্ভরযোগ্য নয়। শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উপজাতিরা সশস্ত্র বিদ্রোহ করে, দীর্ঘ আড়াই দশক কাল উৎপাত করেছে। পার্বত্য চুক্তির অধীনে তাদের আত্মসমর্পণ, স্থায়ী শান্তি গ্রহণ কিনা তা অনিশ্চিত। এতদাঞ্চলের বিদ্রোহ সাময়িক বিরতি গ্রহণ করেছে মাত্র। রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পক্ষে এই সুযোগে স্বপক্ষীয় জনশক্তি পোষণই সমাধান। স্থানীয় বাঙ্গালী জন শক্তির পৃষ্ঠ পোষন ছাড়া তা কখনো সম্ভব নয়। বাঙ্গালী আবাসন না গড়ে ও এই লক্ষ্য অর্জন সম্ভব।

১৫ উপজাতীয় আনুগত্যের সংকট

সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব ২৮ জানুয়ারী ২০০৪

পার্বত্য চুক্তি নিজেই সরকারকে অসাংবিধানিক দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। এটি বাতিল, সংশোধনের প্রয়োজন নেই। উপজাতীয় প্রধান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গত ছয় বছরেও পার্বত্য চুক্তি বুঝতে ও নিজ উগ্র অশালীন বিদ্রোহী চরিত্র শুধরাতে সক্ষম হননি। পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন, সন্তু লারমার মাঝে আচরণগত পরিবর্তন অবশ্যই হবে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের দ্বারা, তার মাঝে উগ্র একনায়ক সুলভ চরিত্র গড়ে উঠেছে। তার অবসান হওয়া সময় সাপেক্ষ। তিনি নিজেকে একজন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ভাবতে শিখেছেন। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বরিত হয়ে, তিনি নিজেকে আরো ছোট কিছু ভাবতে পারছেন না। এ কারণে কেবিনেট মন্ত্রীদের পরোয়া না করা, তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত না হওয়া ইত্যাদি ঔদ্ধত্য হলো, তার সাময়িক সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ধরণের অহমিকা। তবে তাকে শুধরাবার সময় দেয়া উচিত।

উপরোক্ত বিচেনায়, সন্তু বাবুর উগ্র আচরণ ও সমালোচনায় আওয়ামী সরকার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ক্ষেপাতে কড়া বক্তব্য দেননি, কঠোর কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। অথচ দেশ ও জাতির অখন্ডতা রক্ষা ও সংবিধান মান্যতায়, সন্তু বাবুকে অঙ্গীকারাবদ্ধ করা সত্ত্বেও, তার অপ্রিয় প্রতিটি কাজের গোড়াপত্তন আওয়ামী সরকারই করে গেছেন। তাকে একদিকে মর্যাদার তুঙ্গে তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে অভ্যর্থনা দিয়ে আপ্যায়িত করে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়েছেন। অপরদিকে সাংবিধানিক সংস্থানহীন একটি ভঙ্গুর আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষুদ্র চেয়ারম্যান পদে নামিয়ে দিয়ে অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত করেছেন। যে অগ্রাধিকার ও মর্যাদাগুলো মঞ্জুর করে, তাকে খুশিতে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল, তা সাংবিধানিক বাধায় এখনি ফাঁপা বেলুনের মত ফুটে যাওয়ার উপক্রম। জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পূর্ণ মন্ত্রীর পদ নিজেই ধরে রেখেছেন, আর পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটিও জনৈক বাঙ্গালী এমপি'র করায়ত্ত হয়েছে। এ করা বেআইনী নয়। সন্দেহ থাকলে সন্তু বাবু আইনী লড়াই করে দেখতে পারেন। অগ্রাধিকার আর সংরক্ষিত পদের ব্যাপারেও আইনী লড়াই হলে, নিশ্চিতরূপেই সন্তু বাবু হেরে যাবেন। এসবই হবে আওয়ামী চুক্তির কৌশলপূর্ণ মোসাবিদার সুফল। সন্তু বাবুদের ডুবাতে আর কাউকে কিছু করতে হবে না।

তবু সন্তু বাবু কিসের বলে বকে বেড়ান যে, চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। অথচ চুক্তির মূলোৎপাটনের বর্ণনায় তারই স্বাক্ষর আছে। মুখবন্ধেই চুক্তির গোড়া কর্তন হয়ে গেছে। এ জন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তার নিজেরই। দোষ ধরিয়ে দিয়ে তাকে কেউ ক্ষেপাতে চায় না। ধামাচাপা চলছে। বকাঝকা সহ্য করা হচ্ছে। কেউ রহস্য ভেদ করছে না। এ যে অপ্রিয় সত্য কথন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত, তবু

তারা এক সুতায় বাঁধা। বিএনপি আর আওয়ামীতে উপজাতীয়দের যারা দলভূক্ত, তারাও সন্তু বাবুর প্রতি অনুরক্ত। কেউ তার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে সোচ্চার নন। আগে তিনি আওয়ামী সরকারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আওয়ামীপন্থী এক দীপঙ্কর তালুকদারের মৃদু কিছু পত্যুত্তর ছাড়া, অন্যান্য আওয়ামীপন্থী উপজাতীয়রা নিশ্চুপ থেকেছেন। দীপঙ্কর বাবুর দৃঢ়তা এখানে যে, তিনি খাঁটি আওয়ামীপন্থী। বর্তমান জোট সরকারে বা বিএনপিতে দৃঢ় চেতা এরূপ কোন উপজাতীয় নেতা নেই। যারা আছেন তারা জে এসএস থেকে ধার করা। তাই দলে না থাকলেও তারা মূল গুরু সন্তু বাবুর বক্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর দেন না। গুরু যখন বলেনঃ গত ইলেকশনে আমি ভোট বর্জন করায় আওয়ামী বাক্সে উপজাতীয় ভোট পড়েনি, তাই তুমি বিএনপি প্রার্থী মণি স্বপন বাঙালী ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়েছে। আমারই কৃত চুক্তির বলে তুমি এখন উপমন্ত্রী। আমি পূর্ণমন্ত্রীর জন্য আন্দোলন করছি। তাতে সফল হলে তার সুফল পাবে তুমি। আমার বিরোধিতা করা তোমার পক্ষে আত্মঘাতী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মণি স্বপন দেওয়ান সরকারের পক্ষে মুখ খুলেন না। সন্তু বাবু সরকারকে নেস্ত-নাবুদ করেন, কিন্তু গুরুকে তিনি প্রত্যুত্তর দেন না। একই অবস্থা রাঙ্গামাটির জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ানের ও উদ্বাস্তু পূণর্বাসন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের। মণি স্বপনের মত এই দুজনও জেএসএস শিবির ত্যাগী লোক। তবে সাবেক গুরু সন্তু বাবুর প্রতি এখনো তারা অনুগত। তারা তাকে ক্ষেপাতে চাননা। হুমকি ধমকি আর সমালোচনায় সরকার নেস্ত-নাবুদ হচ্ছেন। কিন্তু সরকারের এই ক্ষমতাভোগীরা গুরুর বিপক্ষে চুপ। এদের ক্ষমতায় বসিয়ে রেখে বিএনপি বা জোট সরকারের লাভ অতি ক্ষীণ? এরা খাঁটি সরকার দলের লোক হলে, প্রতিবাদী আওয়াজে সন্তু বাবুকে কোণঠাসা করে তোলা সম্ভব হতো। উল্টা তারা ভাবছেন, তাদের পদোন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হলো সন্তু বাবুরই আন্দোলন। উপ মন্ত্রী দেওয়ানের সুপারিশে অপর দুই দেওয়ান চেয়ারম্যান হয়েছেন। এটা আরেক স্বজনপ্রীতি।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমল থেকে প্রতিটি সরকার পছন্দসই উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে বড় বড় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে সমাসীন করে তাদের সপক্ষে টানার ও উপজাতীয়দের খোশ করার চেষ্টা করে আসছেন। এছাড়াও সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যঃ তাদের মন থেকে বঞ্চনার মনোভাব আর বিদ্রোহ অসন্তোষ দূর করা। তবু তাতে বাঞ্ছিত সুফল ফলেনি। অতঃপর রাজনৈতিক মাধ্যমে সুবিধা পত্তন করা হয়। গঠিত হয় স্থানীয় শাসন ভিত্তিক আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা পরিষদ।

উন্নয়ন বোর্ডকে করা হয় আরো গতিশীল। সংসদীয় আসন দু'টির স্থলে তিনটি করা হয়। শান্তি স্থাপন ও ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ক্ষমা ও প্রচুর সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সমঝোতা চুক্তিও সম্পাদিত হয়। প্রধান বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান ও তার সঙ্গী সাথীদের সদস্য পদে সম্মানজনক ভাবে পূনর্বাসিত করাহয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় ও একটি উদ্বাস্তু পূনর্বাসন

টাস্ক ফোর্স গঠন করে, তাতে উপজাতীয়দের করা হয় মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান। অনেককে দেয়া হয় উপমন্ত্রী ও প্রতি মন্ত্রীর মর্যাদা। মোটা বেতন ভাতা আর দামী গাড়ী-বাড়ী তাদের প্রাপ্য হয়।

আশা করা গিয়েছিলঃ এই অনুগৃহীত নেতারা অতঃপর কৃতজ্ঞতা ও শালীনতায় অভ্যস্ত, আর বিদ্রোহী আচার আচরণ ও উগ্রতা পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ হবেন। ফিরে আসবেন স্বাভাবিক ও ভদ্র জীবনযাপনে। অবসান হবে অশান্তি, হানাহানি, হিংসা ও বৈরিতার। কিন্তু সকলই গরল ভেল। নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে প্রচন্ড সন্ত্রাস ও অরাজকতার। এই পরিস্থিতি আরো অধিক উপজাতীয় তোষণ, অশান্তি ও অসন্তোষকে মদদ দিচ্ছে।

সব পাওয়ার সূত্র বৈরিতা নয়। সব পাওয়া ঝটপট এক সাথে হয় না। পূর্ণতা অর্জন সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ। তজ্জন্য দেশ ও জাতিকে স্বপক্ষে টানতে হবে। উপজাতীয় সমাজে এই কৌশলের প্রচন্ড অভাব আছে। বাঙালী প্রধান এই দেশে বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলন, আর ক্ষমতাসীন সরকারকে হেনস্তা করা, উপজাতীয় রাজনীতির সঠিক কৌশলরূপে মান্য হতে পারে না। সন্তু লারমা তাদের ভূল নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সচেতন উপজাতীয়দের এই ভূল শুধরাতে এগিয়ে আসার প্রয়োজন আছে।

সরকারে উপজাতীয়দের বন্ধু আছেন। সবাইকে বৈরী ভাবা ভুল। এভাবে বৈরী করার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই উপর বর্তাবে।

১৪. শান্তি ও সংঘাতে পার্বত্য অঞ্চলে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ভূমিকা

(১) এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সেনা বাহিনী পার্বত্য জন সংহতি সমিতি কর্তৃক বেশি সমালোচিত হচ্ছে। তাদের কাছে সেনা বাহিনীর ভাবমূর্তি নিছক উৎপীড়কের। দেশ রক্ষার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন ছাড়া ও তারা যে শান্তি রক্ষা ও সেবা মূলক বিপুল কর্মকান্ডের দ্বারা গঠনমূলক অনেক ভূমিকাই রাখছে, উপকৃত উপজাতীয় সমাজই তার সাক্ষী, তজ্জন্য তাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। বিপরীতে জনসংহতি সমিতি নোটিশ জারী করেছে; অবিলম্বে অপারেশন উত্তরনসহ সকল অস্থায়ী সেনা, আনসার, এপিবি ও ভিডিপি ক্যাম্প প্রত্যাহার করে নিতে হবে। এই দাবী সহ অপর তিনটি দাবীতে তারা আগামীতে তিন পার্বত্য জেলায় সকাল-সন্ধ্যা হরতাল আহবান করবে। তবে সকল বিবেচনায় এটা মান্য যে, এটা এক হটকারী আন্দোলন। যার লক্ষ্য শান্তি স্থাপন নয়, উত্তেজনা সৃষ্টি।

পার্বত্য চট্টগ্রাম উপদ্রুত অঞ্চল তো বটেই, এর তিনদিক বিদেশী সীমান্তের দ্বারা বেষ্টিত। এখানকার আভ্যন্তরীন সংঘাত সংঘর্ষ অপহরণ হত্যা সন্ত্রাস ইত্যাদি হলো চলমান দৈনন্দিন ঘটনা। প্রতিদ্বন্দী জেএসএস ও ইউপি ডিএফ নিত্যদিন পরস্পরের প্রতি মারমুখী। এমন দিন নেই যে দিন তারা পরস্পর কর্তৃক আক্রান্ত হতাহত ও অপহৃত হচ্ছে না। তদুপরি মাঝে মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার ও সৃষ্টি হচ্ছে, যেমন মহালছড়ি ধ্বংস যজ্ঞ, মারিশ্যার ফাতেমা বেগম হত্যাজনিত উত্তাপ ইত্যাদি। এসব সংঘাত, সংঘর্ষ, দুষ্কর্ম ও উত্তেজনায়, নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালনে পুলিশ সম্পূর্ণ অক্ষম, তাই সেনা বাহিনীকেই ভূমিকা গ্রহনে অবতীর্ণ হতে হয়। সেনা ভূমিকা এখানে নিয়ন্ত্রকের নয়, সহায়কের। ধৃত অপরাধী, অস্ত্র, গোলা বারুদ আর উদ্ধারকৃত হতাহতদের পুলিশের হাতে সোপর্দ করে তারা নিজেদের ক্যাম্পে নিষ্ক্রান্ত হয়। এই ভূমিকা না রাখলে, জনসাধারণ তাদের নেতৃবৃন্দ আর প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ও নিরাপদ হতেন না। কেডার বাহিনী বেষ্টিত থাকলেও শীর্ষ উপজাতীয় নেতা ও তার সঙ্গী সাথীদেরও জীবন বিপন্ন হতো। তাই এটা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীরই কৃতিত্ব যে, সন্তু বাবুরা ঘরে বাইরে নির্বিঘ্নে ও নিরাপদে আছেন। বাংলাদেশ সেনা বাহিনী নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় শক্তি। তার কাছে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী স্বধর্ম বিধর্ম, জাত-বেজাত ও শত্রু মিত্রের ভেদাভেদ নেই। সে দেশ ও জাতির সেবায় নিরলস উৎস্বর্গীকৃত। শান্তিকালে সে সবার

সেবক ও বন্ধু । একমাত্র দেশ রক্ষার কাজেই সে নির্মম । অতএব এটা ভুল ধারণা যে, সেনা বাহিনী উপজাতীয়দের জন্য উৎপীড়ক ও বাঙ্গালীদের দুষ্পকর্মের সহায়ক । এটা মোটেও স্মরণ করা হয়না যে, সেনা বাহিনী হলো বিবদমান পক্ষ সমূহের মধ্যকার নিরাপত্তা দেওয়াল । সেনা বাহিনীর সেবা ও গঠন মূলক বিপুল কার্যক্রম, প্রভূত উপকার সাধন করছে । তাদের অনুপস্থিতিতে নিরাপত্তার অভাব বাড়বে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন,ক্রীড়া ও সংস্কৃতিগত অনেক শূন্যতা প্রকট হয়ে উঠবে ।

প্রতিবাদী নেতৃবৃন্দ একবারও কি ভেবে দেখেছেনঃ সেনা প্রত্যাহারের দাবীর কারণে তাদের প্রতি এই সন্দেহের উদ্ভব হচ্ছে যে, গোটা পার্বত্য অঞ্চলকে জন সংহতি সমিতি নিজ সশস্ত্র নিয়ন্ত্রনাধীন করতে আগ্রহী ? বাংলাদেশী অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করার এটা একটি সূত্র । এটা ও ভেবে দেখতে হবে যে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্র গোটা দেশ । বিশেষতঃ এই পার্বত্য বিদ্রোহ প্রবন এলাকা ও সীমান্তকে দৃঢ় সেনা প্রহরাধীন রাখার বিকল্প নেই । এই প্রতিরক্ষা কৌশল অপরিহার্যরূপে পালনীয় । এতে কোন শৈথিল্য প্রদর্শনের অবকাশ নেই । তাই পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা প্রত্যাহারের দাবীকে দূরভিসন্ধিমূলক ভাবা দেশ প্রেমেরই অংশ । প্রতিবাদী উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের এরূপ স্পর্শকাতর বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত । কিছু ক্যাম্প প্রত্যাহারের চুক্তি হয়েছে, এটাই আমোঘ যুক্তি হতে পারে না । চুক্তিতে ভুল ত্রুটি হতে পারে এবং বাস্তবে তা হয়েছেও । যেমন প্রতি দফায় সংবিধান অনুসরণের অঙ্গীকার পালন করা হয়নি, সম অধিকার, মৌলিক অধিকার, নির্বাচন ইত্যাদি উপেক্ষিত হয়েছে । সুতরাং শান্তির স্বার্থে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করে নেয়াই উচিত । এটাও ভুল যে, আন্দোলনের নামে উপজাতীয়দের পৃথক জুম্ম জাতীয়তাবাদী চেতনা দেয়া হচ্ছে, যা জাতি ও দেশের অখন্ডতার পরিপন্থী । বাংলাদেশ সেনা বাহিনী এই অখন্ডতার অতন্দ্র প্রহরী । এই ব্যাপারে কোন ছাড় নেই ।

আভ্যন্তরিন নিরাপত্তা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন পাশাপাশি বিদেশী সশস্ত্র বিদ্রোহী আর দুস্কৃতিকারীরা ও অরক্ষিত ও দুর্গম সীমান্তের পাহাড় ও বনে, আত্মগোপন করে ঘাটি গেড়ে আছে; এটা কুমতলব এমন সন্দেহ করা অমূলক নয় । ইতিমধ্যে অনেক বিদেশী দুস্কৃতিকারী এবং বিপুল অস্ত্র ও গোলা-বারুদ এই অঞ্চলে ধরা পড়েছে । আভ্যন্তরীন দুস্কৃতিকারীদের সহযোগে এরা বিপজ্জনক শক্তিতে পরিণত হতে পারে । প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোতে এরা দুষ্কর্ম চালিয়ে, এখানকার নিরাপদ আশ্রয় ব্যবহার করে, এখানেও হত্যা, অপহরণ, লুটপাট, চাঁদাবাজি ইত্যাদি দুষ্কর্ম চালিয়ে যাচ্ছে । তাতে প্রতিবেশীদের সাথে রাষ্ট্রীয় সৌহার্দ্য বিঘ্নিত হচ্ছে, এবং স্থানীয় শান্তি-শৃঙ্খলায় ও ব্যঘাত ঘটছে । এইসশস্ত্র সংগঠিত দেশীবিদেশী দুস্কৃতিকারীদের দমাতে পুলিশবাহিনী যথেষ্ট সক্ষম নয় । এই কাজে সেনা বাহিনীর বিকল্প নেই । এই সব কারণে পার্বত্য অঞ্চলে সেনাবাহিনীর অবস্থান অপরিহার্য । এই অবস্থানকে চ্যালেঞ্জ করা ভুল ।

চুক্তিমত জেলা সদর সহ মাত্র ছয়টি স্থানে সেনা অবস্থান অব্যাহত রাখা যথেষ্ট নয় । দূরবর্তী দুর্গম উপদ্রুত স্থানে, তাৎক্ষনিক প্রয়োজনে সেনা একশন পরিচালনা, তদ্দারা বাধাগ্রস্ত

হবে। সেনা শক্তিকেএরূপ অক্ষমতায় আবদ্ধ করা ক্ষতিকর। রুমার টি এন ও কে দুস্কৃতিকারীরা অপহরণ করে, বাংলাদেশ মিজোরামও আরাকান সীমান্তের ত্রিভুজের একস্থানে আটক করে রেখেছিলো। তাকে উদ্ধার করতে নিকটবর্তী রুমা ক্যাম্পের পরিচালিত সেনা অভিযান সফল হলেও, তা তাৎক্ষনিক সম্ভব হয়নি। বিদেশী নির্মাণ কর্মীরা মহালছড়ি সড়ক থেকে অপহৃত হবার পর কালা পাহাড় এলাকায় আটক থাকেন। নিকটবর্তী আর্মি ক্যাম্প বেতছড়ি থেকে তাৎক্ষনিক উদ্ধার অভিযান চালান হলেও তাতে সুফল পাওয়া যায়নি। সুতরাং আর্মি ক্যাম্প শুধুমাত্র ৬টিতে সীমাবদ্ধ করা মোটেও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়। এই ব্যাপারে জনসংহতি সমিতির জেদ বস্তুতঃ হটকারী। এ ব্যাপারে তাদের নমনীয় হওয়া বাঞ্ছনীয়।

সেনা অবস্থানের উপকারিতা নিয়ে জনসংহতি সমিতির ভাবিত না হওয়া দুঃখজনক। আজ পর্যন্ত সেনা বাহিনী উপজাতীয়দের মাঝে যে বিপুল পরিমাণ সেবা কার্যক্রম চালিয়েছে, মুল্যের হিসাবে তার পরিমাণ বহু কোটি টাকা অংকের সমান। ঔষধ সরবরাহ, চিকিৎসা, শিক্ষাবৃত্তি, কম্পিউটার ট্রেনিং, শিক্ষার্থীদের বই পুস্তক দান, লাইব্রেরী ও ক্লাব সমুহে পুস্তক সরবরাহ, ক্রীড়া সামগ্রী প্রদান, কিয়াং ও বিদ্যালয় সমুহে আসবাব পত্র দান, অভাবী ও রোগ গ্রস্তদের চিকিৎসা ও নগদ সাহায্য, ক্ষতিগ্রস্ত কিয়াং, স্কুল ঘর, ক্লাব ও যাত্রী ছাউনী মেরামত ও নির্মাণ, উপদ্রুতদের পুনর্বাসন, গৃহ নির্মাণ সাহায্য, বীজ, চারা ও আর্থিক অনুদানের দ্বারা কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদন সহায়তা ইত্যাদি বিপুল সেবা অবদানকে একত্রিত করা হলে দেখা যাবে পরিমাণে এসব বিরাট কিছু এবং উপকার রূপেও এসবের অবদান অসামান্য। বিপরীতে দুষ্কর্ম আর নিপীড়নের উদাহরণ একেবারে শূন্য না হলেও, বলা যায়, সে হয়তো বিরল কোন দুর্ঘটনা; যাকে তুচ্ছ জ্ঞানে অবজ্ঞা করাই শ্রেয়।

পার্বত্য অঞ্চলের দুর্গমতার অনেকটা সেনা নির্মাণ বিভাগের দ্বারা বিদূরিত। বান্দরবনের রুমা থানচি সড়ক, আলী কদম থানচি সড়ক, আজিজ নগর রুমা সড়ক ইত্যাদি সার্বিকভাবে সেনাবাহিনী কর্তৃক নির্মিত। বর্তমানে বাঘাইহাট সাজেক সড়কটি ও সেনা বাহিনীর দ্বারা নির্মিত হচ্ছে। রাজস্থলী- ফারুয়া- বিলাইছড়ি- জুরাছড়ি- বড়কল সড়কটিও তদ কর্তৃক নির্মাণের প্রক্রিয়াধীন আছে। রাঙ্গামাটি-চট্টগ্রাম সড়ক, মানিকছড়ি- মহালছড়ি সড়ক, ঘাগড়া- চন্দ্রঘোনা- রাজস্থলী সড়কের মেরামত ও পূনর্বাসন দায়িত্বটিও তার উপর অর্পিত হয়েছে।

সার্বিক বিচারে সেনা বাহিনী একটি সুশৃঙ্খল জাতীয় প্রতিষ্ঠান যার উপকারিতা আর অপরিহার্যতা অবশ্যই স্বীকার্য। দেশ রক্ষা, শান্তি স্থাপন, সেবা ও ত্রাণ কাজে দেশে বিদেশে তাঁর উজ্জ্বল ভাবমূর্তি গঠিত হয়েছে।

কঠোরতা সেনা চরিত্রেরই অংশ। প্রতিরক্ষা মূলক কর্তব্য পালন ক্ষেত্রে তার কোন সদস্যের দ্বারা, অপ্রীতিকর কোন ঘটনা ঘটে যাওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। সেনা সদস্যরা চুমো খাওয়ার জন্য নয়, শত্রু নিধনই তাদের প্রধান কর্তব্য। তবু যুদ্ধ ক্ষেত্র ছাড়া অন্যত্র তারা আচরনে ভদ্র ও মানবতায় সমৃদ্ধ। সে প্রশিক্ষণ ও তাদের দেয়া হয়। সেনা বাহিনীতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ আর দুষ্কর্ম সর্বোচ্চ শাস্তিযোগ্য অপরাধ। এর জন্য চাকুরীচ্যুতি; জেল জরিমানা

আর মৃত্যুদন্ড পর্যন্ত প্রাপ্য। যার অবতারনা এই অঞ্চলের ঘটনা প্রসঙ্গে ও হয়েছে। তাই জন সংহতি সমিতির এ ভাবনা অনুচিত যে সেনা সদস্যরা এই অঞ্চলে দুষ্কর্ম আর বাড়াবাড়ির হোতা এবং তাতে তারা শাস্তি থেকে পার পেয়ে যায়।

সর্বশেষ ঘটনা মারিশ্যার ফাতেমা হত্যার কথাই ধরা যাক, সেনা বাহিনী অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে দুই বিবদমান সম্প্রদায় পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের দাঙ্গালিপ্ত হওয়া থেকে বিরত রেখেছে। মহালছড়ির মত আরেক লঙ্কাকান্ড বেধে যাওয়া অসম্ভব ছিলোনা। সেনা বাহিনী তার ভয়ঙ্কর ও আপোষহীন অবস্থানের দ্বারা সাম্প্রদায়িক উত্তাপ উত্তেজনাকে দমিত করেছে। তার নিরপেক্ষ মধ্যবর্তী বারন শক্তির আবির্ভাব ছাড়া এবার মারিশ্যা সাম্প্রদায়িক হানাহানিও ধ্বংসযজ্ঞ থেকে রক্ষা পেতোনা। যদি ও বিবদমান সম্প্রদায় দুটির ফাতেমা হত্যা ঘটনা ও তার মূল্যায়ন সংক্রান্ত বিচার বিবেচনা ভিন্ন।

১৫. পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী উপজাতীয় ইতিহাস

কিছু শ্রদ্ধেয় উপজাতীয় পন্ডিত অযথাই উষ্মা প্রকাশ করেছেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের উল্লেখযোগ্য প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীরা আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, এবং আর্মি ও প্রশাসন তাদের মদদ যোগাচ্ছে, যথা ঃ

"স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টি হওয়ার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে সমতল ভূমির লোকদের আগমন বেড়ে যায়। .... ভাগ্যের অন্বেষনে আসা সমতলভূমির এসব লোকজন প্রথমেই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের সাথে পরিচিত হয়ে ব্যবসার সুযোগ খুঁজতে থাকেন। এদের কেউ কেউ অত্র অঞ্চরে পশ্চাদপদ, বঞ্চিত ও শোষিত জনগোষ্ঠির সহানুভূতি ও সমর্থন আদায়ের লক্ষ্যে বামপন্থী রাজনৈতিক দলেও নাম লেখান। ......

পার্বত্য চট্টগ্রামে বসতি স্থাপনকারী সমতল ভূমির এই বাসিন্দারা এখানকার ব্যবসা বাণিজ্য তথা পুরা অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার ক্ষেত্র ইতিমধ্যে দখল করে নিয়েছেন। সংবাদ পত্রের মালিক, সম্পাদক এবং সাংবাদিক ও এরাই। এরাই সংবাদ পত্রে কলাম লেখক, উপজাতীয় ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির গবেষক।। এদের দু'একজন শেষপর্যন্ত নিজেদেরকে ইতিহাসবিদ হিসাবেও দাবী করছেন। ...... তাদের গবেষণার মুল বিষয় পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী, এই বিষয়ে ইতোমধ্যে দু'একটি বই প্রাশিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বর্তমান বাসিন্দারা এই অঞ্চলের আদি বাসিন্দা বা আদিবাসী নহে, সে কথাই উপরোক্ত বইগুলোতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। .... কিছু লোক ভাগ্য পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়ে, শেষ পর্যন্ত স্থানীয় প্রশাসন বিশেষ করে সামরিক বাহিনীর আশীর্বাদ পুষ্ট হয়ে উপজাতীর ইতিহাস গবেষণার নামে উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচারনার কাজে লিপ্ত হয়েছেন"। (সূত্রঃ সাময়িক পত্র ঃ সুবলং বৈসাবী সংখ্যা ২০০০ প্রতিবেদক বাবু জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা)।

এই বিদ্বেষপূর্ণ কথাবার্তার পাশাপাশি ঐ পন্ডিত উপজাতীয় ইতিহাসের ভ্রান্তিপূর্ণ কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন, যা তথ্যানুরাগীদের বিভ্রান্ত করবে। তার জানা থাক ভাল যে, আই,এল,ও কনভেণশন ১০৭ ও ১৬৭ অনুযায়ী নিজ নিজ জাতীয় আবাসভূমিতেই আদিবাসী সংজ্ঞা প্রযোজ্য। বাংলাদেশ পার্বত্য উপজাতিদের অভিবাসিত দেশ, মূল আবাসভূমি নয়। সুতরাং বাংলাদেশ কর্তৃক তাদের স্থানীয় আদিবাসী স্বীকৃত না হওয়া সঠিক সিদ্ধান্ত।

রাজনীতিক সহ কিছু উপজাতীয় পন্ডিত বিকৃত ইতিহাস চর্চায় উৎসাহী, যা তাদের উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যেরই অনুসারী। অথচ তাদেরই লোকগীতি, স্মৃতিকথা পূরাতত্ব ইত্যাদি প্রমান করে, মাত্র বৃটিশ আমল থেকেই তারা এদেশে অভিবাসিত বাসিন্দা। তাদের বহিরাগমনের উপর সীলমোহর হলো পার্বত্য শাসন বিধির ৫২ ধারা।

অধিকাংশ লোক, তথ্য চর্চা কালে একথা ভুলে যান যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম আসলে চট্টগ্রামেরই অংশ, যা ১৮৬০ সালে পৃথক জেলায় পরিণত হয়েছে, এবং চট্টগ্রামী জনগোষ্ঠী হলো এই উভয় অঞ্চলের আদি বাসিন্দা। মৌলিকত্বের বিচারে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে চট্টগ্রামী মূলের লোকজনই মাত্র নিজেদের স্থানীয় আদিজন বলে দাবী করার হকদার। পার্বত্য চট্টগ্রাম যেহেতু আদি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চল নয়, এবং এখনো চট্টগ্রাম নামেই পরিচিত, সেহেতু এই উভয় অঞ্চলের আদি মানব গোষ্ঠীর মৌলিক পরিচয় হবে চট্টগ্রামী। কিন্তু স্থানীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠী অদ্যাবধি কখনো এ দাবী করেননি যে, তারা চট্টগ্রামী মূলের লোক। সুতরাং তাদের স্থানীয় আদিবাসী, আদি বাসিন্দা বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার দাবী যুক্তিগ্রাহ্য নয়। আগে ইতিহাস ও যুক্তিতে স্থান করে নিতে হবে, নয়তো আই,এল,ও কনভেনশন ও কারো মুরব্বিয়ানা কোন কাজেই আসবে না।

১৯৯৩ সালের ১৪-২৫ জুন অনুষ্ঠিত ভিয়েনা মানবাধিকার কনভেনশনে বাংলাদেশের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরহুম মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশে কোন আদিবাসী থাকার কথা অস্বীকার করেন এবং অদ্যাবধি তাই এদেশের রাষ্ট্রীয় নীতি। এই অস্বীকৃতির বিপরীতে, স্থানীয় উপজাতীয় সংখ্যালঘুদের উপস্থাপনীয় যুক্তি হবে, এমন সব তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন, যা প্রমান করবে যে, তারা ইতিহাস স্বীকৃত প্রকৃত স্থানীয় আদিবাসিন্দা ও আদিবাসী। জাতিগত ভাবে যদিও তাদের বহিরদেশীয় আদিবাসী বংশধর হওয়া অনস্বীকার্য্য। তাদের চট্টগ্রামী মূলের লোক দাবী না করার রহস্যটা অবশ্যই রাজনৈতিক এবং তা হলো স্বতন্ত্র জুম্ম জাতি সত্তার দাবী প্রতিষ্ঠা। এর ফল হলো এই যে, তারা আদি ও স্থানীয় বাসিন্দা রূপে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না।

স্থানীয় উপজাতীয়দের একমাত্র যৌক্তিক জোর হলো, তারা পৃথক জেলাবাসী হওয়া অবধি স্থানীয়ভাবে সংখ্যাগুরু, এবং প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী। ভুমি প্রশাসন ও জন নিয়ন্ত্রণ ও তাদের অভিজাতদের হাতে ন্যাস্ত। এগুলো পৃথক রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রেও বটে। স্থানীয়ভাবে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও প্রচলিত আইন কানুন রদ করা মানে উপজাতীয়দের ঐ ক্ষমতা কেন্দ্রের বিলোপ সাধন, যা তাদের সাতন্ত্র্য ও স্বাধিকারের পরিপন্থী। এটা তাদের অসন্তোষের মূল কারণ। তাদের সংগ্রাম ও আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো বিজাতীয় আধিপত্য রোখা। তাদের দৃষ্টিতে বাঙ্গালী আধিপত্য ও ইসলামী অনুপ্রবেশেরই নাম উপজাতীয় বৈরীতা।

১/১৯০০ রেগুলেশন জারি হওয়া অবধি স্থানীয় উপজাতিদের স্থানীয় আদিবাসীরূপে স্বীকৃতি ছিলোনা। সুতরাং তখন পর্যন্ত তাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বাঙ্গালীদের সাথে ছিলো তুলনার অযোগ্য। বিপুল সংখ্যা হওয়া সত্বেও ১৮৬০ পর্যন্ত অখন্ড চট্টগ্রামে, বাঙ্গালীদের

তুলনায় তারা ছিলো সংখ্যা লঘু। কিন্তু জন বিরল পাহাড় ও বন অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চল, পৃথক জেলা হওয়ার সুবাদে, রাতারাতি ঐ শরনার্থী বংশধর উপজাতীয়রা, স্থানীয়ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়ে যায়। তার সাথে যুক্ত হয় অভিবাসনের স্বীকৃতি এবং স্থানীয় লোক প্রশাসন ও ভূমি প্রশাসনে অংশিদারিত্ব,যা ছিলো অযৌক্তিক। সর্বোপরি বাঙ্গালী নিয়ন্ত্রনে ব্যবহৃত হয়; অভিবাসন আইন, তাতে বাঙ্গালীরা বিদেশী বিজাতিরূপে বিবেচিত হয়।। এর ফলে তাদের আগমন ও বসতি স্থাপন সীমিত হয়ে যায়। সাথে সাথে উপজাতীয়দের অবাধ বহিরাগমন ও সংখ্যা বৃদ্ধিকে করা হয় উৎসাহিত। বাঙ্গালীদের উপর স্বদেশের ভিতর অভিবাসন আইন প্রয়োগ ছিলো অন্যায় এবং অবাধে উপজাতীয় অভিবাসন মঞ্জুর ছিলো অনভিপ্রেত। বৃটিশ শাসনের ষ্টীম রোলে, বাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠী ছিলো ভীত। তাই কোন প্রতিবাদ বা আন্দোলনও হয়নি।

ঔপনিবেসিক ও খৃষ্ট ধর্মীয় স্বার্থে বৃটিশরা ছিলো বহিরাগত উপজাতীয়দের প্রতি অত্যধিক সহানুভূতিশীল। গায় পড়েই তাদের ভূমি দান ও ক্ষমতাশালী করার প্রক্রিয়া চলে। গড়ে তোলা হয় তাদের নিয়ন্ত্রনাধীন সার্কেল ও মৌজা। সংখ্যায় অল্প বাঙ্গালীরা হয়ে পড়ে তাদের হুকুমবরদার প্রজা, এবং সহায় সম্পদ ক্ষমতা ও যোগ্যতায় নগন্য।

সেই বৃটিশ আমল থেকেই এতদাঞ্চলে একটি নীল নকসার রাজনীতি শুরু হয়েছে। ভবিষ্যতে আরাকান, লুসাই, পার্বত্য চট্টগ্রামও ত্রিপুরার সমন্বয়ে একটি স্বাধীন খৃষ্টান উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তখনই গৃহীত হয়। তাই খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের উদ্যোগও নেয়া হয়। এই লক্ষ্যেই লুসাই, ত্রিপুরা ও আরাকান বিজিত হয়, এবং এখন এই অঞ্চল সমুহে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী উপজাতীয়দের সংখ্যা বিপুল। তারা স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও পৃথক জাতিত্ব অর্জনের পথে আন্দোলনরত, যে আন্দোলন সময়ে সময়ে সশস্ত্র হয়ে ওঠে।

এটা দুঃখ জনক যে, স্বাতন্ত্র্য, স্বাধিকার ও জুম্ম জাতীযতাবাদকামী উপজাতীয়রা, বাংলাদেশ রাষ্ট্র ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিপরীতে জুম্ম ল্যান্ড ও জুম্মজাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। তাদের এই রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের গোপন অভিসন্ধি, দেশ প্রেমিক স্থানীয় বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবি, লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী মহল প্রতিহত করে চলেছেন, তাই তারা এখন ঐ বাবুদের চক্ষু শূল।

স্থানীয় উপজাতীয় পন্ডিত মহল কিছু মুসলিম নাম খেতাবধারী সাবেক উপজাতীয় প্রধানদের নিজেদের রাজা বলে গর্বের সাথে উল্লেখ করে থাকেন। প্রয়াত চাকমা রাজা শ্রদ্ধেয় ভূবন মোহন রায়, স্বীয় পুস্তিকাঃ চাকমা রাজ পরিবারের ইতিহাসেও মুসলিম নাম খেতাবধারী বেশ কিছু পূর্ব পুরুষের উল্লেখ করেছেন। চাক্মা রাজবাড়িতে রক্ষিত কতিপয় সীল মোহরে আরবী অক্ষরে খোদাইকৃত কিছু চাকমা রাজ পুরুষের নাম খেতাবের উল্লেখ আছে। সে সবের একটিতে আছে ইসলাম ধর্মীয় বাক্যঃ রোমান আরাকান- আল্লাহু রাব্বি। শের জব্বার খান ১১১১। মঘী সন হিসাবে ঐ ১১১১ হলো ১৭৪৯ খ্রীঃ সাল।

এই সীল মোহর হলো ঃ অকাট্য ঐতিহাসিক উপাদান, তদ্বারা প্রমাণিত হয়; ঐ সীল

মোহরধারী রাজা শের জব্বার খান ছিলেন ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতিগত ভাবে মুসলমান ও আরাকানী। শের জব্বার খানের নিজের মুসলমান হওয়া প্রমান করে, তার পরিবারভূক্ত উর্ধ ও অধঃস্তনরা ছিলেন বংশগতভাবে ঐ একই ধর্মের অনুসারী। নয়টি সীল মোহরের প্রতিটিতে আরবী হরফ ও প্রতি পুরুষের মুসলিম নাম ওখেতাব হলো একটি ধারাবাহিক ঐতিহ্য, যার সাথে অমুসলিম বৌদ্ধ সংস্কৃতির কোন সংশ্রব নেই। অথচ দাবী করা হয় চাকমাদের বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও পৃথক লেখ শৈলী অতি প্রাচীন। বাস্তবে এসবই বানোয়াট।

রাজা জব্বার খান ও তদীয় পুত্র ধরম বখশ খানের সীল মোহরে হিন্দু দেব দেবীর চর্চা সংযোজিত হওয়ায় বুঝা যায়, তাদের মাঝে খানেক ধর্ম বিকৃতি ঘটেছিলো, তবু তারা ঐতিহ্যগতভাবে ছিলেন মুসলিম। বলা যায় ধরম বখশ খাঁ পত্নি কালিন্দি বিবির ১৮৫৭ সালে বৌদ্ধত্ব গ্রহনই তাদের ধর্মান্তর গ্রহনের প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, যা উত্তরাধিকারের মত রাজ পরিবার ও গোটা চাক্মা সমাজে সংক্রমিত হয়েছে। ঠিক এ কারনেই চাক্মা প্রতিষ্ঠিত প্রথম বৌদ্ধ মন্দির হলো ১৮৬৯ সালে রাজানগরে কালিন্দী স্থাপিত মন্দির ও ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত রাঙ্গামাটির আনন্দ বিহার। বালুখালির রাজবাড়িতে স্থাপিত রাজ মন্দিরটির স্থাপনকাল সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া যায় না। রাজা নগর থেকে রাজবাড়ি বালুখালিতে স্থানান্তরিত হয় ১৮৭৩ সালে। তৎপূর্বে রাজবাড়ি ও চাক্মা বসতি প্রধানতঃ উত্তর ও দক্ষিণ রাঙ্গুনিয়ায় ছিলো, যেখানে স্থাপিত প্রাচীন ও প্রধান বৌদ্ধ মন্দির, মহামুনি বৌদ্ধ মন্দিরটির স্থপতি সমাজ হলো মগ ও বড়ুয়ারা। দ্বিতীয় প্রাচীনতম প্রধান মন্দির হলোঃ চিৎমরম বৌদ্ধ মন্দির, যার প্রধান স্থপতি সমাজ হলো মগেরা। সুতরাং চাক্মাদের বৌদ্ধ ধর্মীয় ঐতিহ্য খুব প্রাচীন নয়। চাকমা রাজ সীল মোহরই প্রমাণ করে, তারা মুসলিম সমাজ থেকে বিবর্তিত। এ কারনেই তাদের ভাষা ব্যবহার আচার- আচরন নাম ও খেতাবে সে ঐতিহ্যের অবশেষ বিদ্যমান। হুজুর, সালাম, বিবি, খোদা, দোজখ, তালাক, খোদা-বান্দা ইত্যাদি শব্দাবলী, এবং দাজ্যা (দাড়িওয়ালা) ও চেক কাবা (চেট কাটা = খতনাকৃত) ইত্যাদি গোষ্ঠী গোত্রীয় নাম, মুসলিম ঐতিহ্যেরই অবশেষ। রাজা ধরম বখশ খাঁর কন্যা চিকন বিবির বিবাহ অমুসলিম নাম ও খেতাবধারী গোপী নাথের সাথে ঘটায়, তৎ পুত্রের নাম রাখা হয় হরিশ্চন্দ্র। তিনি ১৮৭৩ সালে চাকমা প্রধান নিযুক্ত হোন এবং ইংরেজ প্রদত্ত রায় উপাধি গ্রহন করেন। সে থেকেই চাকমা প্রধানদের মুসলিম নাম ও খান খেতাবের ঐতিহ্য পরিত্যক্ত।

চাক্মা পন্ডিত মহলের বিভিন্ন; প্রবন্ধে ও লেখায় ভুল তথ্য প্রদান এবং প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিক উপাদানাদি উপেক্ষা করে ইতিহাস চর্চা করায়, নির্ভূল তথ্য প্রতিষ্ঠার খাতিরে, আমার কলম ধরা। ভুল তথ্যের দ্বারা স্থানীয় উপজাতীয় বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে, যুক্তি-সঙ্গত করার অপকৌশলের পরিণতি হবে বিচ্ছিন্নতাবাদী স্বাতন্ত্র্যের প্রতিষ্ঠা, যার প্রতিবাদ করা আমার দেশ প্রেমের অংশ।

উপজাতি পক্ষের বিভিন্ন লেখায় স্ববিরোধী ও উল্টা পাল্টা তথ্যের সমাহার অনেক। তৈন খাঁ ও তার বংশ ধররা চাকমা ছিলেন, এ তথ্য সম্বন্ধে ও বিভ্রান্তি ব্যক্ত হয়েছে। তাদের নাম খেতাবই তো বলে, তারা আলী কদমের তৈন ছড়া বাসী স্থানীয় মুসলিম অভিজাত

ছিলেন।

বাংলার সুলতানী আমলের ইতিহাস পড়ে জানা যায়, গৌড় সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহ ১৫১২ খ্রীঃ সালে ত্রিপুরা রাজ ধন্য মানিক্যকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অঞ্চল দখল করেন। দক্ষিন চট্টগ্রামে তারই নিযুক্ত শাসক ছিলেন খোদা বখশ খাঁন, যার সদর দপ্ত র ছিলো আলী কদম। ঐ মুসলিম অভিজাতদের বংশধররা ঐ অঞ্চলে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বংশ বৃদ্ধি করেছেন, এটাই স্বাভাবিক। ইতিহাসের ঐ তৈন খাঁ ও শের মস্ত খাঁ-রাই ঐ অভিজাত মুসলিম ঘরানার লোক হবেন, এবং স্থানীয় বাঙ্গালী অবাঙ্গালী জন-সাধারণ হয়ে থাকবেন তাদের প্রজা। চাক্‌মাদের মাঝে জনপ্রিয়তার সুত্রে তাদের চাকমা রাজা আখ্যায়িত হওয়া অসম্ভব নয়।

চাকমা ভাষা, ঐতিহ্য ও রাজকীয় সীল মোহরের প্রদত্ত অকাট্য তথ্য সূত্রের সাথে, আধুনিক যক্তি বিদ্যার ব্যাখ্যা বিশ্লেষন যুক্ত করে, এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছা যায় যে, চাক্‌মারা একটি মিশ্র সম্প্রদায়, এবং তাদের অভিজাতরা ছিলেন প্রধানতঃ মুসলিম। এ সত্য কথন চাকমা বাবুদের পক্ষে অরুচিকর। তাই নিরপেক্ষ তথ্য পূর্ণ বক্তব্যে ও তাদের গায় জ্বালা ধরে। আমি ইতিহাসবিদ ও গবেষক কিনা, তা আমার রচনা ঐশ্বর্য্যেই প্রমানিত হবে। নির্বিচারে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপনকারী বলা, তাদের প্রতি বিদ্বেষেরই নামান্তর। উপজাতিরা কি কখনোই বাঙ্গালীদের স্বজন স্বদেশী ও স্বজাতি হবেন না ?

বাঙ্গালী ব্যবসায়ী সাংবাদিক বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ লোকদের প্রতি জাত বিদ্বেষ অত্যন্ত ঘৃনিত কাজ। এই বাঙ্গালীরা তো উপজাতিদের গুরুজন। সুদুর অতীতকাল থেকে বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা তাদের সাথে পণ্য বেচা কিনা ও লেন দেনে জড়িত। এটা একটি উন্নত সেবা কাজ। সুঁই সুতা থেকে অলংকার পোশাক, ইলেকট্রনিক পণ্য, খাদ্য দ্রব্য ইত্যাদি, প্রতিটি প্রয়োজনীয় পণ্য, বাঙ্গালী ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে উপজাতীয়দের হাতে পৌছে। উপজাতীয়রা তো কোন উন্নত ভোগ্য পণ্যই উৎপাদন করেনা। দা, কুড়াল, খন্তা, চামিচ, সুঁই সূতা, লাঙ্গলের ফলা, হুকার চিলিম ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও নিম্নমানের পণ্য সমাগ্রী তো বটেই প্রতিটি উন্নত ও কারিগরি পণ্যাদি আসবাব পত্র ইত্যাদি পর্যন্ত কিছুই উপজাতীয় করায়ত্ব নেই। বাড়িঘর, রাস্তা ঘাট নির্মাণ, পণ্যাদি বিপননের ব্যাপার গুলোতেও উপজাতীয়রা অজ্ঞ। অতীতে বাঙ্গালীরা তাদের জমি আবাদ করণ আর চাষাবাদ ও শিখিয়েছে। লেখা পড়ার ক্ষেত্রেও, বাঙ্গালীদের নিকট তাদের হাতে খড়ি। সাংবাদিকতা, বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা ইত্যাদিতেও, বাঙ্গালীরা তাদের পথিকৃত। বলতে গেলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের পথ প্রদর্শক ও ওস্তাদ। আজ সে পথ প্রদর্শক ওস্তাদ ও সেবকদের প্রতি হিংসা ও জাতিগত বিদ্বেষ প্রদর্শন, গর্হিত উদ্দেশ্য প্রনোদিত্ কাজই বটে। বাঙ্গালী সাহচর্য্য আজ আর তাদের অভিপ্রেত নয়। রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতাই আজ লক্ষ্য বলে বিদ্ধিষ্ট পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হচ্ছে। প্রকাশ্যে বিচ্ছিন্নতার দাবী না উঠালেও, এক দেশ ও একজাতি সত্তাকে অকার্যকর করার প্রচেষ্টা চলছে।

বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিকদের তথ্য চর্চা ও বামরাজনীতি করার লক্ষ্য কি

উপজাতীয় উচ্চাকাঙ্খী লক্ষ্য উদ্দেশ্যের কাছে আত্মসমর্পন? দেশ ও জাতির কল্যাণে তাদের তথ্য চর্চা ও রাজনীতি করা। উপজাতীয় কল্যাণ তা থেকে বাদ নয়। দেশ ও জাতিকে বিভক্ত করে, জুম্মল্যান্ড ও জুম্মজাতি প্রতিষ্ঠা, দেশ প্রেম নয়।

অখন্ডতাবাদী দেশ প্রেমিক হলে, বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করাই উচিত। বাম বা ডান রাজনীতি তাতে বাধা ইত্যাদি নয়। বাঙ্গালী বনাম উপজাতি এই ভিন্নতাকে পরিহার করে, অভিন্ন জাতিত্বে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। লক্ষ্য হতে হবে সবার সমানাধিকার ও কল্যাণ। এ দেশের বাসিন্দা ৯৯% লোক বাঙ্গালী। পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯০% এলাকা জাতীয় ভূমি। পার্বত্য চুক্তির দফা নং- খ/২৬ অনুযায়ী এই জাতীয় অঞ্চল বিরোধীয় নয়। জনসংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী নামার ২/৫-ক ও ২/৫-খ অনুযায়ী মাত্র ৪৪৬ বর্গমাইলের ভিতরই তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ সীমাবদ্ধ। গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে তিন জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হওয়া, ঐ পাঁচ দফা দাবী নামা ও পার্বত্য চুক্তিতে মান্য নয়। উপজাতীয় পন্ডিতরা কেন এই ফাঁকটি দিয়ে কথা বলেন না? তারা নিজেরা ও বাঙ্গালী মুসলমান লোকোদ্ভূত, এ সত্য তথ্যটি গোপন করেন। সুতরাং সত্য তথ্য চর্চা আমাদের কর্তব্য।

চাকমা ইতিহাসের কিছু মৌলিক উপাদান আছে, যে গুলোকে অবলম্বন করে, একটি যুক্তিগ্রাহ্য ইতিহাস রচনা করা যায়। কিন্তু চাকমা পন্ডিতরা তৎপ্রতি মনোযোগী নন। বরং তাদর কিছু লোক এমন একটি আজগৌবী ইতিহাস রচনায় সচেষ্ট, যা উচ্চাকাঙ্খী রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রনোদিত, যথাঃ

"সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশসরকার কার্পাসচুক্তি ভঙ্গ করে ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সম্পূর্ণভাবে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্তকরে নেয়, এবং স্বাধীন রাজার শাসন খর্ব করে দিয়ে, জুম্ম জনগণের জাতীয় অস্তিত্ব ধ্বংসের পথ উন্মুক্ত করে দেয়।"

সূত্র ঃ পার্বত্য জনসংহতি সমিতির অস্ত্র বিরতি ঘোষণা পৃষ্ঠা-১, তাং- ১.৮.১৯৯২ খ্রীঃ

"চাকমারা একটি স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, যার উত্তরে ছিলো ফেনী নদী, দক্ষিনে শঙ্খ নদী, পূর্বে কুকি রাজ্য এবং পশ্চিমে - নিজামপুর সড়ক।"

সূত্র ঃ বাবু সুগত চাকমা রচিত চাকমা জাতি।

এই আজগৌবী তথ্যগুলো সম্পূর্ণ বানোয়াট। ১৮৬০ সালের আগে চাকমারা কোন স্বাধীন রাজ্যের অধিকারী ছিলেন না, এবং কার্পাস চুক্তি বলে ও কিছু প্রদর্শন যোগ্য নয়। আরাকান থেকে আগত চাকমা প্রধান শের মস্ত খাঁকে চট্টগ্রামের নায়েবে নাজিম জুল কদর খাঁ ১৭৩৭ সালে, সরকারী তুলা মহালের অধীন কোদালা অঞ্চলে, তরফে শুকদেব নামে একটি পাহাড়ী অঞ্চল বন্দোবস্তি দিয়েছিলেন, এবং স্থানীয় উপজাতীয় জুমিয়াদের নিকট

থেকে তূলা ও নগদে জুমকর আদায়ের তহসিলদারী মঞ্জুর করেছিলেন। ঐ বলে সেখানকার শুক বিলাসে গড়ে তুলা হয়েছিল একটি কাছারী ও রাজভিলায় বাড়ি। মনে করা হয়, রাজস্থলী পর্যন্ত দখলাধিকার সম্প্রসারিত হয়। পরে ১৭৫৭ সালে মোগল বিরোধী বৃটিশ শক্তির অভ্যূত্থান ঘটে, এবং বৃটিশ বিরোধীতাও মাথাচাড়া দেয়। ঐ গোলযোগের সুযোগ তখনকার চাকমা প্রধান শের দৌলত খাঁর নেতৃত্বে ১৭৭৪ সালে চাকমা, কুকি, ও বাঙ্গালীদের যৌথ শক্তিতে বৃটিশ বিরোধী বিদ্রোহ ঘটে। সেই শের দৌলত খাঁর পুত্র জান বখশ খাঁর আত্মসমর্পনের মাধ্যমে ১৭৮৭ সালে ঐ বিদ্রোহের অবসান হয়। ঐ তখনই রাজভিলা থেকে চাকমা সদর দপ্তর উত্তর রাঙ্গুনিয়ার রাজা নগরে অপসারিত হয়। শের মস্ত খাঁ থেকে অদ্যাবধি সব চাকমা প্রধানই সরকারের দ্বারা নিযুক্ত জুম খাজনার তহসিলদার। তাদের স্বাধীন রাজা হওয়ার দাবী ভ্রান্ত। সুতরাং স্বাধীন চাকমা রাজ্যের অস্তিত্বের কথা সম্পূর্ণ আজগৌবী।

এখন পূনরায় কিছু চাকমা নেতা স্বাধীন স্বরাজ্যের স্বপ্ন দেখছেন; যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা ১৭৭৪ বিদ্রোহে সম্ভব হয়নি, ১৯৪৭ এর বিদ্রোহে ভেস্তে গেছে, এবং পূনরায় শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ১৯৭২ সালের বিদ্রোহেও ব্যর্থ হয়েছে। ঐ স্বপ্নের স্বাধীন চাকমা রাজ্য কোনদিন প্রতিষ্ঠিত হবে, সে আশাটিও বৃথা। এখন পরিস্থিতি এমন যে, সশস্ত্র বাহিনী বাদে কেবল সাধারণ বাঙ্গালীরাই এতদাঞ্চলের অখন্ডতা রক্ষায় যথেষ্ট। শক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হলে উপজাতীয় বিদ্রোহীরা দেখতে পাবে তাদের মাথার উপর অন্ততঃ পঞ্চাশ হাজার সশস্ত্র বাঙ্গালী খাড়া, যাদের অধিকাংশ অত্যন্ত দক্ষ অস্ত্র বাজ। মুক্তিযুদ্ধ, শান্তি শৃঙ্খলা, ও দেশ রক্ষায় যারা ট্রেনিং প্রাপ্ত। এই শক্তিকে তুচ্চ জ্ঞান করা হবে বোকামী। বরং উপজাতীয়দের উচিত হবে একজাতি ও এক দেশের চেতনায়, নমনীয় আপোষের নীতি গ্রহণ। সমানাধিকার ও গণতন্ত্রই পালনীয়। অগ্রাধিকার, পদ সংরক্ষণ, ও বাড়াবাড়ি মোটেও শান্তির উপায় নয়।

অতীতে মুসলিম অভিজাতরা চাকমাদের রাজা রূপে মান্য হয়েছেন। বাংলাদেশেরস্বাধীন মুসলিম আধিপত্য একটি অবিসম্বাদিত স্থায়ী রাজনৈতিক পরিণতি। এই বাস্তবতাকে উপজাতীয়দের পক্ষে উপড়ে ফেলা অসম্ভব।

বাংলাদেশে উপজাতিদের স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা পেতে কোন আপত্তি নেই। নব প্রজন্মের মত দেশাভ্যন্তরে লোক জনের আসা যাওয়া, স্থানান্তর, বসতি স্থাপন, রোজগার, কর্মসংস্থান ইত্যাদি তৎপরতা চলবেই। আলো, বাতাস, পানি ও মাটিতে সবার অধিকার মান্য। এ ব্যাপারে বাধা নিষেধ অভিপ্রেত নয়।

ইতিহাসকে গোপন ও রচনা করা যায় না। সে আপনা আপনি উদ্ভাসিত হয়। প্রয়াত চাকমা রাজা ভূবন মোহন রায় স্বীকার করেছেন, ইতিপূর্বে বার্মায় চাকমাদের একটি রাজ্য ছিলো। রাজা শের জব্বার খাঁর সীল মোহর হলো একটি অকাট্য দলিল, যার ভাষ্য হলো ঃ

রোসান, আরাকান, আল্লাহ্ রাব্বি, শের জব্বার খাঁন, ১১১১ তথা তাঁর কার্যকাল ১৭৪৯ এবং কর্মস্থল আরাকানের রোসাং অঞ্চল। চাকমা লোকগীতিতে ব্যক্ত হয় ঃ "আদি রাজা শের মস্ত খাঁ রোয়াং ছিলো বাড়ি"। ১৯০০ সালে প্রণীত হিল ট্রাক্টস্ ম্যানুয়েলের ৫২ ধারা ও ঘোষণা করে : চাকমা, মগ, লুসাই, ত্রিপুরা ও কতিপয় আরাকানী জনগোষ্ঠীকে এতদাঞ্চলে অভিবাসন মঞ্জুর করা হয়েছে। সুতরাং তারা কি করে স্থানীয় আদি বাসিন্দা ও আদিবাসী হোন ? কার্যতঃ বাঙ্গালী অধিকারের প্রশ্নে তাদের আপত্তি উত্থাপন, অগ্রাধিকার ও পদ সংরক্ষণের দাবী অন্যায়। তাদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের অনুরূপ কোন আপত্তি না থাকাটা হলো পরম উদারতা।

১৬. পার্বত্য সমস্যার সমাধানে আইনী ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে পার্বত্য চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে ও বাস্তবায়িত হচ্ছে। তবে এখনো রাজনৈতিকভাবে পার্বত্য সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রশাসনিকভাবে ও প্রয়োজনীয় কর্মকৌশল উপেক্ষিত। সময়ই যেন একদা সমাধান এনে দিবে, তারই অপেক্ষায় কাল ক্ষেপণ চলছে। কিন্তু সমস্যাক্রান্ত লোকেরা তাতে প্রবোধ মানছে না। তাদের হয়ে কিছু করা দরকার। কিন্তু সে করাটা করবে কে? রাজনীতিকরা ব্যর্থ। প্রশাসনিক কর্তা ব্যক্তিরাও সাহস হারা। তাদের কাছে ক্ষমতা পদ ও চাকুরী স্বার্থটাই বড়।

পার্বত্য সমস্যাটি বহুমাত্রিক ও বহুদিনের সৃষ্ট। এটি আস্তে আস্তেই স্তুপিকৃত হয়েছে। এর দায় অতীত থেকে এখন পর্যন্ত বহুজনের উপর বর্তায়। এখন তুবড়ি মেরে মুহূর্তে এ থেকে রেহাই পাওয়াও দুস্কর।

আশার কথা ঃ জাতীয় সংসদে পার্বত্য অঞ্চল সংক্রান্ত ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব এম, কে আনোয়ার সংসদকে আশ্বস্ত করেছেন যে, পার্বত্য চুক্তির অসাংবিধানিক ধারা সমূহ বাস্তবায়িত হবে না। অথচ সংবিধান লঙ্ঘনের ব্যাপারসমূহ বিষদ আলোচনায় আসছে না, উহ্যই থেকে যাচ্ছে। বিষয়টি, সিনিয়র আইনজীবী ও খোদ সুপ্রীম কোর্টকেও সংক্ষুব্ধ করছে না। এ বিষয়টি কেবল আইন লঙ্ঘনের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়, দেশ ও জাতির বিভক্তির সম্ভাবনাতেও সম্পৃক্ত। বাঙ্গালীরাও তাতে বিভ্রান্ত। মন্ত্রী মান্নান ভূঁইয়াও বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তিনি ইউএনডিপি ও চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটিতে বলেছেন চুক্তির প্রতিটি ধারা ক্রমান্বয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং হবে। তাই চূড়ান্ত বিপদের আশংকা অবশ্যই করা যায়।

পৃথক জাতিত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্ত হয়েছে। বাংলাদেশের জন্ম ভিত্তিও তাই। বসনিয়া পূর্ব তিমুর ইত্যাদি স্বতন্ত্র জাতিরাষ্ট্রসমূহ এই ভিত্তিতেই সৃষ্ট। বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম এই একই পথে ধাবিত। ব্যতিক্রম হলো ঃ এখনো এখানে বিচ্ছিন্নতার দাবী ওঠেনি। এই অবসরটুকু হলো আমাদের পক্ষে সতর্ক হওয়ার সময়। দেশের অখন্ডতা, সংবিধান ও পার্বত্য চুক্তিকে অবলম্বন করে আমাদের আঁট ঘাট বেঁধে অগ্রসর হতে হবে, নতুবা বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

পার্বত্য চুক্তিটাই আমাদের পক্ষে হস্তক্ষেপের সুযোগ এনে দিয়েছে। চুক্তিতে দুই বিপরীত ধারা বিদ্যমান। একটি হলো সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা মান্যতার ও অপরটি হলো তা লঙ্ঘনের। চুক্তিপত্রের মুখবন্ধ হলো একটি উদার অঙ্গীকার, যথা ঃ

"বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ অবিচল আনুগত্য রাখিয়া, পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার সমুন্নত এবং আর্থ সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং বাংলাদেশের সকল নাগরিকের স্ব স্ব অধিকার সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তরফ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক জাতীয় কমিটি এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার অধিবাসীদের পক্ষ হইতে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি, নিম্নবর্ণিত চারিখন্ড (ক, খ, গ, ঘ) সম্বলিত চুক্তিতে উপনীত হইলেন।"

এই বক্তব্যের অন্তর্ভুক্ত সিদ্ধান্তমূলক নীতি ও অঙ্গিকার হলো ঃ-

ক) চুক্তিটি বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় রচিত হবে, তথা তদ্বারা সংবিধান লঙ্ঘিত হবে না।

খ) বাংলাদেশ রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা ও অখন্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আনুগত্য বহাল রাখা হবে।

গ) পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল নাগরিক, তথা বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী নির্বিশেষে বসবাসরত সবাই, কোন পার্থক্য ও ভেদাভেদ ছাড়াই, এমনকি বাংলাদেশের অন্য সব নাগরিকরাও এই পার্বত্য অঞ্চলে নিম্নোক্ত অধিকার ও সুবিধাবলী ভোগ করবেন, যথা ঃ রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক অধিকার ও উন্নয়ন।

চুক্তির এই অনুকূল ধারা, পরবর্তী দফাওয়ারী বর্ণনায়, বিপরীত ব্যবস্থাদির দ্বারা চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। চারখন্ডে বিভক্ত এই চুক্তি রোয়েদাদ, মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে সংবিধান সম্মতভাবে রচিত হয়নি। তাতে সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং- ১, ৬, ৭, ৮, ৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৯, ৩৬, ৪২, ১২২ ইত্যাদি সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। এগুলো আইনী হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র। উল্লেখ্য যে, বর্ণিত লঙ্ঘনের বিষয়গুলো আন্ত সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক শান্তি, স্বার্থ, সংহতি, সমতা, সুবিচার ও গণতন্ত্রকেও বিঘ্নিত করে, এবং জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পরিবর্তে উপজাতীয়তাকে উস্কানী দেয়, যা সংবিধানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য নয়।

চুক্তিতে নিহিত সংবিধান বিরোধী ধারাসমূহ, যথা ঃ-

১। খন্ড (ক)-১ ঃ এই দফায় ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনে, পার্বত্য চট্টগ্রামকে কেবল উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলরূপে ঘোষণা করা হয়েছে। অথচ বাস্তবে এবং আদমশুমারী মতে, বাঙ্গালীরা স্থানীয় প্রধান সম্প্রদায়। জনসংখ্যায়ও তারা প্রায় অর্ধেক। এখানে একমাত্র উপজাতীয়দের স্বীকৃতি দেয়াতে, এতদাঞ্চল একক উপজাতীয় আবাসভূমি রূপে, তাদের অগ্রাধিকার, বিশেষাধিকার, স্বায়ত্ত শাসন, এমন কি আত্ম-নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভের রাজনৈতিক পথ খোলাসা হয়ে গেছে। এই সাথে বাঙ্গালীরা হয়ে পড়েছে অবহেলিত জিম্মি। এ হলো দেশ ও জাতি বিভক্তির রাজনৈতিক সূত্র। এতে একক এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র ও জাতি সত্তার সংবিধান প্রদত্ত ধারণা ক্ষুন্ন হয়েছে, যা অনুচ্ছেদ নং-১ ও ৬ (২) দৃঢ়ভাবে ব্যক্ত করে। আঞ্চলিকতা ও উপজাতীয়তা এই আইনে নিষিদ্ধ।

২। খন্ড (খ) ঃ এই দফা হলো, পার্বত্য রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি/বান্দরবন জেলা পরিষদ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি। বর্ণিত এই তিন জেলা পরিষদের জন্য এমন স্বতন্ত্র আইন রচিত ও জারি হয়েছে, যা বাংলাদেশের অপরাপর জেলা পরিষদের পক্ষে প্রযোজ্য নয়। এটা আঞ্চলিক, সাম্প্রদায়িক ও আইনী বৈষম্য সম্পন্ন। সংবিধানের ধারা নং- ১৯, ২৭, ২৮, ২৯, ৩৬ ও ৪২ এই বৈষম্যাদি অনুমোদন করে না।

খন্ড (খ)-১ ঃ সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং-২(ক) ও আঞ্চলিক পরিষদ আইন নং-(খ) তে পার্বত্য অবাঙ্গালীদের উপজাতি আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং বাঙ্গালীদের বলা হয়েছে অউপজাতি। এ মূল্যায়ন ও নামকরণ অযৌক্তিক। বাঙ্গালীরা বহু কোটি সংখ্যক একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। জনসংখ্যার হিসাবে স্থানীয়ভাবেও তারা একক প্রধান সম্প্রদায়। তাই এই প্রধান সম্প্রদায়টির পক্ষে নিজ নামে আখ্যায়িত হওয়াই যুক্তি-সঙ্গত। তাদের বিপরীতে উপজাতীয়

সংখ্যালঘু লোকদের অবাঙ্গালী নামে আখ্যায়িত হওয়াটাই যথার্থ। এখানে উপজাতীয়তার প্রাধান্য দেয়ায়, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক গুরুত্বেরই অবতারণা হয়েছে, যা সংবিধানের ১ ও ৬ (২) অনুচ্ছেদে ব্যক্ত ধারণার পরিপন্থী।

৩। খন্ড (খ) ৪/(ক) ও (খ) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং-৪/১ (ক, খ, গ ও ঘ) চেয়ারম্যান পদসহ উপজাতিদের পরিষদের $\frac{২}{৩}$ এবং বাঙ্গালীদের $\frac{১}{৩}$ সদস্য পদ দান করেছে। এ বিধি ব্যবস্থা সংবিধানের ধারা নং-৯, ১১, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ এর প্রকাশ্য লঙ্ঘন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অগ্রাধিকার বিশেষাধিকার ও পদ সংরক্ষণ মান্য নয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ধারা নং- ১, ৯, ১১, ৪৮, ৫৫, ৫৯, ৬৫, ৬৬, ১২২ এবং জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের অনুকরণে বর্ণিত পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের আইন ও নির্বাচন বিধি রচিত হয়নি। মনোনয়ন ভিত্তিক অবাধ যুক্ত নির্বাচনই সংবিধান ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুমোদন করে। সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনী, পার্লামেন্টারী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করেছে। সে অবধি প্রেসিডেন্সিয়েল সরকার ও শাসন ব্যবস্থা পরিত্যক্ত। অথচ অনেক বিভাগীয় সংস্থা ও স্থানীয় শাসন ভিত্তিক পরিষদ আর প্রতিষ্ঠান এখনো প্রেসিডেন্সিয়েল পদ্ধতিতে চেয়ারম্যান শাসিত। পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ সমূহ এই পদ্ধতিতে পরিচালিত, যা দ্বাদশ সংশোধনীর পরিপন্থী। উপরোক্ত ব্যবস্থাবলী গণতন্ত্রের সাথেও সামঞ্জস্যহীন।

৪। খন্ড (খ) ৪-গ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং-৪(৫) ও ৪(৬) পাহাড়ী বাঙ্গালীদের সবাইকে স্থানীয় বাসিন্দা ও নাগরিক সনদ লাভ প্রশ্নে উপজাতীয় সার্কেল চীফদের অধীন এবং এ ব্যাপারে জেলা প্রশাসকদের কর্তৃত্ব বিলোপ করা হয়েছে। অথচ মৌলিক আইন অনুযায়ী স্থানীয় জেলা প্রশাসকরাই এ জাতীয় কর্তৃত্বের অধিকারী। জমিদারী ও সর্দারী সামন্তবাদ, ১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন (আইন নং- ২৮/১৯৫১) এবং বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ ও ৭ কর্তৃক বাতিল হয়ে গেছে। তদুপরি উপজাতীয় সর্দারদের কর্তৃত্ব বাঙ্গালীদের উপর প্রযোজ্যই নয়। যথা ঃ পার্বত্য শাসন আইন নং-৩৫।

৫। খন্ড (খ) ৯ ঃ এ দফা ও জেলা পরিষদ আর আঞ্চলিক পরিষদ আইনে ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রূপে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শর্ত আরোপিত হয়েছে এবং স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার সনদ পেতে কেবল বাঙ্গালীদের জন্য শর্ত হলো জায়গা জমির মালিকানা ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানার অধিকারী হওয়া। অথচ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১২২ এরূপ কোন শর্ত আরোপ করে না। এখানে বিবেচ্য যে, বাংলাদেশী গণপ্রজাদের অর্ধেকই প্রায় ভূমিহীন। অথচ অনুচ্ছেদ নং-১, ৭ ও ১১ তাদের এই প্রজাতন্ত্রের ক্ষমতার মালিকদের অন্তর্ভুক্ত করেছে।

৬। খন্ড (খ) ১৩ ও ১৪, খন্ড (গ) ৭ খন্ড (গ) ১০ ও খন্ড (ঘ) ১৮ ঃ এই দফা সমূহ ও সংশ্লিষ্ট জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনের ধারা নং-৩১, ৩২ (২) এবং ২৮ ও ২৯-এ নিয়ুক্তি ও চাকুরীতে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এই বৈষম্য ও ভেদাভেদ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুমোদন করে না।

৭। খন্ড (খ) ২৬ (ক ও খ) ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইন নং-৬৪ পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট করেছে। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভুক্ত করা হয়েছে। এটা চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে অমান্য করা, যা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। জরিপের মাধ্যমে পরিষদীয় এলাকা ও পরিষদমুক্ত এলাকা সুনির্দিষ্ট হয় নি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য অঞ্চলকেই পরিষদভুক্ত রাখা মানে চুক্তি ও সংশ্লিষ্ট আইনকে অমান্য করা, যা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। আমার হিসাবে তিন পার্বত্য জেলা মিলে পরিষদীয় এলাকা মাত্র ৩৪০ বর্গমাইল, এবং জনসংহতি সমিতির হিসাব মতে তা ৪৪৬ বর্গমাইল মাত্র। অথচ সরকার তিন জেলা পরিষদের হাতে গোটা পার্বত্যঞ্চল তথা ৫০৯৩ বর্গমাইলই ছেড়ে দিয়েছেন, এবং তাতে জেলা পরিষদের ভূমি নিয়ন্ত্রণমূলক পূর্বানুমোদন মেনে নিয়েছেন। এতে জমি বন্দোবস্তি, হস্তান্তর, নামজারি ও অধিগ্রহণ বন্ধ আছে। অথচ ভূমি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রণ সার্বভৌম ক্ষমতাধীন বিষয়। এটি প্রত্যাহার যোগ্য নয়। দুঃখজনক হল, যে জায়গা জমি ও অঞ্চল নিশ্চিত রূপে পরিষদীয় এখতিয়ারভুক্ত নয়, তা থেকে সরকারী হাত গুটিয়ে নেয়া হয়েছে। সুতরাং বর্ণিত দফা ও আইনে এ বলা নিরর্থক যে, "তবে শর্ত থাকে যে, রক্ষিত বনাঞ্চল, কাপ্তাই জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কেন্দ্র এলাকা, বেতবুনিয়া ভূ-উপগ্রহ এলাকা, রাষ্ট্রীয় শিল্প কারখানা ও সরকারের নামে রেকর্ডকৃত ভূমির ক্ষেত্রে এ বিধান প্রযোজ্য হইবে না।" (সূত্রঃ পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং-৬৪ ও পার্বত্য শাসন আইন নং-৩৫)।

সুতরাং এই দফা ও আইনের অধীন প্রদত্ত ছাড় সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ এর অধীন প্রাপ্ত সার্বভৌম ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ন করেছে, যা গুরুতর সাংবিধানিক আপত্তির বিষয়।

৮। খন্ড (খ) ১৬ (গ) ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট অঙ্গিকারে বলা হয়েছে যে, কাপ্তাই হ্রদের জলে ভাসা জমি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে তার সাবেক মালিকদের বন্দোবস্ত দেয়া হবে। বক্তব্যটি বিভ্রান্তি কর। শুকনো মৌসুমে বর্তমানে ১৫/২০ হাজার একরের বেশি জমি ভাসে না, এবং তাতে নিকটবর্তী লোকজনেরাই ফল ফসল ফলায়। কিন্তু একদা ভবিষ্যতে হ্রদ এলাকা ভরে যাবে, এবং তার অধিকাংশই ভেসে উঠবে। তখন পুনঃ আবাদ ও বন্দোবস্তির সুযোগ দেখা দিবে। তবে হ্রদ অঞ্চলভুক্ত ১,৬৩,৮৬৩ একরের মধ্যে কেবল ৫৪ হাজার একর জমি মাত্র ব্যক্তি মালিকানাধীন ছিলো, এবং অবশিষ্ট ১,০৯,৮৬৩ একর জমি ছিলো সরকারী খাস ও বনভূমি। নিকটবর্তী ভোগ দখলকারী লোক ও অন্যান্য ভূমিহীনদের বঞ্চিত করে, পূর্বের ক্ষতিপূরণের দ্বারা স্থানান্তরিত ও পুনরবাসিতদের ঐ সব জমিতে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পুনরায় বন্দোবস্ত দান হবে সম্পূর্ণ অযৌক্তিক। পরিবেশগত কারণে ও সাবেক মালিক ও তাদের বংশধরদের অধিকাংশ হ্রদ অঞ্চল ও তার আশে পাশে নেই, এবং প্রাপ্তব্য জমিও, তাদের ছেড়ে যাওয়া জমির চেয়ে দ্বিগুণ। তাদের পক্ষে এই ঢালাও অধিকার প্রাপ্য নয়।

৯। খন্ড (খ) ৩০ ও ৩১ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং-১২ ও ৭০ চেয়ারম্যানকে সাসপেন্ড করণ ও অন্য কারো কাছে ক্ষমতা অর্পন থেকে সরকারকে বারণ করা হয়েছে, যা কার্যতঃ সার্বভৌম ক্ষমতা ত্যাগ।

১০। খন্ড (খ) ৩৩ ও ৩৪ ঃ এই দফা ও সংশ্লিষ্ট ক্ষমতা তফসিলে, আইন শৃঙ্খলা তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ ও তাঁর উন্নতি সাধন পরিষদের ক্ষমতাভুক্ত করা হয়েছে। অথচ জেলা ও আঞ্চলিক

পরিষদ, স্থানীয় শাসন ভিত্তিক অধঃস্তন প্রতিষ্ঠান, এবং এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র বাংলাদেশে একমাত্র কেন্দ্রীয় শাসনই মান্য। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ ও ৫৯ সমুদয় মৌলিক ক্ষমতা, কেন্দ্রীয় সরকার ভিত্তিক করে রেখেছে। স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠানাদি কেবল কেন্দ্রীয় মোসাহেবী ক্ষমতারই মালিক তার বেশি নয়।

জেলা পরিষদ আইন ৬৪তে ভূমি প্রশাসন ক্ষমতা পার্বত্য জেলা পরিষদকে প্রদত্ত হয়েছে অথচ ভূমি প্রশাসন মৌলিক কেন্দ্রীয় বিষয়। ভূমি প্রশাসন, সাধারণ প্রশাসন, আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ, বৃহৎ শিল্প, বাণিজ্য, অর্থ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ, বৈদেশিক সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত বিষয় নয়। স্থানীয় ক্ষমতা তফসিলে এ সবের অন্তর্ভুক্তি, রাষ্ট্রের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় ক্ষমতার পক্ষে ক্ষতিকর। এসব অনুমোদনীয় নয়। এই জাতীয় ক্ষমতা ক্ষুদে উপজাতীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে, এবং তাতে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা, সংবিধান মান্যতা, এবং একক স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের অধিকার হবে ক্ষুন্ন।

১১। খন্ড (গ) তে আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। চুক্তিভুক্ত খন্ড (খ) ২৬ ও জেলা পরিষদ আইন ৬৪ গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদভুক্ত করেনি। অথচ বাস্তবে গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামই পরিষদীয় এলাকারূপে হস্তান্তরিত হয়ে আছে। এ খেলাপী কাজের হোতা জন সংহতি সমিতি নয়, সরকার নিজে, এবং এর দ্বারা গোটা পার্বত্য অঞ্চলই বিরোধীয় অঞ্চলে পরিণত হয়ে গেছে। তাতে বসতিভুক্ত এলাকা ৩৪০ বা ৪৪৬ বর্গমাইল থেকে বেড়ে, মোট ৫০৯৩ বর্গমাইলে পরিণত হয়েছে। পরিষদীয় শাসন সম্প্রসারণের এই বাড়াবাড়ি, আসলে চুক্তিজাত কিছু নয়। চুক্তি বলে জনসংহতি সমিতি, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রামকে পরিষদীয় এলাকা হিসাবে দাবীও করেনি। বরং এই বলে কিছু বাড়তি অঞ্চল দাবী করতে পারে যে, আবাদী সম্প্রসারণ ও বন্দোবস্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অশ্রেণীভুক্ত বনাঞ্চল সঙ্কুচিত হয়ে, বাস্তবে বসতি অঞ্চলের বিস্তৃতি ঘটেছে, এবং তা কার্য্যতঃ বনাঞ্চল থেকে অবমুক্ত হয়ে বসতি অঞ্চলের বৃদ্ধি ঘটিয়েছে।

এ দাবী মেনে নিলেও বসতি অঞ্চল তথা পরিষদীয় অঞ্চলের আয়তন, গোটা পার্বত্য অঞ্চলের অর্ধেকের বেশী হবে না। এরূপ বাড়াবাড়ি পার্বত্য সমস্যা সৃষ্টির উদাহরণ। বৃটিশ আমল থেকে এভাবে প্রশাসন ও সরকারের পক্ষ থেকে সমস্যাদির সৃষ্টি করা হয়েছে।

পার্বত্য সমস্যার মূল অনুধাবনে এখানে তার অতীত আলোচিত হওয়া দরকার। আসলে চট্টগ্রামেরই অংশ পার্বত্য চট্টগ্রাম। তবে উপজাতীয়রা চট্টগ্রামী জন সমষ্টির অংশ নয়। তারা নিজেরা চট্টগ্রামী মূলের লোক বলে দাবীও করে না।

১৮৬০ সালে পৃথক প্রশাসনিক অঞ্চল রূপে এতদাঞ্চলকে চট্টগ্রাম জেলা প্রশাসন থেকে পৃথক করা হয়েছে। এতদাঞ্চল ছিলো বন ও পাহাড়ের সমষ্টি এক বসতি বিরল ভূ-ভাগ। বৃটিশ আমলের শুরুতে, আরাকানে বর্মী আক্রমণ, এবং পূর্বাঞ্চলে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ কার্যক্রম, ত্রিপুরা, লুসাই ও আরাকানী জাতি গোষ্ঠীর লোকদের ব্যাপক সংখ্যায় বাস্তুচ্যুত করে, এবং তারা সংঘাতপূর্ণ নিজ নিজ বসতি এলাকা ত্যাগ করে, পার্বত্য চট্টগ্রামের নিরুপদ্রব ও দুর্গম পাহাড়াঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। ঐ উদ্বাস্তু শরণার্থীদেরই

বংশধর হল বর্তমান পার্বত্য উপজাতীয়রা। অখন্ড চট্টগ্রামে তারা ছিলো নেহাত সংখ্যালঘু, এবং স্থানীয় না হলেও, আরাকান, লুসাই ও ত্রিপুরা দখলের ফলে বৃটিশ প্রজা। এই প্রজা অধিকারের পাশাপাশি, চট্টগ্রাম অঞ্চলটি পাহাড়ে ও সমতলে, উত্তরে, দক্ষিণে বিভক্ত, দুই প্রশাসনভুক্ত হওয়ার ফলে, আকস্মিকভাবে পূর্বাঞ্চলে উপজাতীয় গরিষ্ঠতা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, এবং সম্পূর্ণ অনাকাঙ্খিত ভাবে তারা এর রাজনৈতিক সুফলভোগী হয়ে দাঁড়ায়। কার্যতঃ বার্মা বিতাড়িত আরাকানীরা ছিল বৃটিশ অনুগৃহীত, তাই তাদের অনুগত। আর ত্রিপুরা, লুসাই ও কুকীরা ছিলো বৃটিশ আক্রান্ত, তাই তাদের প্রতি ক্ষিপ্ত। এই পরিবেশ পরিস্থিতি, বৃটিশ অনুগতদের স্বার্থানুকূল হয়। তাতে অনুগত শরণার্থীদের তিন দলপতিকে বৃটিশ সরকার সর্দারী, আর্থিক সুবিধা ও সামন্তীয় মর্যাদা দান করেন। তাদের নেতৃস্থানীয়দের মৌজা প্রধান রূপে নিযুক্ত করা হয়। চট্টগ্রামী তথা বাঙ্গালী প্রাধান্য আর আধিপত্যের বিলুপ্তি এভাবেই সাধিত হয়। এই উপজাতীয় আধিপত্য ও প্রাধান্যকে শেষমেশ রেগুলেশন নং-১/১৯০০ এর দ্বারা আইনী ও স্থায়ী রূপ দেয়া হয়। বৃটিশ শাসনের অবসানে সামন্ত প্রথার বাহন দেশীয় রাজ্য আর জমিদারী প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্র, পশ্চিম, উত্তর-সীমান্তের কাবায়েলী স্বায়ত্ত শাসনের অনুকরণে পূর্ব দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য চট্টগ্রামেও সর্দারী সামন্ত প্রথা বহাল রেখে দেয়। এটাই পরিণামে শক্তিশালী উপজাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের সংগ্রাম ও বিদ্রোহে পরিণত হয়। যদি ১৯৫১ সালে জমিদারী উচ্ছেদের সাথে সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামে সর্দারী সামন্তবাদের উচ্ছেদ সাধিত হয়ে যেতো, এবং সারা দেশের মত স্থানীয় ভূমি প্রশাসন, রাজস্ব বিভাগাধীন তহসিলের নিকট হস্তান্তরিত হতো, তা হলে স্থানীয়ভাবে ভূমি প্রশাসন নির্ভর আঞ্চলিকতাবাদী উপজাতীয় রাজনীতিক শ্রেণীর জন্ম হতো না। বাংলাদেশ আমলেও তহসিল প্রথা প্রবর্তন না করা হয়েছে গুরুতর ভূল। ফলে উপজাতীয়দের ভূমি প্রশাসন ও রাজস্ব ভোগজাত আধিপত্যের উৎপাত জোরদার হতে পেরেছে।

১২। খন্ড (গ)-১ এ বলা হয়েছে ঃ তিন পার্বত্য জেলা পরিষদের সমন্বয়ে একটি আঞ্চলিক পরিষদ গঠন করা হবে এবং বাস্তবেও তাই হয়েছে। অথচ সংবিধানে স্থানীয় শাসন কর্তৃপক্ষের রূপরেখা ভিন্ন, যথা ঃ

"অনুচ্ছেদ নং-৫৯(১) ঃ আইনানুযায়ী নির্বাচিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান সমূহের উপর প্রজাতন্ত্রের প্রত্যেক প্রশাসনিক একাংশের স্থানীয় শাসনের ভার প্রদান করা হইবে।"

বর্ণিত এই সাংবিধানিক রূপরেখায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়নি, যথা ঃ-

ক) পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন প্রশাসনিক ইউনিট বা একাংশ নয়।

খ) এখনো দেশ ভিত্তিক কোন আইনী স্থানীয় শাসন কাঠামো প্রণীত হয়নি।

সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ সংবিধান সম্মত স্থানীয় শাসন প্রতিষ্ঠান নয়। সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১ অনুসারে গোটা বাংলাদেশ একক রাজনৈতিক ইউনিট। এর কোন আঞ্চলিক ভাগ বিভাগ নেই। এ হেতু রাজনৈতিক ভাবেও পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন ইউনিট নয়। এই শূন্য অস্তিত্ব নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত।

১৩।খন্ড (গ) ২ ও সংশ্লিষ্ট আইনে আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যানকে পরোক্ষভাবে কেবল উপজাতীয়দের মধ্য থেকে নির্বাচনের বিধান করা হয়েছে। এবং খন্ড (গ) ১২ ও সংশ্লিষ্ট আইনে অনির্বাচিত অন্তরবর্তী আঞ্চলিক পরিষদ গঠনের কথা আছে। অথচ বাংলাদেশ সংবিধানে পরোক্ষ নির্বাচন ও অন্তরবর্তী ক্ষমতা দান বা গ্রহণের কোন পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ বিধান নেই। এই বাড়াবাড়ি সংবিধান সম্মত নয়।

১৪।খন্ড (ঘ) ৪, ৫ ও ৬ (খ) বলে একটি ভূমি কমিশন গঠিত হয়েছে, যার চেয়ারম্যান একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তাতে সদস্য হলেন ঃ-

১) চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার বা অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার।

২) সংশ্লিষ্ট উপজাতীয় সার্কেল চীফ।

৩) আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি।

৪) সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান বা প্রতিনিধি।

এই ভূমি কমিশনের দায়িত্ব হলো ঃ-

ক) জমি জমা সংক্রান্ত বিরোধ, পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রচলিত আইন রীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী মীমাংসা করে দেয়া।

খ) অবৈধভাবে যেসব জায়গা জমি ও পাহাড়, বন্দোবস্ত ও বেদখল হয়েছে, সেসব জমি ও পাহাড়ের মালিকানা স্বত্ব বাতিল করা।

এই কমিশনের রায় হবে চূড়ান্ত। এর বিরুদ্ধে কোন আপিল করা যাবে না। এখানে উল্লেখ্য যে, উপজাতীয়দের ভূমি সংক্রান্ত অভিযুক্ত পক্ষ হলো বাঙ্গালীরা। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের বিরুদ্ধে জাতিগত ও রাজনৈতিকভাবে তাদের আপত্তি হলো ঃ বিগত জিয়া সরকার, স্থানীয় উপজাতীয় মৌজা প্রধান ও সার্কেল প্রধানদের অনুমোদন ছাড়া, স্বউদ্যোগে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। মৌজা ও সার্কেল ব্যবস্থা, হিল ট্র্যাক্টস ম্যানুয়েল প্রতিষ্ঠিত। মৌজা হেডম্যান ও সার্কেল চীফদের অনুমোদনে ভূমি প্রশাসন প্রচলিত। জিয়া সরকার এই প্রতিষ্ঠিত আইন, প্রথা, রীতি ও পদ্ধতি লঙ্ঘন করে, বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছেন। তাতেই বাঙ্গালীদের প্রদত্ত জমি ও পাহাড়ের বন্দোবস্তি ও দখল স্বত্ব অবৈধ হয়েছে।

এই অভিযোগের বিচার কাজ এমন এক বিচারপতির হাতে ন্যস্ত হয়েছে, যিনি অভিযুক্ত সরকারের দ্বারাই নিযুক্ত। তার সহকারী হলেন সরকারী কর্মচারী। অবশিষ্ট তিন সদস্য হলেন অভিযোগকারী পক্ষভুক্ত নেতৃস্থানীয় লোক। সুতরাং এই কমিশন নিরপেক্ষ নয়। এই বিচার ব্যবস্থাকে আপীল বহির্ভূত রাখা আরেক অবিচার। তদুপরি সরকারের বসতি স্থাপন ও বন্দোবস্ত দান ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা তো একমাত্র সুপ্রীম কোর্টেরই প্রাপ্য। ভূমি কমিশন সুপ্রীম কোর্টের এই এখতিয়ারের উপর হস্তক্ষেপের অধিকার রাখে না।

১৫।খন্ড (ঘ) ১৯ ও সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থায় উপজাতীয়দের মধ্য থেকে পার্বত্য মন্ত্রণালয়ে একজন মন্ত্রী নিয়োগ করা সংবিধানের ২৭ ও ২৯ অনুচ্ছেদ বিরোধী।

এই অভিযোগগুলো আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও প্রয়োগ সংক্রান্ত খুঁটি নাটি বিচারে গুরুতর তো বটেই, এতে দেশের সর্বোচ্চ পালনীয় আইন সংবিধান, জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা,

আর সার্বভৌম ক্ষমতা ও হুমকির সম্মুখীন। দেশ জাতি ও সুপ্রীম কোর্ট এ ব্যাপারে নীরব ও নিষ্ক্রিয় থাকতে পারে না। এখানে আনুষ্ঠানিকতার প্রশ্নটিও জড়িত। আনুষ্ঠানিকভাবে আইনজীবীদের কেউ এই বিষয়টি নিয়ে বিচার প্রার্থী হলে বা যে কোন সংক্ষুব্ধ নাগরিকের আবেদনে বা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদনে আকৃষ্ট হয়ে স্বউদ্যোগে বিষয়টি মামলারূপে সুপ্রীম কোর্ট গ্রহণ করতে পারেন। আমাদের জানামতে সুপ্রীম কোর্টে অনুরূপ বহু সুয়ো মট্টো মামলা বিবেচিত হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত বহু আনুষ্ঠানিক মামলাও সুপ্রীম কোর্টে উত্থাপিত আছে যা আইনজীবীদের উদ্যোগের অভাব অথবা মোসাবেদা সংক্রান্ত ক্রটির কারণে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে আছে।

আইনজীবীদের অধিকাংশ দলীয় রাজনীতির সাথে জড়িত। দলীয় রাজনীতির স্বার্থে ও নির্দেশে তারা বিষয়টি বিবেচনা করেন। ফলে দলীয় বিরোধিতা তাদেরকে এ ব্যাপারে দমিয়ে রেখেছে। বাদ বাকি জুনিয়র ও অদক্ষ আইনজীবীরা, বিষয়টিকে ঝুকিপূর্ণ ও দুঃসাহসিক মনে করেন। ফলে কার্যকর মামলা হচ্ছে না।

এই নেতিবাচক ও বিব্রতকর পরিস্থিতিতে মহামান্য সুপ্রীম কোর্টকেই দুঃসাহসিক উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। এ অনানুষ্ঠানিক মামলার বিষয় হলো ঃ পার্বত্য চুক্তি তার মুখবন্ধের অঙ্গিকার অনুসারে রচিত হয়নি এবং তাতে দফায় দফায় বাংলাদেশ সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে, যা সংশোধন হওয়া ব্যতীত কার্যকর হওয়া আইন সঙ্গত নয়। বিবাদী চুক্তিকারী পক্ষ হলেন- (ক) বাংলাদেশ সরকার ও (খ) পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি। অবিলম্বে এই সাংবিধানিক ক্রটি সংশোধনে মাননীয় আদালতের আদেশই কাম্য।

১৭. ওদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত করা সরকারের দায়িত্ব

(২৭ ডিসেম্বর ২০০৩ ইং দৈনিক ইনকিলাব)

সন্তু বাবু দীর্ঘদিন একটানা বকে যাচ্ছেন, সরকার শান্তিচুক্তি বাস্তবায়ন করছে না, বরং জনসংহতি সমিতির বিরুদ্ধে একটি উপজাতীয় সন্ত্রাসী গ্রুপ লালন করছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রীর পদ খোদ প্রধানমন্ত্রী দখল করে রেখেছেন এবং সর্বশেষ আপত্তিরূপে যুক্ত হয়েছে ঃ বহিরাগত অ-উপজাতীয় ওয়াদুদ ভূঁইয়াকে বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান করা হয়েছে।

শান্তিচুক্তির প্রতিটি হরফ, দাড়ি, কমা, কোলন, সেমিকোলন পর্যন্ত অন্য কারো চেয়ে সন্তু বাবুর অধিক মুখস্থ। বাংলাদেশ সংবিধানটিও তাঁর কণ্ঠস্থ। চুক্তির মুখবন্ধে তিনি অঙ্গীকার করেছেন ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের আওতায় চুক্তি সম্পাদন ও বাস্তবায়িত হবে। সে অঙ্গীকার অনুসারে তা সম্পাদিত না হয়ে চুক্তির ধারা-উপধারায় ভিন্নতা সংযোজিত হয়েছে। সুতরাং সংবিধানই তা বাস্ত বায়নের দায়িত্ব থেকে সরকারকে বিরত রেখেছে এবং খোদ চুক্তিও তা সমর্থন করে। যদি মুখবন্ধে সংবিধান অনুসরণের অঙ্গীকার না থাকতো, তাহলে সন্তু বাবুর এ অভিযোগ যথার্থ হতো যে, সরকার চুক্তির কিছু কিছু দফা বাস্তবায়ন করছে না। আপত্তির পরিপ্রেক্ষিতে বরং সন্তু বাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা যায় যে, তিনি সংবিধান ও চুক্তির মূলনীতি লঙ্ঘনের পক্ষে প্ররোচনা দিচ্ছেন।

নীতিগতভাবে চুক্তি নয়; সংবিধানই বড় এবং সর্বোচ্চ অনুসরণীয় আইন। এই বাধ্যবাধকতাকে চুক্তির মুখবন্ধে স্বীকারও করা হয়েছে। তাই সংবিধান বিরোধী কিছু দফা চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করা ও তা বাস্তবায়নের জেদ ধরা যুক্তিযুক্ত বলা যায় না। চুক্তির সংবিধান বিরোধী দফা সম্বন্ধে সন্তু বাবুরা অজ্ঞ, এ কথা ভাবা যায় না। সংবিধানের প্রথম অনুচ্ছেদই বাংলাদেশকে একক অখণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ঘোষণা করেছে। সে ক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন রাজনৈতিক খণ্ডরূপে স্বীকার্য নয়। একটি প্রশাসনিক ইউনিটরূপেও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্বীকৃতি এখন নেই। সংবিধানের স্থানীয় শাসন আইন অনুচ্ছেদ নং ৫৯ প্রয়োগযোগ্য হতে হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার পক্ষে প্রশাসনিক ইউনিট হওয়াও জরুরী। এমতাবস্থায় পার্বত্য চট্টগ্রাম কোন রাজনৈতিক বা স্থানীয় শাসনের যোগ্য প্রশাসনিক ইউনিট বলে আইনী সংস্থান অর্জন করে না। তজ্জন্য অনুচ্ছেদ নং ১ সংশোধন অথবা পার্বত্য অঞ্চলভিত্তিক প্রশাসনিক ইউনিট গঠন জরুরী। জনসংহতি সমিতি স্বীয় দাবী নামায় এই আইনী জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সংবিধান সংশোধন চেয়েছিল। সুতরাং আঞ্চলিক পরিষদ স্থাপনের চুক্তি ও তা বাস্তবায়ন ত্রুটিমুক্ত নয়। এ ক্ষেত্রে সংবিধান ও প্রশাসনিক বিন্যাস ব্যবস্থা অনুসৃত হয়নি। এই ত্রুটির পরিপ্রেক্ষিতে স্বাভাবিকভাবেই আঞ্চলিক পরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার যোগ্য। এ কারণে এই পরিষদের চেয়ারম্যান পদ তার প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা আর খোদ পরিষদের অস্তিত্বই নড়বড়ে। তদুপরি অন্তর্বর্তী পরিষদ গঠন ও ক্ষমতাদান ব্যবস্থা সংবিধান লঙ্ঘনই বটে। চেয়ারম্যান পদের সম্মত মেয়াদকালও শেষ হয়ে গেছে। তৎপর এখনো পুনঃনিয়োগ নিশ্চিত করা হয়নি। সবই ঝুলছে সরকারের সদিচ্ছার ওপর। এমন নড়বড়ে ও সদিচ্ছা নির্ভর পদ ও ক্ষমতায় টলটলায়মান থেকেও সন্তু বাবু তার মুরব্বী সরকারের বিরুদ্ধে

বকে যাচ্ছেন এবং আশপাশেও ঝাপটা মারছেন, যার পরিণতি ভাল মনে হচ্ছে না। তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বজাতীয় ইউপিডিএফ, জনসংহতি সমিতির ঝাপটা খেয়ে এখন মারমুখী। মনে হচ্ছে 'তোমাকে বধিবে যে, গোকুলে বাড়িছে সে'-সরকারী বাহিনীগুলো আছে বলে রক্ষা। নইলে অনেকেই অক্কা পেতেন।

চুক্তি ও আইনে দ্বিতীয় সংবিধান বিরোধিতা হলো ঃ মন্ত্রিপদ, চেয়ারম্যান পদ, দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যপদ আর অগ্রাধিকারমূলক বিধি-ব্যবস্থা, সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১৭, ১৯, ২৭, ২৮ ও ২৯ অনুমোদন করে না। এসবই মৌলিক অধিকার বিরোধী। অনুচ্ছেদ নং-৭(২) ও ২৬(২) তা বাতিল ঘোষণা এবং রাষ্ট্র ও সরকারের প্রতি অনুরূপ আইন রচনায় নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই সাংবিধানিক নীতি-আদর্শ আর নিষেধাজ্ঞা মানা সরকারের পক্ষে বাধ্যতামূলক। তবু সরকার সন্তু বাবু আর উপজাতীয়দের প্রতি নমনীয় ও সহানুভূতিশীল। রাজনৈতিক বিবেচনায় নির্বাহী ক্ষমতা বলে এই নমনীয়তা ও সহানুভূতি পরিচালিত। কিন্তু উল্টা বুঝলি শ্যামঃসন্তু বাবুরা যুক্তি ও বিবেচনার ধার ধারেন না। তারা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের মুণ্ডপাত করতে পারলেই খুশি। এভাবে চলতে থাকলে একদিন ধৈর্যচ্যুতি হবে এবং বিপর্যয় অনিবার্য হয়ে উঠবে, এ যেন তাদের চিন্তারও অতীত। কেবল উত্যক্ত করার মাধ্যমে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের নতি স্বীকারে বাধ্য করা যাবে, এই একগুঁয়ে ধারণাকেই তারা আঁকড়ে ধরে আছেন। পার্বত্য সমস্যা সমাধানে সমানাধিকারই ধন্বন্তরী এবং তাতেই শান্তি সম্ভব। এ চিন্তা-চেতনা সন্তু বাবুদের ধ্যান-ধারণার অতীত। শান্তিচুক্তির সংবিধান বিরোধী ধারাসমূহ বাস্তবায়নের সন্তুপন্থী জিদ আর পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের ইউপিডিএফপন্থী উগ্রতা থামাতে আর কত ধৈর্য, নমনীয়তা আর ছাড় দান প্রয়োজন বুঝা মুশকিল। একটি গোল টেবিল বৈঠক প্রয়োজন, তাতে উভয় পাক্ষিক খোলাখুলি আলোচনায় নির্ণীত হবে, সংবিধান বিরোধী নয়, এমন কী কী চুক্তি দফা বাস্তবায়ন বাকি ও তা অবিলম্বে পালনযোগ্য। পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনকামীদের সাথেও এই আলোচনা হতে হবে যে, দেশের অখণ্ডতা ও সংবিধানের আওতায় এখন আর কী কী দাবী পূরণ যোগ্য আছে। এই রাজনৈতিক ব্যাপারগুলো ঝুলিয়ে রাখা যায় না।

রাজনৈতিক হিংসার বশবর্তী হয়ে সন্তু বাবুরা বর্তমান পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড চেয়রম্যানের বিরোধিতা করছেন। সন্তু বাবুর মত তার ভিত্তি নড়বড়ে নয়। তার জন্ম ও লালন-পালন হয়েছে রামগড়ে। ছাত্র জীবন থেকে রাজনীতি করছেন খাগড়াছড়ি জেলায়। কেবল বাঙ্গালী হওয়াতেই তিনি কী করে বহিরাগত হন? তিনি বিপুল ভোটে নির্বাচিত স্থানীয় সংসদ সদস্য। এই জনপ্রতিনিধিত্বের পদ, দলীয় পদের চেয়ে অনেক ভারি। সন্তু বাবু এখনো অনুরূপ পদমর্যাদায় পৌছতে সক্ষম হননি। কেবল উপজাতীয় বা আদিবাসী নেতা হওয়াটাই রাষ্ট্রীয় পদ ও মর্যাদা লাভের বৈধ ভিত্তি নয়। তজ্জন্য দরকার ভোটে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হওয়া। গণপ্রজাতন্ত্রী স্বাধীন দেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিত্বই ক্ষমতা লাভের ভিত্তি। বাংলাদেশ সংবিধান স্বীয় অনুচ্ছেদ নং ১১-তে অনুরূপ বিধানই নির্দেশ করেছে। কোন অন্তর্বর্তী নির্বাচনহীন ক্ষমতা লাভ তাতে অনুমোদিত নয়। অনুচ্ছেদ নং ২৯ কারো জন্য পদ সংরক্ষণ অনুমোদন করে না। সুতরাং একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্যরূপে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব লাভ ভূঁইয়ার পক্ষে অন্যায় কিছু নয়। শান্তি চুক্তির রচনাকারীদের অন্যতম ব্যক্তি সন্তু বাবু তো ভাল করেই

জানেন যে, এই পদটি উপজাতীয়দের জন্য বাধ্যতামূলক পূরণীয় নয়। চুক্তি দফা নং-গ/১০-এ চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী নিয়োগে উপজাতীয়দের অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। এর অর্থ বাঙ্গালী নিয়েগের অধিকার বাতিল নয়। সুতরাং সন্তু বাবুরা বাড়াবাড়ি থেকে বিরত থাকুন।

সন্তু বাবু বহুবিধ বেআইনী আর অবাঞ্ছিত কাজের সাথে জড়িত, যা তার সরকারী পদমর্যাদা ও দায়-দায়িত্বের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। তিনি প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদাসম্পন্ন আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান। তার অফিস ও গাড়িতে রাষ্ট্রীয় পতাকা ওড়ে, মানে তিনি ও তার পরিষদ সরকারের অংশ। এমতাবস্থায় সরকার ও তার প্রতিষ্ঠানসমূহের সমালোচনা করা, তার পক্ষে পালনীয় সরকারী শালীনতার পরিপন্থী। এই শালীনতা ভঙ্গ করার আগে নীতিগতভাবে তার পক্ষে উচিত সরকারী পদ ও গাড়ী-বাড়ী পরিত্যাগ করা। সরকারের ভিতর থেকে সরকারী নীতি-আদর্শের সমালোচনা ও বিরোধিতা করা হল স্ববিরোধিতা। এমন ভিন্নতা নজিরবিহীন। সরকারও এমন আচরণের প্রতি নমনীয়, যা সহজমান্য নয়। এই ভিন্ন নীতি, আদর্শ, আর আচরণের সহাবস্থান বিস্ময়কর। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি উপদ্রুত অঞ্চল। এখানে দেশী-বিদেশী সশস্ত্র লোকেরা তৎপর। রাজনৈতিকভাবে এতদাঞ্চলে হিংসাত্মক কার্যকলাপের চর্চা হয়, যার গুরু প্রবক্তা সন্তু বাবু পরিচালিত জনসংহতি সমিতি। এলাকাটি দুই বিদেশ সীমান্তের সাথে সংযুক্ত, যেখানে বিদ্রোহাত্মক সশস্ত্র কর্মকাণ্ড অত্যন্ত প্রবল। সুতরাং আভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃংখলা ও সীমান্ত রক্ষায় এখানে সেনাবাহিনীকে সদা তৎপর থাকতে হয়। এ কাজের জন্য কেবল বিডিআর, পুলিশ ও আনসার যথেষ্ট নয়। এখানে ভারি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ও ট্রেনিংপ্রাপ্ত দুস্কৃতিপ্রবণ বাহিনীসমূহ ঘাঁটি গেড়ে আছে, যাদের সশস্ত্র তৎপরতায় হর-হামেশা খুন, ছিনতাই, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজি বিরামহীনভবে চলছে। এসবের অন্যতম প্রধান হোতা জনসংহতি সমিতি পরিচালিত বিভিন্ন ক্যাডার বাহিনী আর তাদের অঙ্গচ্যুত প্রতিদ্বন্দ্বী ইউপিডিএফ। এদের স্বৈরাচারী তাণ্ডব অবাধে চালানোর লক্ষ্যে সন্তু বাবুরা সেনা প্রত্যাহারের দাবী করছেন। এ দাবী অরাজকতা সৃষ্টির কুমতলব প্রসূত। যদি তিনি সরকারী পদ ও ক্ষমতায় সমাসীন থেকে বে-আইনী প্রাইভেট বাহি-নী পোষণ করেন ও দুস্কর্মাদি চালান, তবে তার দায়ভার সরকারের উপরও বর্তাবে।

সন্তু বাবুর নিরাপত্তার জন্য সরকার একদল পুলিশ নিয়োজিত রেখেছেন। এর উপর তিনি নিজস্ব প্রাইভেট বাহিনী পোষণ করেন, যারা বেআইনী অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এসব কোন চুক্তির ফল? এই প্রাইভেট বাহিনী পোষণের উদাহরণ অন্যদের দ্বারা অনুসৃত হওয়া শুরু হলে সরকার অবশ্যই বেকায়দায় পড়বেন। এ থেকে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীরা নিজস্ব জঙ্গী বাহিনী গড়ার উৎসাহ পাচ্ছে। সন্দেহ হচ্ছে, এতদাঞ্চলে ভবিষ্যতে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধক্ষেত্র হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। আর এ কাজ শুরু করে দিয়েছেন সন্তু বাবু নিজেই। তার বিভিন্ন বাহিনী গঠন, চাঁদাবাজি, অস্ত্রবাজি ও সশস্ত্র ক্যাডার সৃষ্টির একটা অসৎ উদ্দেশ্য অবশ্যই আছে। অতএব সংশ্লিষ্ট কর্তাবাবুরা সাবধান। পার্বত্য চট্টগ্রামে ওদের বাড়াবাড়ি থেকে বিরত করা সরকারের দায়িত্ব।

১৮. সরকারের পার্বত্য নীতি আত্মঘাতী

উপরোক্ত অভিযোগটি যে অমূলক তা বলার অবকাশ নেই। সরকারী কর্মকান্ডই বিশৃঙ্খলার মদদ যোগাচ্ছে। সাথে সাথে বাড়ছে স্বপক্ষের ভিতর হতাশা। মনে হচ্ছে স্থানীয় এবং জাতীয় পর্যায়ে দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের অভাব প্রকট। কৌশলী ও বিজ্ঞ লোকদের দ্বারা পার্বত্য বিষয়াদি পরিচালিত হচ্ছে না।

এই গুরুতর আলোচনার সূত্র হলো ঃ জাতীয় প্রধান দৈনিক ইত্তেফাকের গত ১৭ ও ২২ মে তারিখের দু'টি খবর। প্রথমটি হলো, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত, আর দ্বিতীয়টি হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে প্রণীত হচ্ছে পৃথক ভোটার তালিকা। প্রথম খবরটি আনন্দের বিষয়, কিন্তু দ্বিতীয়টি দুশ্চিন্তার কারণ। নৈতিকভাবে দেশ ও জাতির পক্ষে বিভক্তির কার্যকারণ রূপে ধরা যায়ঃ এই অঞ্চলে পৃথক জাতি গোষ্ঠীভুক্ত লোকদের প্রাধান্য, ও এর প্রান্তিক অবস্থান, পৃথক রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খা, গণতন্ত্র ও ন্যায়নীতির অভাব ইত্যাদি। এই পার্বত্য অঞ্চলে বর্ণিত কার্যকারণগুলো বিদ্যমান, তাই স্বাভাবিকভাবেই বিদ্রোহ ঘটেছে, এবং তার অবসানে একটি সমঝোতা ও চুক্তির প্রয়োজন ছিলো। এখন এই সমঝোতা ও চুক্তিকে সফলভাবে কার্যকর করতে পারা, না পারার মাঝেই, সাফল্য ও ব্যর্থতা নিহিত। শাসক শ্রেণীর পক্ষে এটা এক পরীক্ষা। প্রতিপক্ষ বার বার অভিযোগ করছে ঃ সরকার যথাযথভাবে চুক্তি ও সমাঝোতা বাস্তবায়ন করছে না। তদুপরি ইউ,পি,ডি,এফ নামীয় একটি সন্ত্রাসী বাহিনী সংগঠিত করে, জনসংহতি নেতৃবৃন্দকে হত্যা, ও তাদের সংগঠনটিকে ধ্বংস করতে চাইছে। এই সোচ্চার অভিযোগের জবাবে সরকার সম্পূর্ণ নীরব।

নির্বাচন চুক্তিভূক্ত মীমাংসিত বিষয়। কেউ এর বিরোধী নয়। তবে হাঁ এর প্রক্রিয়া নিয়ে বিরোধ আছে। যে কিছু কারণে, জোট সরকারের দলগুলো আওয়ামী শান্তিচুক্তিকে কালো চুক্তি, আর তৎনির্ভর পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ আইনকে কালো আইন বলে আখ্যায়িত করে নির্বাচনী ইশতেহারে তা সংশোধনের ওয়াদা করেছে। ঐ আপত্তিকৃত কালো আইনের অন্যতম হলো ঃ স্থানীয় স্থায়ী বসিন্দাদের নিয়ে পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুতকরণ, ও তাতে জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠানবিধি।

এই আপত্তির আইন সঙ্গত ভিত্তি হলো ঃ বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ নং-১২২। তাতে ভোটার হওয়ার শর্তরূপে স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা, জায়গা জমির বৈধ অধিকারী ও সুনির্দিষ্ট ঠিকানাধারী হওয়া জরুরী নয়। চুক্তির মুখবন্ধে মূলনীতি ও অঙ্গীকার রূপে বলা হয়েছে ঃ তদ্বারা সংবিধান লঙ্ঘন, দেশ ও জাতির অখণ্ডতা ভঙ্গ, আর সার্বজনীন কল্যাণ ও উন্নয়ন ব্যাহত করা হবে না। বরং সংবিধানের আওতায় সার্বজনীন কল্যাণ ও উন্নয়ন নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। সংবিধান ও চুক্তির নীতি আদর্শের ভিত্তিতেই অখন্ড জাতীয় ভোটার তালিকা গ্রহণীয়। তদস্থলে পৃথক স্থানীয় আইন ও পৃথক ভোটার তালিকা হবে, অখন্ডতার বিরোধী একটি সূত্র, যার পরিণতি সুখকর হবে বলে ভাবা যায় না। অতীতের পৃথক পার্বত্য শাসন আইন, বাঙ্গালীদের উপর ইমিগ্রেশন আইন প্রয়োগ আর উপজাতীয় সংখ্যা প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা, এতদাঞ্চলে স্বাধীকার ও স্বাতন্ত্র্যের আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে, যার শেষ পরিণতি হলো সদ্য সমাপ্ত সশস্ত্র বিদ্রোহ।

এই উদাহরণটি সতর্ক হওয়ার বিষয়। সুতরাং পৃথক ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তাতে নির্বাচন অনুষ্ঠানবিধি হলো রাজনৈতিক ভাবে বিপজ্জজনক পদক্ষেপ। বিজ্ঞ রাজনীতিকদের পক্ষে তাতে সায় দেয়া কঠিন। পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতীয় স্বাতন্ত্র্য প্রমাণের পক্ষে এটা হবে আরেকটি সংযোজন।

এখানে স্থানীয় ভোটাধিকার ও জেলা পরিষদ নির্বাচন সংক্রান্ত আইনগুলো বিবেচ্য ঃ

"পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮। স্থায়ী বাসিন্দা সংজ্ঞা। ধারা নং-২ (কক)। অউপজাতীয় স্থায়ী বাসিন্দা অর্থ যিনি উপজাতীয় নহেন এবং যাহার পার্বত্য জেলায় বৈধ জায়গা জমি আছে বা যিনি পার্বত্য জেলায় সুনির্দিষ্ট ঠিকানায় সাধারণতঃ বসবাস করেন"।

"ধারা নং-৪(৬)। কোন ব্যক্তি অউপজাতীয় কিনা এবং হইলে তিনি কোন সম্প্রদায়ের সদস্য তাহা সংশ্লিষ্ট মৌজার হেডম্যান বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত পৌরসভার চেয়ারম্যান কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে সার্কেল চীফ স্থির করিবেন এবং এতদ সম্পর্কে সার্কেল চীফের নিকট হইতে প্রাপ্ত সার্টিফিকেট ব্যতীত কোন ব্যক্তি কোন অউপজাতীয় সদস্য পদের জন্য প্রার্থী হইতে পারিবেন না।"

"ধারা নং-১৭। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা। পরিষদের নির্বাচনের জন্য কোন ব্যক্তি ভোটার তালিকাভুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন যদি তিনি ঃ

ক) বাংলাদেশের নাগরিক হন;

খ) অন্যুন আঠার বৎসর বয়স্ক হন;

গ) কোন উপযুক্ত আদালত কর্তৃক মানসিকভাবে অসুস্থ ঘোষিত না হন;

ঘ) রাঙ্গামাটি / খাগড়াছড়ি / বান্দনবন পার্বত্য জেলার স্থায়ী বসিন্দা হন।"

উল্লেখিত আইন সমূহের ভিত্তিতে এখানে প্রশ্ন হলো ঃ ভোটাধিকারের পক্ষে স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া, এবং তা প্রমাণের জন্য বৈধ জায়গা জমি বা সুনির্দিষ্ট ঠিকানা থাকা আইনতঃ জরুরী কিনা? তা হলে তো বাংলাদেশের কোটি কোটি সংখ্যক বাসিন্দা আর পার্বত্য অঞ্চলের অধিকাংশ লোক যারা বাস্তুহারা ভূমিহীন ভাসমান ও জুমিয়া, তাদের পক্ষে ভোটার হওয়ার কোন যুক্তি থাকবে না। অথচ ভোটাধিকার হলো নাগরিক অধিকারের অংশ। বাংলাদেশ সংবিধান এই রাষ্ট্রকে গণপ্রজাতন্ত্রী ঘোষণা করে, এর বাসিন্দা গরীব নিঃস্ব জনসাধারণকে সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী করেছে, এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগের সূত্র হলো তাদের ভোটাধিকার। সুতরাং পার্বত্য জেলা পরিষদ আইনের ধারা নং-১৭(ঘ) নং বিধানটি সাংবিধানিক নীতি নির্দেশের বিরোধী, এবং সাংবিধানিক আইন ১২২ (২/ঘ) এর সরাসরি লঙ্ঘন। তাতে, স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার শর্ত নিহিত নেই, যথা ঃ "তিনি ঐ নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বা আইনের দ্বারা নির্বাচনী এলাকার অধিবাসী বিবেচিত হোন।"

জন্মসূত্রে বাংলাদেশী নাগরিক হয়েও পার্বত্য অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙ্গালীরা, অস্থায়ী অস্থানীয় হওয়ার কারণে এতদাঞ্চলে ভোটাধিকার হারালে, এই ঐতিহাসিক প্রশ্ন ওঠা সম্ভব যে, উপজাতিরা কি পার্বত্য অঞ্চলের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা? তাদের গানে, রূপকথায়, রাজাদের লিখিত স্মৃতি কথায়, এবং সরকারী দলিল পত্রে এটাই প্রমাণিত যে, তারা সর্বাধিক বৃটিশ আমলে পার্শবর্তী দেশ ও অঞ্চল থেকে উদ্বাস্তুরূপে এসে এতদাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ এবং পার্বত্য অঞ্চল

শাসন আইন এর ৫২ ধারার আওতায় অভিবাসন লাভ করেছে। এগুলো অকাট্য ঐতিহাসিক প্রমাণ; উদ্দেশ্যমূলক রটনা, রচনা বা বানোয়াট বিদ্বেষ কথা নয়। উপজাতিরা সমানাধিকার ও এক জাতিত্বের আওতায় বাঙ্গালীদের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করুক, এবং বিদ্বেষপূর্ণ ভুল ধারণা থেকে মুক্ত হোক এটাই আমাদের কামনা। তিক্ত হলেও এই সত্য কথন অপরিহার্য্য।

বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের আদি জাতীয় ভূমি। পার্বত্য চট্টগ্রাম তার চিরকালীন ভৌগোলিক অংশ। কোন প্রতিবেশী দেশ বা জাতি, কদাপিও এর অধিকার দাবী করেনি। স্থানীয় উপজাতিদের কেউ এতদাঞ্চলের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ছিলো না। স্থানীয় উপজাতীয় চীফদের নিয়োগদাতা ও প্রতিষ্ঠাতা হলো ঔপনিবেশিক বৃটিশ শক্তি। এর অধিক কৌলিন্য তাদের নেই।

বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের অর্জিত স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র। তারা উদারতা হেতু বাঙ্গালী জাতীয়তার পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তা গ্রহণ করে, এই রাষ্ট্রের বাসিন্দা অন্যান্য জাতি গোষ্ঠীভুক্ত সংখ্যালঘুদের এই জাতি ও দেশের অংশিদারিত্ব দান করেছে। ভিন্ন জাতি গোষ্ঠীভূক্ত বাংলাদেশী সংখ্যালঘুদের পক্ষে এটা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের বিষয়। বিদ্বেষ, অগ্রাধিকার ও স্বাধিকার আন্দোলন এই ক্ষেত্রে সামঞ্জস্যশীল নয়।

পার্বত্য বাঙ্গালীরা রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অখন্ডতা এবং সংবিধান সম্মত সমানাধিকারই চায়। উপজাতিদের সাথে তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই কাম্য। এই যুক্তিসঙ্গত কামনাকে উপজাতিরা স্বাগত জানালে উভয় সম্প্রদায়ের মাঝে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ঘটা বাস্তবিকই সম্ভব।

বাঙ্গালীদের সাথে প্রতিযোগিতায় উপজাতিদের পরাজিত হবার ভয়কেও কাটিয়ে ওঠা সম্ভব। আর সে হলো আনুপাতিক হারে সম্পদ সম্পত্তি ও সুযোগ সুবিধায় ভাগ দান এবং বারি ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রধান পদ বন্টন। এরূপ ভারসাম্যময় শান্তি প্রতিবিধান ছাড়া সাম্প্রদায়িক তোষণনীতি, পার্বত্য অঞ্চলে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হবে, এ আশা বৃথা। সাহসী পদক্ষেপ ও সত্য কথন অবশ্য কর্তব্য। শেখ মুজিব ও জিয়াউর রহমান তজ্জন্য ধন্যবাদার্হ। তাদের যে কোন একজন বেঁচে থাকলে পার্বত্য সংটক এরূপ বিশৃঙ্খল ও দীর্ঘায়িত হতো না।

এখন এই পরিস্থিতিতে পৃথক ভোটার তালিকায় নির্বাচন হলে, তা জেলা পরিষদ থেকে জাতীয় পরিষদে গড়াবে, এবং তাতে রাষ্ট্রের এককেন্দ্রিকতা ও জাতীয় একতা বিপন্ন হওয়ার পথ উন্মুক্ত হবে, যা হবে দেশ ও জাতির অখন্ডতার বিপক্ষে হুমকি। ভোটাধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে স্বপক্ষের দ্বারা বিদ্রোহ ঘটাও সম্ভব।

১৯. পার্বত্য বাঙ্গালীদের সূচীত সমঅধিকার আন্দোলন

গত ২৭ জানুয়ারী ২০০৪ ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে আহুত এক সাংবাদিক সম্মেলনে পার্বত্য বাঙ্গালীদের জন্য পঞ্চাশেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও জনপ্রতিনিধি সমঅধিকার আন্দোলন নামীয় একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠার ঘোষণাসহ তার লক্ষ্য উদ্দেশ্যের বর্ণনা দিয়েছেন। বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এটা অবশ্যই বিবেচ্য যে, পার্বত্য বাঙ্গালীরা গণতন্ত্র, মানবাধিকার, মৌলিক অধিকার, স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত এক হতভাগ্য জনগোষ্ঠী। তারা সরকার ও উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর হাতে জিম্মি দশায় আবদ্ধ। সর্বত্র কেবল উপজাতি উপজাতি চীৎকার ও কোলাহল। তাতে চাপা পড়ে আছে প্রকৃত দুর্ভাগ্য পীড়িত লোকজন ও ক্ষুদ্র আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর হাহাকার। তাদের দুঃখ দুর্দশা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখে।

সুবিধাভোগী অগ্রসর উপজাতীয়রা আধিপত্য বিস্তারে তৎপর ও মুখর। সরকার তাদের নিয়ে বিব্রত ও দিশাহারা। এই হুলস্থূলে স্থানীয় বাঙ্গালী জনগোষ্ঠী ও ক্ষুদ্র আদিবাসী জাতিসত্তাগুলো অবহেলিত ও বিস্মৃত। তাই তাদের নিজেদেরকেই আরেক হুলস্থুল বাধিয়ে প্রমাণ দেয়া আবশ্যকঃ তারা অবহেলা ও বিস্মৃতির পাত্র নয়। এই নিরীহদের ন্যায্য অধিকারের প্রতি উদাসীনতা ও বিপজ্জনক। তাদের সম্মিলিত শক্তি সামর্থ সুবিধাভোগী আদিপত্যকামীদের চেয়ে কম নয়, বেশী। এই নিরীহদের আনুগত্য আর নীরবতার অর্থ অক্ষমতা বা তাবেদারীও নয়। দীর্ঘ অবিচার ও বঞ্চনার চাপে এখন তারা অধৈর্য্য ও বিক্ষুব্ধ। তারা সমঅধিকার অর্জনে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এখন বাধ্য। এটা অবশ্যই শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক প্রয়াস, কোন বিদ্রোহের অপচেষ্টা নয়। আইনের শাসন, ন্যায় বিচার, ও শান্তির পক্ষে সরকারকে জাগ্রত ও উদ্বুদ্ধ করাই এর উদ্দেশ্য। এ যাবত সরকার সুবিধাভোগীদের মদদ দিয়েছেন। তাদের মন্ত্রী পদ, এমপি পদ, চেয়ারম্যান পদ ইত্যাদিতে ক্ষমতাসীন করাতে কোনই সুফল ফলেনি। এ পদগুলো আনুগত্যের পুরস্কার হতে পারে, বিদ্রোহের উপহার নয়। সন্তু লারমা, মনিস্বপন দেওয়ান, মানিক লাল গং, ছদ্মবেশী বিদ্রোহীরা সরকারী চেয়ার, ক্ষমতা ও রাষ্ট্রীয় পতাকার অবমাননা ও অপব্যবহারে লিপ্ত এদের দ্বারা সন্ত্রাস ও বিদ্রোহের পৃষ্ঠপোষকতা হচ্ছে। ক্ষমতা ও পদ হওয়া উচিত আনুগত্যের টোপ। তার পক্ষে যোগ্য লোক পাওয়ার প্রতিযোগিতা দিলে প্রার্থীদের ভীড় জমবে। পরিত্যক্ত হবেন ছদ্মবেশী বিদ্রোহীরা। গণতান্ত্রিক কৌশলের কোন সফল বিকল্প নেই। ভোটার তালিকা সংশোধনের চুক্তির কারণে সরকার যেন ঠেকে গেছেন। তাই নির্বাচন হচ্ছে না। এটি সরকারের এক মহা দুর্বলতা। ভেবে দেখা আবশ্যক ঃ পার্বত্য চুক্তিটি কি অলঙ্ঘনীয় সরকারী চুক্তি? চুক্তির কতিপয় অসাংবিধানিক ধারা না দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আইন বাস্তবায়ন জরুরী? সংবিধান গণভোটে অনুমোদিত। এই অনুমোদনে উপজাতীয়রাও শরিক। চুক্তিতেও তা মান্য করার ঐক্যবদ্ধ অঙ্গীকার ব্যক্ত। এই ঐকমত্য একটি শক্তিশালী সূত্র যাকে অবলম্বন করে সব বিরোধীতার সফল মোকাবেলা করা সম্ভব। এই প্রশ্নগুলোর কোন সদুত্তর দিতে সন্তু বাবুরা সক্ষম হবেন না। তারা বড়জোর সংবিধান সংশোধনের দাবী তুলতে পারেন, যা সরকার বা জনসংহতি সমিতি সহ কারো এখতিয়ারাধীন নয়। এই বিষয়টি চুক্তি কালেই মীমাংসিত। সরকার ও

জনসংহতি সমিতি চুক্তিতে লিখিত ভাবেই সংবিধানের প্রতি আনুগত্য দেখিয়েছেন। এখন সে অনুসারে চুক্তির অসাংবিধানিক দফা গুলোই সংশোধিত বা বাতিল হতে হবে এবং সে অনুযায়ী আইন ও বিধি বিধানগুলো সামঞ্জস্যপূর্ণ করা প্রয়োজন। নতুবা সাংবিধানিক আইন ৭(২) ও ২৬(২) অনুসারে সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যশীল বিধিবিধান সমূহ অকার্যকর হয়ে যাবে। এটি ঠেকাতে সরকার বা জনসংহতি সমিতি সক্ষম হবেন না। সুতরাং অসাংবিধানিক চুক্তি দফা ও তথনির্ভর বিধি ব্যবস্থার বাস্তবায়ন বৈধ নয়, এই অপ্রিয় সত্যটি চেপে রাখার কোন মানে হয় না। এটা সরকারী দুর্বলতা। এই প্রশ্নে জনসংহতি সমিতিকে ভয় পাওয়া অনর্থক। এটা এই প্রতিবাদী গোষ্ঠিকে দমিয়ে দেয়ার শক্তিশালী এক হাতিয়ার, যে হাতিয়ারের যোগানদার তারা নিজেরাই। জোট সরকারের তাতে কোন সংশ্লিষ্টতা নেই।

জনসংহতি সমিতি ফেকড়া বাধাবার অজুহাতই কেবল খুঁজে। তাতে সরকার নিরীহের মত চুপচাপ থাকে, কোন খুঁত ধরে না। নইলে কি জনসংহতি সমিতি ও তার প্রধান সন্তু লারমা এত উচ্চ বাচ্য করতে পারেন? নীতির প্রশ্নে সরকার কঠোর নয়, কৌশলীও নয়। নিরীহ উদার এই সরকার বিতর্ক এড়াতে চুপ করে থেকে কেবলই সময় কাটাচ্ছেন। এতে বিরোধিতা তুঙ্গে উঠছে। সন্ত্রাস অরাজকতা আর বিদ্রোহ এই পরিবেশে শক্তিশালী ও পোষিত হচ্ছে। আত্মরক্ষার প্রয়োজন তাই বাড়ছে। পার্বত্য বাঙ্গালী আর ক্ষুদ্র আদিবাসী জনগোষ্ঠিগুলো এই পরিস্থিতিতে শংকিত। সুবিধাভোগী অগ্রসর উপজাতীয়রা চরমপন্থা অবলম্বনেরই লক্ষ্যে সংগঠিত আর সশস্ত্র। তাদের লক্ষ্য সরকারী বাহিনী আর বাঙ্গালীদের তাড়িয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে স্থানীয়ভাবে নিজেদের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা। সরকার ও তার বাহিনীগুলো উপজাতীয় অভিযোগ আর সমালোচনার তোড়ে অতিষ্ঠ। পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের জন্য আপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী করে এই আপদ থেকে সহজে রক্ষা পাওয়া যায়, সেই সহজ উপায়টি এখন তাদের চিন্তার বিষয়। বিকল্পরূপে কর্তাদের অবস্থানের নির্দিষ্ট মেয়াদকাল আছে। সেই বিদায়কালে নির্বিঘ্নে পৌছাটা তাদের পক্ষে অন্যতম স্বস্তির কারণ। কিন্তু পার্বত্য বাঙ্গালীদের এরূপ কোন স্বস্থিপূর্ণ নিষ্ক্রান্তি কাল নেই। দুঃখ, কষ্ট, সংঘাত সংঘর্ষ আর তপ্ত পরিস্থিতির মোকাবেলা করেই তাদের জীবন কাটাতে হচ্ছে এবং হবে। তাই তারা সংকটের সমাধান ও শান্তির কথা ভাবতে বাধ্য। এই ভাবনারই ফল তাদের সমঅধিকার আন্দোলন। বিক্ষুব্ধ উপজাতীয়দের প্রতিপক্ষ হলেন সরকার, তার বাহিনীসমূহ, আর পার্বত্য বাঙ্গালী সমাজ। বাঙ্গালীরা সরকার ও তার বাহিনী সমূহের সপক্ষ শক্তি বলেই উপজাতীয়দের ধারণা। অথচ বাস্তবতা হলো ঃ স্থানীয় বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের প্রকৃত প্রতিপক্ষ নয়। তারা শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমঅধিকার লাভের প্রয়াসী মাত্র। উপজাতীয়রা তাদের এই ন্যায্য দাবী মেনে নিলেই উভয়ের মধ্যকার বিরোধ ও বৈরীতার অবসান হয়ে যাওয়া সম্ভব। সরকার ও তার বাহিনী সমূহের বিরুদ্ধে পরিচালিত উপজাতীয় সংগ্রামে বাঙ্গালীরা কোন পক্ষ নয়। তাদের সমস্যা হলো ঃ শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমঅধিকার, যা বিপক্ষীয় উপজাতীয় বিরোধীতায় বাঁধাগ্রস্ত। এ বিরোধী অবস্থান পরিত্যাগের মাধ্যমে উপজাতীয়রা সহজে পার্বত্য বাঙ্গালীদের সহযোগী হয়ে যেতে পারে। এভাবে উভয়ের মাঝে প্রতিবেশী সুলভ সখ্যতা গড়ে ওঠা সম্ভব। সুতরাং উভয়ের প্রতিপক্ষতা স্থায়ী কিছু নয়, কৃত্রিম। সহসাই এর অবসান হতে পারে। তৎপ্রতি বাঙ্গালীরা উদগ্রীব। উপজাতিদের প্রতি প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের ঐক্যবদ্ধ আহ্বানঃ

শান্তি পূর্ণ সহায়বস্থান ও সমঅধিকার মেনে নিন। সাম্প্রদায়িক শান্তি ও সুস্থিতি প্রতিষ্ঠিত হোক। অহিংস পরিবেশ গড়ে উঠুক। সরকারকে উন্নয়নে বাধ্য করতে পাহাড়ী বাঙ্গালী ঐক্য মোর্চা হবে অব্যর্থ।

এটা ভুল ধারণা যে বাঙ্গালীরা জাতিগতভাবে উপজাতীয়দের জায়গা জমি বাড়ি ঘর পেশা ও ব্যবসা জবর দখল করছে, এবং উপজাতীয় নারীরা তাদের যৌন লালসার শিকার। এরূপ ক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত কিছু কিছু বিরল ঘটনা একতরফা আর ব্যাপকও নয়। বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের দ্বারা মাত্রাতিরিক্ত অভিযুক্ত আর প্রতিহিংসার শিকার। সাম্প্রদায়িক শান্তির স্বার্থে এই বাড়াবাড়ির অবসান হওয়া দরকার। রাজনীতিকেও সহিংস করা অনুচিত। উপজাতীয়দের তুলনায় বাঙ্গালীরা অধিক সহনশীল ও শান্তিপ্রিয়। এ কারণেই বাঙ্গালী পাড়া পরিবেশগুলো অধিক নিরাপদ ও অভ্যর্থনা সমৃদ্ধ। এ তুলনায় উপজাতীয় পাড়াসমূহে নির্বিঘ্নে থাকা চলাফেরা ও অভ্যর্থনা লাভ অত্যন্ত কঠিন। আগে এমনটি ছিলো না। এ হলো জাতিগত বিদ্বেষ চর্চিত রাজনীতির ফল। এটি এক অশুভ সামাজিক উত্তরণ।

বাঙ্গালীরা জাতিগতভাবে কখনো সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ চর্চায় লিপ্ত নয়। কিছু কিছু নৃশংস ঘটনায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে পাল্টা প্রতিশোধ নিয়েছে মাত্র, যা দুর্ভাগ্যজনক। কাউখালি গণহত্যা, ভূষনছড়া গণহত্যা ইত্যাদি উপজাতীয়দের দ্বারাই সুচিত। যার পাল্টা প্রতিশোধ না হওয়াই ছিলো অস্বাভাবিক। জাতিগত বিদ্বেষ প্রসূত হানাহানিতে বাঙ্গালী পক্ষের হতাহতের সংখ্যা অধিক, তথা হাজার হাজার। সে তুলনায় উপজাতীয় পক্ষে হতাহতের সংখ্যা নগন্য। সম্পদ ধ্বংসের পরিমাণ ও বাঙ্গালী পক্ষে অনেক বেশী। এই হত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিপুলতা ব্যাপক যুদ্ধ ক্ষতিকেও হার মানাবে। তবু বাঙ্গালীরা উপজাতীয়দের কাছে অধিকারগত সমতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানই চায়। রাজনৈতিক প্রশ্নে ও উভয়ের মাঝে সমঝোতা কাম্য। সংঘাত পরিহারের এই উদার মনোভাব সরকার ও উপজাতীয়দের দ্বারা অভ্যর্থিত হবে, এই আশায় তারা ধৈর্য্য ধারণ করে আছে। তাই তারা বিব্রতকর কোন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাচ্ছে না। অন্যায় অবিচারের চাপেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করে আছে। অন্যায় অবিচারের চাপে কখনো তারা অধৈর্য্য, আর হতাশ। সরকার ও উপজাতীয় পক্ষে শুভ বুদ্ধির উদয় হবে, তাদের এই আশাবাদ এখন অনিশ্চিত পথ চাওয়ায় পরিণত। তাই আন্দোলনের উদ্যোগ গ্রহণ। এটা নিরুপায় বিকল্প অবস্থান। অস্ত্রধারন নয়, বিদ্রোহ নয়, সংঘাত নয়, কেবল সংঘবদ্ধ প্রতিবাদ ও যুক্তি প্রদর্শনেই এই আন্দোলন সীমাবদ্ধ। ন্যায় বিচারের প্রতি সরকার ও উপজাতীয়দের উদ্বুদ্ধ করা গেলেই এর প্রয়োজন ফুরাবে। এই আন্দোলনে ধর্ম বর্ণ দলমত নির্বিশেষে সকল পার্বত্য বাঙ্গালী ঐক্যবদ্ধ। তাদের সহযোগী হতে উদ্বুদ্ধ ক্ষুদ্র আদিবাসী সংগঠন সমূহ। এদের সহ বাঙ্গালীদের অবশ্যই সমঅধিকার তথা সাংবিধানিক অধিকার অর্জন করতে হবে। এটা জাতীয় নয় স্থানীয় রাজনীতি। এর সাথে তাদের বাঁচা মরার প্রশ্ন জড়িত।

সমঅধিকার কী? এ হলো ঃ যে অধিকার গোটা দেশবাসী ও পার্বত্য উপজাতীয় সমাজ ভোগ করে, এবং যা বাংলাদেশ সংবিধান, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার দ্বারা অনুমোদিত। এই অধিকারাদি অর্জন ও ভোগ করার দাবী অন্যায় কিছু নয়। এসব থেকে বঞ্চিত রাখাই অন্যায়। পার্বত্য বাঙ্গালীরা এই অন্যায়েরই প্রতিকার চায়।

এটা বিস্ময়কর যে সরকার সংবিধান রক্ষার শপথ নিয়ে তা থেকে বিরত আছেন, এবং জনসংহতি সমিতি প্রধান পার্বত্য চুক্তিতে সংবিধান অনুসরণের অঙ্গীকার করে ও তার খেলাপ আচরণে

লিপ্ত। সংবিধান বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় আইন। এর সাথে অসামঞ্জস্যশীল আইন বিধি বিধান চুক্তি ও নীতি নির্দেশ অকার্যকর, অবৈধ ও বাতিল যোগ্য, যথা অনুচ্ছেদ নং ৭(১) ৭(২) ২৬(১) ২৬(২)। এই সাংবিধানিক বাধা সরকারী আচরণ কতিপয় চুক্তি দফার উপর প্রযোজ্য। কিন্তু এটা আমলে আনা হচ্ছে না। তাই সরকার ও জনসংহতি সমিতি নেতা সন্তু লারমা, সর্বোচ্চ আইন সাংবিধানিক নির্দেশ লঙ্ঘনের অপরাধে অপরাধী।

বাংলাদেশ সংবিধান নির্দেশ করে ঃ

(১) সকল নাগরিকের জন্য সুযোগের সমতা নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে। এটা অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি। (যথা ঃ অনুচ্ছেদ নং ১৯)

(২) সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। এটি অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার আইন অনুচ্ছেদ নং ২৭।

(৩) ধর্ম গোষ্ঠি বর্ণ নারী পুরুষ ও জন্মস্থানের ভিন্নতার কারণে রাষ্ট্র কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না। এটি ও অলঙ্ঘনীয় মৌলিক অধিকার আইন অনুচ্ছেদ নং ২৮।

(৪) সকল নাগরিকের জন্য পদ লাভ অবাধ। এটি মৌলিক অধিকার আইন অনুচ্ছেদ নং ২৯।

(৫) বাংলাদেশের সর্বত্র অবাধ চলাফেরা এবং যে কোন স্থানে বসবাস ও বসতি স্থাপনের অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। মৌলিক অধিকার আইন অনুচ্ছেদ নং ৩৬।

(৬) প্রত্যেক নাগরিকের সম্পত্তি অর্জন, ধারণ, হস্তান্তর ও বিলি বন্টন ব্যবস্থার অবাধ অধিকার স্বীকৃত। মৌলিক অধিকার আইন অনুচ্ছেদ নং ৪২।

পার্বত্য চুক্তি ও তথনির্ভর আইনে উপরোক্ত সাংবিধানিক নির্দেশগুলো চরমভাবে লঙ্ঘিত হয়েছে। পার্বত্য বাঙ্গালীরা তাতে উচ্চ শিক্ষা, চাকুরী, জনপ্রতিনিধিত্ব, সম্পত্তি লাভ, পেশা ইত্যাদির ক্ষেত্রে অসমতা ও বৈষম্যের শিকার। বিভিন্ন ক্ষেত্রে উপজাতীয় অগ্রাধিকার হেতু তারা চরম বৈষম্যে আবদ্ধ। মন্ত্রী পদ, চেয়ারম্যান পদ, সার্কেল প্রধানের পদ, উপজাতীয়দের জন্য সংরক্ষিত। প্রতিনিধিত্ব মূলক পরিষদ সদস্য পদের ও দুই তৃতীয়াংশ উপজাতীয়দের প্রাপ্য। চলাফেরা আর বসতি স্থাপনের ও অবাধ অধিকার নেই। সম্পত্তি লাভ, খরিদ বিক্রি, আর হস্তান্তর ও নিষিদ্ধ। এতসব বেআইনী আচরণ ও নিষেধাজ্ঞায় তারা অতিষ্ঠ। অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল কোন্ আশায় তারা নীরব ও ধৈর্য্য ধারণ করে থাকবে? এই বৈষম্য, অবিচার ও নিষেধাজ্ঞাগুলো তাদের পক্ষে আত্মঘাতী। এই অচলায়তন ভাংতে হবেই। তজ্জন্য দরকার ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান, সোচ্চার প্রতিবাদ ও সংগঠিত তৎপরতার। এই অর্থেই সূচিত সমধিকার আন্দোলন একটি যথার্থ উদ্যোগ।

উপজাতীয়রা অহিংশ আর সহিংশ এই উভয় পন্থায় এক সাথে বাঙ্গালী ও সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে লিপ্ত। কিন্তু বাঙ্গালীদের সূচিত এই আন্দোলন অহিংশ শান্তিপূর্ণ। তাদের আন্দোলন আইনী ও আবেদন মূলক। এই আন্দোলনে উপজাতীয়রা প্রতিপক্ষ নয়। সরকারকেও অভিযুক্ত করা হচ্ছে না। কর্তৃপক্ষের কাছে সুবিচার চাওয়া হচ্ছে মাত্র। তাতে সরকার বা উপজাতীয়দের ক্ষতিগ্রস্ত ও বিব্রত হওয়ার কোন উপাদান নেই। অধিকার চাওয়া অন্যায় বা কারো বিরুদ্ধাচারন নয়। গত কয়েক দশক কালের একটানা অন্যায় ও অবিচারের নিস্পেষনে এখন তারা

স্বাভাবিকভাবে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ। এই হতাশা ও ক্ষোভের প্রতিকার মূলক বহির প্রকাশটাও আইং শৃঙ্খলার আওতায় আবদ্ধ। এটাকে শান্তিপূর্ণ আর অহিংশ রাখার দায়িত্ব সরকার ও উপজাতীয়দের। এটিকে দমাতে শক্তি প্রয়োগ করা হলে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠা সম্ভব। তখন উগ্রপন্থী নেতৃত্ব মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

উপজাতীয়দের রাজনৈতিক দাবী স্বায়ত্তশাসন বা আত্ম নিয়ন্ত্রণ অধিকার লাভ। স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের তাতে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ন না হলে, বিরোধিতার কোন প্রশ্নই উঠে না। তবে এটিকে আগে সংবিধান সম্মত হতে হবে। তজ্জন্য রাষ্ট্র কাঠামো সাংবিধানিকভাবে ইউনিটারীর স্থলে ফেডারেল করা জরুরী। কিন্তু উপজাতীয়রা সংবিধান সংশোধনের দাবী পরিত্যাগ করেছেন। তাতে স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার মঞ্জুরের কোন সংস্থান নেই। একদা জাতি নিজস্ব স্বার্থে রাষ্ট্রকে ফেডারেল বানাতে প্রয়োজনীয় সাংবিধানিক ব্যবস্থা নিলে, সে সুযোগ আসতে পারে। তজ্জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

পার্বত্য বাঙ্গালীরা শান্তিপূর্ণ আইনী আন্দোলনে আস্থাশীল। উপজাতীয়দের সাথে এখানেই তাদের তফাৎ। এই নীতিগত ভিন্নতা কোনরূপ সংঘাত সংঘর্ষের কার্যকারণ হতে পারে না। বাঙ্গালীদের সমঅধিকার আন্দোলনের এটাও একটি অংশ যে, তারা সুলভ শান্তিও সুস্থিতি কামনা করে, হিংসা ও বৈরিতা নয়। সরকারকেও তারা ক্ষেপাতে বা বিব্রত করতে চরমপন্থা অবলম্বনের পক্ষপাতী নয়। তবে অহিংশ আইনী দৃঢ়পন্থা অবলম্বনেও তারা সংকল্পবদ্ধ। এই হুশিয়ারী সরকার ও উপজাতি এই উভয় পক্ষের প্রতি প্রযোজ্য। এর প্রতিক্রিয়া কী হবে, এখন তাই দেখার অপেক্ষা।

কার্যত সরকার চুক্তি প্রশ্নে সংবিধান লঙ্ঘনকারী এবং ঐতিহাসিকভাবে উপজাতীয়দের অধিকাংশ অস্থানীয় অভিবাসী বংশধর। ঐতিহাসিক ভাবে উপজাতীয়দের জাতীয় আবাস ভূমি হলো ত্রিপুরা, মিজোরাম ও আরাকান। সরকারের বিরুদ্ধে সাংবিধানিক অভিযোগ যেমন অকাট্য তেমনি উপজাতীয়দের স্থানীয় অভিবাসী বংশধর হওয়ার ইতিহাস ও অপ্রিয় সত্য। যুক্তিগত দুর্বলতাই দমিয়ে দিবে সরকার ও উপজাতীয় পক্ষকে। সুতরাং ভেবে দেখা আবশ্যক ঃ বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না আপোষ রফা যথার্থ।

২০. পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বসতিস্থাপন পূনর্বাসন ও প্রতিরক্ষা

বাংলাদেশ রাষ্ট্র বাঙ্গালী সংখ্যা গরিষ্ঠতার ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম তারই ভৌগোলিক অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম প্রধান অঞ্চল হওয়া মৌলিক নয়, কৃত্রিম। এ কারণেই ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগকালে এটি ভারতের প্রাপ্য বা স্বতন্ত্র অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি। দেশ বিভাগকালে সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের ভাগ্যে অনেক ওলট পালট হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবের অধীন গুরুদাসপুর জেলা সীমান্তবর্তী মুসলিম প্রধান অঞ্চল রূপে পাকিস্তানের প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু কাশ্মীরের সাথে ভারতের ভূমি সংযোগ ও তার পাকিস্তান বা ভারতের সাথে যোগদানের সুযোগ বজায় রাখার প্রয়োজনে গুরুদাসপুরকে ভারতভুক্ত করে দেয়া হয়। ঠিক একই কারণে আসাম ও ত্রিপুরার সাথে ভারতের ভূমি সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে, পশ্চিম দিনাজপুর ও করিমগঞ্জ অঞ্চলকে ভারতের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। এই দুই সংযোগ ঘটনা না ঘটান হলে কাশ্মীর হতো পাকিস্তানের বাধ্য অঞ্চল, এবং আসাম ও ত্রিপুরা হতো বাংলাদেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বাধ্য এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে অনুরূপ ভূমি সংযোগ ঘটানোর কোনরূপ ভৌগোলিক ও জাতিগত আনুকুল্য ছিলো না। এর উত্তরে অবস্থিত ত্রিপুরা ও পূর্বে অবস্থিত মিজোরাম সীমান্ত দুর্গম পর্বতসংকুল। এ পথে আসামের সাথে সংযোগ সাধন দুরুহ। জাতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতীয়রা হলো বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও জাতিগত ভাবে স্বতন্ত্র। স্থল যোগাযোগের দুরুহতা ও জাতিগত ভিন্নতা হেতু, এতদাঞ্চলের ভারতভুক্তি বিচ্ছিন্নতারই সহায়ক হবে বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক অভিন্নতা ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে রক্ষার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সঠিক ভাবেই বাংলাদেশ ভুক্ত রাখা হয়, যার কোন বিকল্প ছিলো না। ভৌগোলিক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম, মূল চট্টগ্রামেরই অংশ এবং লোক হিসেবে স্থানীয় উপজাতীয়তা জেলা ভাগের সুযোগে আকস্মিক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মাত্র। তারা আদি চট্টগ্রামী মূলের লোক নয়। অভিবাসনের মাধ্যমে তারা হালে স্থানীয় অধিবাসী রূপে স্বীকৃত। মাত্র শত বছর আগে পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ধারা নং ৫২ তথা পর্বতে অভিবাসন নামক আইন বলে তারা স্থানীয় অধিবাসী। তারা চট্টগ্রামী মৌলিকত্বসম্পন্ন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা সম্পন্ন লোক নয়। এই বিচারে তাদের অগ্রাধিকার বিশেষাধিকার স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী অযৌক্তিক। তদুপরি এই প্রশ্নে তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন, একটি অমার্জনীয় রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি। সুতরাং তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী বিবেচিত হয়। এই ব্যবস্থারই অংশ হলো এতদাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করণ ও রাষ্ট্রের স্বপক্ষ জনশক্তি বাঙ্গালীদের সংখ্যাগত প্রাধান্য রচনা। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকে তাই অবাঙ্গালী বিদ্রোহের বিকল্প ভাবাই সঙ্গত। এতে কারো বিরোধিতা ও আপত্তি উত্থাপন যৌক্তিক নয়। স্থানীয়ভাবে সেনা বাহিনীর অবস্থান প্রতিরক্ষামূলক। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপন তাদের হস্তক্ষেপের বিষয়বস্তু নয়। তাদের হস্তক্ষেপকে ঠেকাতে, সশস্ত্র উপজাতীয় বিদ্রোহের বিপক্ষে শান্তি স্থাপক সপক্ষীয় জনশক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন, বাঙ্গালী বসতি সেই প্রয়োজনেরই সম্পূরক। এটা উপজাতীয় বৈরীতা নয়। সেনা বাহিনীর দায়িত্বপালন সংক্রান্ত কঠোরতা তাতে হালকা হয়েছে। উপজাতীয় বিদ্রোহ দমাতে সেনা বাহিনীর পাশাপাশি

বেসামরিক বাঙ্গালী জনশক্তি মোতায়েন নমনীয় ব্যবস্থা। যখন বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের সূচনা হয়নি, বাংলাদেশের সেই শিশুকালে, উপজাতীয় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছে। তখন দেশের অখন্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে এতদাঞ্চলে সেনা মোতায়েন ছাড়া উপায় ছিলো না। তৎপর বিদ্রোহী পক্ষের সাথে আপোষ রফামূলক আলোচনা ও বৈঠক হলেও তা ফলপ্রসু হয়নি। তাই সরকারী পর্যায়েই সিদ্ধান্ত হয় যে, সেনাবাহিনী কেবল সশস্ত্র দুষ্কর্মই ঠেকাবে এবং বিদ্রোহী জনশক্তির মোকাবেলায় স্বপক্ষ বাঙ্গালী জনশক্তিকে সংখ্যা ও সামর্থে জোরদার করে তুলতে হবে। সুতরাং উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফল সেনা মোতায়েন ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে উপজাতীয় পক্ষের আপত্তিও আন্দোলন এই প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক নয়। এখনো উপজাতীয় পক্ষ উগ্রতা হিংসা অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি আর অরাজকতা ত্যাগ করে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ধারায় ফিরে এলে সেনাবাহিনীর পক্ষে তার ক্যাম্পে ফিরে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং বাঙ্গালী জনস্রোত ও থেমে যাবে। বাঙ্গালী পাহাড়ী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমঅধিকার নীতি প্রতিষ্ঠিত হলে, এতদাঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের ধারা অবশ্যই জোরদার হবে। কেবল স্বপক্ষীয় সুযোগ সুবিধা আর বিপক্ষ বৈরীতা, পার্বত্য অঞ্চলকে সংঘাতমুখর ও বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা মুহূর্তে সব উপজাতীয় বৈরীতা ভুলে যেতে প্রস্তুত, যদি উপজাতীয় পক্ষ সকলের সমঅধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং পার্বত্য রাজনীতি খেলার ট্রাম কার্ড তাদের হাতেই নিহিত। অযথা সেনাবাহিনী আর বাঙ্গালী পক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

অরাজক ও বিক্ষুব্ধ পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা বাহিনী প্রত্যাহৃত হলে, এতদাঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা আর অখন্ডতা রক্ষার দায়িত্ব কে পালন করবে? উপজাতীয় কোন জনসংগঠন সে দায়িত্ব পালনের উপযোগী আস্থা এখনো অর্জন করতে পারেনি। তারা নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ নয়। বরং পরস্পর সংঘাত ও বৈরীতায় লিপ্ত। এটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ধারক নয়। উপজাতীয়রা পরস্পর রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ও সংঘাতে লিপ্ত। তারা গঠনমূলক রাজনীতির কোন উদাহরণ স্থাপন করতে পারেনি। দেশ ও জাতি তাদের প্রতি আস্থাশীল নয়। জাতীয় সন্দেহ প্রবণতাকে কাটাতে তাদের কোন রাজনৈতিক অবস্থান ও কর্মসূচী নেই।

উপজাতীয় দাবীও সংখ্যালগু স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হয়েছে। এখন তারা তাতে স্থির নেই, বিকল্প জুম্ম জাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। তাদের আগ্রহেই উপজাতীয় সুবিধাবাদ গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু এখন তাদের লক্ষ্য জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী পরিচয় গ্রহণ। দেশ ও জাতি থেকে তারা কেবল গ্রহণেই অভ্যস্ত, কিছু দিতে নয়। তারা দেশ ও জতির বিপক্ষে বৈরী শক্তিরূপে প্রতিভাত। এই বৈরী ভাবমূর্তি কাটাবার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। এমনটা ঘটলেই তাদের পক্ষে জাতীয় আস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব। কেবল উত্যক্ত করা, দাবী দাওয়ার বহর বৃদ্ধি, আর নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখা, এই প্রবণতা, জাতীয় আস্থাও সহানুভূতি গড়ে ওঠার অনুকুল নয়। পার্বত্য বাঙ্গালীরা ঐ বাঙ্গালীদেরই অংশ, যারা গোটা দেশ শাসন করছে, এবং সংখ্যায় বাংলাদেশী জতি সত্তার ৯৯%। সুতরাং পার্বত্য বাঙ্গালীদের সাথে সদ্ভাব সৃষ্টি, গোটা জাতিকে প্রভাবিত করারই সূত্র। এই বোধোদয় না ঘটা, উপজাতীয়দের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। বাঙ্গালী প্রেমী সাধারণ

উপজাতীয় লোক অবশ্যই আছেন, এবং এমন উদার মনোভাব সম্পন্ন সাধারণ উপজাতীয় লোকেরও অভাব নেই, যারা পাহাড়ী বাঙ্গালীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু এরা সংখ্যালঘু ও দুর্বল। এরা উপজাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন না। সমাজে এদের অবস্থান নিরীহ।

দেশ ও জাতি অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল অনুকূল উপজাতীয় বোধোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। ধ্বংসাত্মক উপজাতীয় শক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও নির্মুল করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তজ্জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপকে শিথিল বা পরিত্যাগ করা যথার্থ নয়। সেনাশক্তি ও জনশক্তি মোতায়েনের অতীত নীতিকে পরিহারের কোন অবকাশ নেই। ইতোমধ্যে প্রদর্শিত শৈথিল্য ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়নি। নতুবা এতোদিনে উপজাতীয় বিদ্রোহী শক্তি এক ক্ষুদ্র অপশক্তিতে পরিণত হতো, এবং পর্বতাঞ্চলে বাঙ্গালীরাই হয়ে উঠতো সংখ্যা গরিষ্ঠ। এমনটি ঘটান ছাড়া এতদাঞ্চলে বাংলাদেশ নিরাপদ হবে না, আর একমাত্র তখনই উপজাতীয়রা হবে দেশ ও জাতির পক্ষে বাধ্য অনুগত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এমনটি ঘটান অন্যায় নয়। এমন শক্ত মনোভাব জাতীয় রাজনীতিতে থাকা আবশ্যক।

তাই পার্বত্য নীতিতে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও পুনর্বাসন পুনর বিবেচিত হওয়া দরকার। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও পনর্বাসন কাজ অসম্পূর্ণ আছে। তা বাস্তবায়ন না করা ক্ষতিকর। সরকারের এই দায় অপরিত্যজ্য। লক্ষ বাঙ্গালী সরকারী দায়িত্বহীনতার ফলে পর্বতের আনাচে কানাচে ভূমিহীন, আশ্রয়হীন, বেকার। ভূমি দান ও পুনর্বাসনের অঙ্গীকারে তারা সরকারীভাবে এতদাঞ্চলে আনিত। এই অঙ্গীকার পালন করা সরকারের একটি দায়। নিরুপায় হয়ে ভূমি বঞ্চিত বাঙ্গালীদের অনেকেই সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করেছে। কিন্তু ঐ মামলাগুলোর অগ্রগতি নেই। এমনি একটি মামলা হলো রীট নং ৬৩২৯/২০০১, যার শোনানীর দিন ধার্য্য ছিলো ২৫ আগষ্ট ২০০৪। তবে সে শোনানী অনুষ্ঠিত হয় নি। এ ছাড়াও আরো কয়েকটি রীট হয়েছে। এই পথ ধরে একদিন বিষয়টির সুরাহা অবশ্যই হবে, সে আশায় নেংটি পার্বত্য বাঙ্গালীরা আশান্বিত দিন যাপন করছে।

২১. বিদ্রোহী দমনে গৃহীত বাঙ্গালী বসতি স্থাপন সরকারের প্রথম দায়িত্ব

রাষ্ট্র কর্তৃক বাঙ্গালী পুনর্বাসন মানে পার্বত্য চট্টগ্রামকে বাংলাদেশী চরিত্র দান, উন্নয়নের অর্থ পশ্চাদপদতার অবসান ঘটান, সেনা নিয়ন্ত্রণের অর্থ অরাজকতার বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ, আর পার্বত্য চুক্তি হলো বিদ্রোহীদের গৃহবন্দি করার কৌশল। এগুলো রাষ্ট্র প্রবর্তিত কর্মসূচী। উপজাতীয়দের আনুগত্য প্রদর্শন ছাড়া এই কার্যক্রমের কোন ব্যতিক্রম হতে পারে না।

গত ১৬ই জুন ২০০৪ তারিখে গৃহীত সরকারী সিদ্ধান্তটি পার্বত্য বাঙ্গালীদের অবশ্যই বিক্ষুব্ধ করবে। তারা সরকার কর্তৃক পুনর্বাসনের অঙ্গীকারে পার্বত্য চট্টগ্রামে আনিত, এবং নিরাপত্তার প্রয়োজনে গুচ্ছগ্রাম সমূহে পুনর্বাসিত। এই আনয়ন ও বসতি বন্ধকরণ ভুল হয়ে থাকলে, তার খেসারত ঐ বাঙ্গালীদের প্রাপ্য নয়। সরকারই নিজ ভুলের দায়িত্ব নিতে ও খেসারত দিতে বাধ্য। গুচ্ছগ্রাম বাসী ও ভাসমান অন্যান্য পার্বত্য বাঙ্গালীরা, স্বউদ্যোগে পার্বত্য চট্টগ্রামে এসে বসতি গড়েনি। তাদের কিছু সরকারীভাবে প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে, কিছু প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে, এবং বাদবাকিরা বেসরকারী ভাবে পাকিস্তান আমলে, ও শেখ মুজিবের উৎসাহে বাংলাদেশ আমলের শুরুতে, এতদাঞ্চলে আনিত ও পুনর্বাসিত অথবা বসতি স্থাপন করেছে। এরা হলো রাষ্ট্রের সপক্ষীয় জনশক্তি। বিদ্রোহী উপজাতীয়দের বিপক্ষে এই সপক্ষীয় জনশক্তির প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রীয়ভাবে ছিলো কাম্য। ১৯৮৬ সালের দিকে বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর মদদে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাতে উপদ্রুত বাঙ্গালীরা মারমুখী হয়ে ওঠে, এবং দাঙ্গা উপদ্রুত উপজাতীয়রা ও বিপুল সংখ্যায় শরণার্থী রূপে ভারতমুখী হতে শুরু করে। এই বিরূপ পরিস্থিতি শামাল দিতে সরকার বাঙ্গালীদের তাদের বাড়িঘর ও জায়গা জমি থেকে উঠিয়ে এনে সেনা ক্যাম্প সমূহের আশপাশে গুচ্ছগ্রাম গড়ে বসবাস করতে দেন। বাড়িঘর জায়গা জমি ফল ফসল ও রোজি রোজগারচ্যুত এই গুচ্ছগ্রামবাসী বাঙ্গালীরা হয়ে পড়ে সরকারী ত্রাণ নির্ভর। ঐ ২৬ হাজার গুচ্ছগ্রামবাসী বাঙ্গালী পরিবারদের দাবী হলো, তাদের পুরাতন বাড়িঘর ও জায়গা জমি ফেরত লাভ, নতুন ভাবে পুনর্বাসন নয়। সরকারের দ্বারা প্রকৃত অবস্থার মূল্যায়ন হয়নি। তারা বাস্তবে আবাসিত ও পুনর্বাসিত পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী লোক। তাদের স্থানীয় নাগরিকত্ব প্রশ্নাতীত।

পর্বতবাসী পুনর্বাসিত বাঙ্গালীরা বি,এন,পি, ও তার সরকার কর্তৃক বার বার বিভ্রান্ত হচ্ছে। এই বিভ্রান্তি সত্বেও তারা বি,এন,পি'র ভোট ব্যাংক বলে অনুমিত। তবে হালে তাদের ভুল ভাংছে। আওয়ামী লীগকেও তারা উপযুক্ত মূল্য দিতে এখন প্রস্তুত। তারা ভাবছে আওয়ামী লীগ তাদের চির শত্রু নয়। বহু সংখ্যক বাঙ্গালী মরহুম শেখ মুজিবের উৎসাহে এতদাঞ্চলে বসতি গড়েছে। বিদ্রোহের বিরুদ্ধে প্রথম সেনা ছাউনীর প্রতিষ্ঠাতা হলেন শেখ মুজিব নিজে। গত আওয়ামী লীগ সরকার প্রধান শেখ হাসিনা, পার্বত্য চুক্তির বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের হরতাল পালনের দিন ঘোষণা করেছিলেন; একজন বাঙ্গালীকেও পার্বত্য অঞ্চল থেকে বিতাড়ন করা হবে না। তার সরকার কর্তৃক সন্ত্রাস উপদ্রুত উদ্বাস্তু পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের সবাইকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

ঐ তালিকায় গুচ্ছগ্রামবাসী বাঙ্গালীরা অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেণ। ঐ সরকার কর্তৃক সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তিতে সাংবিধানিক ব্যবস্থার পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায়, বাঙ্গালীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হয়েছে। সুতরাং পার্বত্য বাঙ্গালীদের একমাত্র মিত্র সংগঠন বি, এন, পি নয়। আওয়ামী লীগকেও তাদের মিত্রের মর্যাদা দেয়া যায়।

এটা কৃতজ্ঞতার বিষয় যে, প্রেসিডেন্ট জিয়া ও এরশাদ বাঙ্গালীদের সরকারীভাবে পার্বত্য অঞ্চলে পুনর্বাসিত করেছেন। তবে এটাও প্রশংসনীয় কাজ নয় যে, বি, এন, পি সরকার জায়গা জমি বন্দোবস্তি ও হস্তান্তর বন্ধ করে দিয়েছেন, পার্বত্য চুক্তির আপত্তিজনক দফাগুলো বাস্তবায়ন করছেন, গুচ্ছগ্রামবাসী বাঙ্গালীদের সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকারদানে সক্রিয় নন, এবং বিদ্রোহী উপজাতীয় পক্ষের তোষামোদে লিপ্ত। এই পরিস্থিতিতে পার্বত্য বাঙ্গালীরা নতুন মিত্র খুঁজতে বাধ্য।

বাংলাদেশ রাষ্ট্র বাঙ্গালী সংখ্যা গরিষ্ঠতার ফসল। পার্বত্য চট্টগ্রাম তারই ভৌগোলিক অঞ্চল। পার্বত্য চট্টগ্রামের অমুসলিম প্রধান অঞ্চল হওয়া মৌলিক নয়, কৃত্রিম। এ কারণেই ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগকালে এটি ভারতের প্রাপ্য বা স্বতন্ত্র অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি লাভ করেনি।

দেশ বিভাগকালে সীমান্তবর্তী অঞ্চল সমূহের ভাগ্যে অনেক ওলট পালট হয়েছে। পূর্ব পাঞ্জাবের অধীন গুরুদাসপুর জেলা সীমান্তবর্তী মুসলিম প্রধান অঞ্চল রূপে পাকিস্তানের প্রাপ্য ছিলো। কিন্তু কাশ্মীরের সাথে ভারতের ভূমি সংযোগ ও তার পাকিস্তান বা ভারতের সাথে যোগদানের সুযোগ বজায় রাখার প্রয়োজনে গুরুদাসপুরকে ভারতভুক্ত করে দেয়া হয়। ঠিক একই কারণে আসাম ও ত্রিপুরার সাথে ভারতের ভূমি সংযোগ রক্ষার প্রয়োজনে, পশ্চিম দিনাজপুর ও করিমগঞ্জ অঞ্চলকে ভারতের সাথে জুড়ে দেয়া হয়। এই দুই সংযোগ ঘটান না হলে কাশ্মীম হতো পাকিস্তানের বাধ্য অঞ্চল, এবং আসাম ও ত্রিপুরা হতো বাংলাদেশের দ্বারা বিচ্ছিন্ন বাধ্য এলাকা। পার্বত্য চট্টগ্রামের পক্ষে অনুরূপ ভূমি সংযোগ ঘটানোর কোনরূপ ভৌগোলিক ও জাতিগত আনুকুল্য ছিলো না। এর উত্তরে অবস্থিত ত্রিপুরা ও পূর্বে অবস্থিত মিজোরামের সীমান্ত দুর্গম পর্বতসংকুল। এ পথে আসামের সাথে সংযোগ সাধন দুরুহ। জাতিগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী উপজাতীয়রা হলো স্বতন্ত্র লোক। স্থল যোগাযোগের দুরুহতা ও বিজাতীয়তা হেতু, এতদাঞ্চলের ভারতভুক্তি বিচ্ছিন্নতারই সহায়ক হবে বলে বিবেচিত হয়। সুতরাং চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে রক্ষার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামকে সঠিক ভাবেই বাংলাদেশ ভুক্ত রাখা হয়, যার কোন বিকল্প ছিলো না। ভৌগোলিক ভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম, মূল চট্টগ্রামেরই অংশ এবং লোক হিসেবে স্থানীয় উপজাতীয়রা জেলা ভাগের সুযোগে আকস্মিক ভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠ মাত্র। তারা আদি চট্টগ্রামী মূলের লোক নয়। অভিবাসনের মাধ্যমে তারা হালে স্থানীয় অধিবাসী রূপে স্বীকৃত। মাত্র শত বছর আগে জারিকৃত পার্বত্য অঞ্চল শাসন আইন ধারা নং ৫২ তথা পর্বতে অভিবাসন নামক আইন বলে তারা স্থানীয় অধিবাসী। তারা চট্টগ্রামী মৌলিকত্বসম্পন্ন স্থানীয় আদি ও স্থায়ী অধিবাসীর মর্যাদা সম্পন্ন লোক নয়। এই বিচারে তাদের অগ্রাধিকার বিশেষাধিকার স্বায়ত্ত্বশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের দাবী অযৌক্তিক। তদুপরি এই প্রশ্নে তাদের সশস্ত্র বিদ্রোহ সংঘটন, একটি অমার্জনীয় রাজনৈতিক বাড়াবাড়ি। সুতরাং তাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খাকে ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী বিবেচিত হয়। এই

ব্যবস্থারই অংশ হলো এতদাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করণ ও রাষ্ট্রের স্বপক্ষ জনশক্তি বাঙ্গালীদের সংখ্যাগত প্রাধান্য রচনা। বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকে তাই অবাঙ্গালী বিদ্রোহের বিকল্প ভাবাই সঙ্গত। এতে কারো বিরোধিতা ও আপত্তি উত্থাপন যৌক্তিক নয়। স্থানীয়ভাবে সেনা বাহিনীর অবস্থান প্রতিরক্ষামূলক। স্বাভাবিক দৈনন্দিন জীবন যাপন তাদের হস্তক্ষেপের বিষয়বস্তু নয়। তাদের হস্তক্ষেপকে ঠেকাতে, সশস্ত্র উপজাতীয় বিদ্রোহের বিপক্ষে শান্তি স্থাপক সপক্ষীয় জনশক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন. বাঙ্গালী বসতি সেই প্রয়োজনেরই সম্পূরক। এটা উপজাতীয় বৈরীতা নয়। সেনা বাহিনীর দায়িত্বপালন সংক্রান্ত কঠোরতা তাতে হালকা হয়েছে। উপজাতীয় বিদ্রোহ দমাতে সেনা বাহিনীর পাশাপাশি বেসামরিক বাঙ্গালী জনশক্তি মোতায়েন নমনীয় ব্যবস্থা। যখন বাঙ্গালী বসতি স্থাপনের সূচনা হয়নি, বাংলাদেশের সেই শিশুকালে, উপজাতীয় বিদ্রোহ মাথাচাড়া দিয়েছে। তখন দেশের অখন্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে এতদাঞ্চলে সেনা মোতায়েন ছাড়া উপায় ছিলো না। তৎপর বিদ্রোহী পক্ষের সাথে আপোষ রফামূলক আলোচনা ও বৈঠক হলেও তা ফলপ্রসু হয়নি। তাই সরকারী পর্যায়েই সিদ্ধান্ত হয় যে, সেনাবাহিনী কেবল সশস্ত্র দুষ্কর্মই ঠেকাবে এবং বিদ্রোহী জনশক্তির মোকাবেলায় স্বপক্ষ বাঙ্গালী জনশক্তিকে সংখ্যা ও সামর্থে জোরদার করে তুলতে হবে। সুতরাং উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফল সেনা মোতায়েন ও বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। এই দুই শক্তির বিরুদ্ধে উপজাতীয় পক্ষের আপত্তিও আন্দোলন এই প্রেক্ষাপটে যৌক্তিক নয়। এখনো উপজাতীয় পক্ষ উগ্রতা হিংসা অস্ত্রবাজি, চাঁদাবাজি আর অরাজকতা ত্যাগ করে স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ধারায় ফিরে এলে সেনাবাহিনীর পক্ষে স্বীয় ক্যাম্পে ফিরে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং বাঙ্গালী জনস্রোত ও থেমে যাবে। বাঙ্গালী পাহাড়ী শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমঅধিকার নীতি প্রতিষ্ঠিত হলে, এতদাঞ্চলে শান্তি ও উন্নয়নের ধারা অবশ্যই জোরদার হবে। কেবল উপজাতিপক্ষীয় সুযোগ সুবিধা আর বিপক্ষ বৈরীতা, পার্বত্য অঞ্চলকে সংঘাতমুখর ও বিক্ষুব্ধ করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা মুহুর্তে সব উপজাতীয় বৈরীতা ভুলে যেতে প্রস্তুত, যদি উপজাতীয় পক্ষ সকলের সমঅধিকার ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিকে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করে। সুতরাং পার্বত্য রাজনীতি খেলার ট্রাম কার্ড তাদের হাতেই নিহিত। অযথা সেনাবাহিনী আর বাঙ্গালী পক্ষকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

অরাজক ও বিক্ষুব্ধ পার্বত্য অঞ্চল থেকে সেনা বাহিনী প্রত্যাহৃত হলে, এতদাঞ্চলের শান্তি-শৃঙ্খলা আর অখন্ডতা রক্ষার দায়িত্ব কে পালন করবে? উপজাতীয় কোন সংগঠন সে দায়িত্ব পালনের উপযোগী আস্থা এখনো অর্জন করতে পারেনি। তারা নিজেরাও ঐক্যবদ্ধ নয়। বরং পরস্পর সংঘাত ও বৈরীতায় লিপ্ত। এটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যের ধারক নয়। উপজাতীয়রা পরস্পর রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত ও সংঘাতে লিপ্ত। তারা গঠনমূলক রাজনীতির কোন উদাহরণ স্থাপন করতে পারেনি। দেশ ও জাতি তাদের প্রতি আস্থাশীল নয়। জাতীয় সন্দেহ প্রবণতাকে কাটাতে তাদের কোন রাজনৈতিক অবস্থান ও কর্মসূচী নেই।

উপজাতীয় দাবী ও সংখ্যালঘু স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতেই বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ গৃহীত হয়েছে। এখন তারা তাতে স্থির নেই, বিকল্প জুম্ম জাতীয়তাবাদেরই প্রবক্তা। তাদের আগ্রহেই উপজাতীয় সুবিধাবাদ গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু এখন তাদের লক্ষ্য জাতিসংঘ ঘোষিত আদিবাসী পরিচয় গ্রহণ। দেশ ও জাতি থেকে তারা

কেবল গ্রহণেই অভ্যস্ত, কিছু দিতে নয়। তারা দেশ ও জতির বিপক্ষে বৈরী শক্তিরূপে প্রতিভাত। এই বৈরী ভাবমূর্তি কাটাবার দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই। এমনটা ঘটলেই তাদের পক্ষে জাতীয় আস্থা গড়ে ওঠা সম্ভব। কেবল উত্যক্ত করা, দাবী দাওয়ার বহর বৃদ্ধি, আর নিজেদের স্বার্থকেই বড় করে দেখা, এই প্রবণতা, জাতীয় আস্থাও সহানুভূতি গড়ে ওঠার অনুকুল নয়। পার্বত্য বাঙ্গালীরা ঐ বাঙ্গালীদেরই অংশ, যারা গোটা দেশ শাসন করছে, এবং সংখ্যায় বাংলাদেশী জাতি সত্তার ৯৯%। সুতরাং পার্বত্য বাঙ্গালীদের সাথে সদ্ভাব সৃষ্টি, গোটা জাতিকে প্রভাবিত করারই সূত্র। এই বোধোদয় না ঘটা, উপজাতীয়দের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। বাঙ্গালী প্রেমী সাধারণ উপজাতীয় লোক অবশ্যই আছেন, এবং এমন উদার মনোভাব সম্পন্ন সাধারণ উপজাতীয় লোকেরও অভাব নেই, যারা পাহাড়ী বাঙ্গালীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সম্প্রীতিকে গুরুত্ব দেন। কিন্তু এরা সংখ্যালঘু ও দুর্বল। এরা উপজাতীয় রাজনীতি নিয়ন্ত্রণ করেন না। সমাজে এদের অবস্থান নিরীহ।

দেশ ও জাতি অনির্দিষ্ট দীর্ঘকাল অনুকূল উপজাতীয় বোধোদয়ের জন্য অপেক্ষা করতে পারে না। ধ্বংসাত্মক উপজাতীয় শক্তিকে নিষ্ক্রিয় ও নির্মুল করা রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। তজ্জন্য গৃহীত রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপকে শিথিল বা পরিত্যাগ করা যথার্থ নয়। সেনাশক্তি ও জনশক্তি মোতায়েনের অতীত নীতিকে পরিহারের কোন অবকাশ নেই। ইতিমধ্যে প্রদর্শিত শৈথিল্য ফলপ্রসু প্রমাণিত হয়নি। নতুবা এতোদিনে উপজাতীয় বিদ্রোহী শক্তি এক ক্ষুদ্র অপশক্তিতে পরিণত হতো, পর্বতাঞ্চলে বাঙ্গালীরাই হয়ে উঠতো সংখ্যা গরিষ্ঠ, এবং এমনটি ঘটান ছাড়া এতদাঞ্চলে বাংলাদেশ নিরাপদ হবে না, আর একমাত্র তখনই উপজাতীয়রা হবে দেশ ও জাতির পক্ষে বাধ্য অনুগত। রাষ্ট্রের নিরাপত্তার প্রয়োজনে এমনটি ঘটান অন্যায় নয়। এমন শক্ত মনোভাব জাতীয় রাজনীতিতে থাকা আবশ্যক।

পার্বত্য নীতিতে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও পুনর্বাসন পুনর বিবেচিত হওয়া দরকার। বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ও পনর্বাসন কাজ অসম্পূর্ণ আছে। তা বাস্তবায়ন না করা ভুলও ক্ষতিকর। সরকারের এই দায় অপরিত্যজ্য। লক্ষ বাঙ্গালী সরকারী দায়িত্বহীনতার ফলে পর্বতের আনাচে কানাচে ভূমিহীন, আশ্রয়হীন ও বেকার। ভূমি দান ও পুনর্বাসনের অঙ্গীকারে তারা সরকারীভাবে এতদাঞ্চলে আনিত। এই অঙ্গীকার পালন করা সরকারের একটি দায়। নিরুপায় হয়ে ভূমি বঞ্চিত বাঙ্গালীদের অনেকেই সর্বোচ্চ আদালতে মামলা করেছে। কিন্তু ঐ মামলাগুলোর অগ্রগতি নেই। এমনি একটি মামলা হলো রীট নং ৬৩২৯/২০০১, যার শোনানীর দিন ধার্য্য ছিলো ২৫ আগষ্ট ২০০৪। তবে শোনানী হয়নি। এ ছাড়া আরো কিছু মামলা বিচারাধীন আছে। তাতে নেংটি পার্বত্য বাঙ্গালীরা আশান্বিত দিন যাপন করছে। একদিন তারা সুবিচার পাবে।
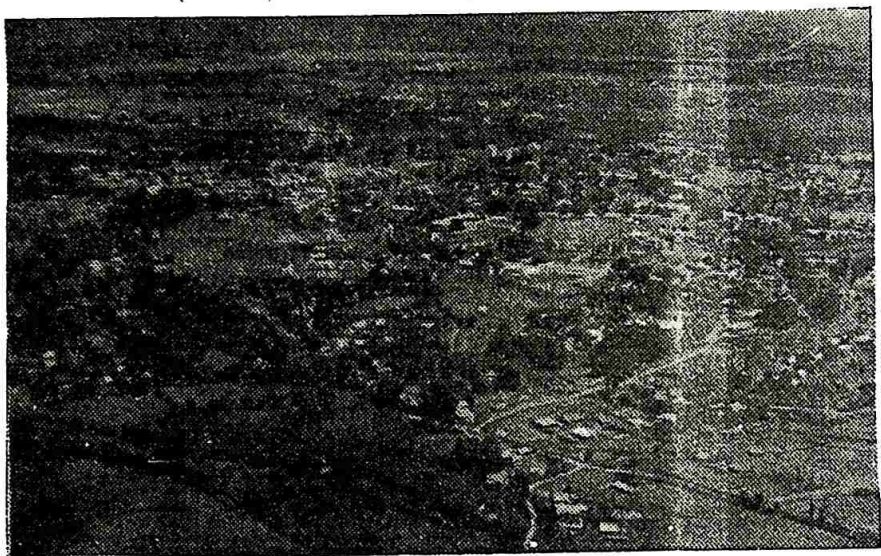
খাগড়াছড়ি শহর
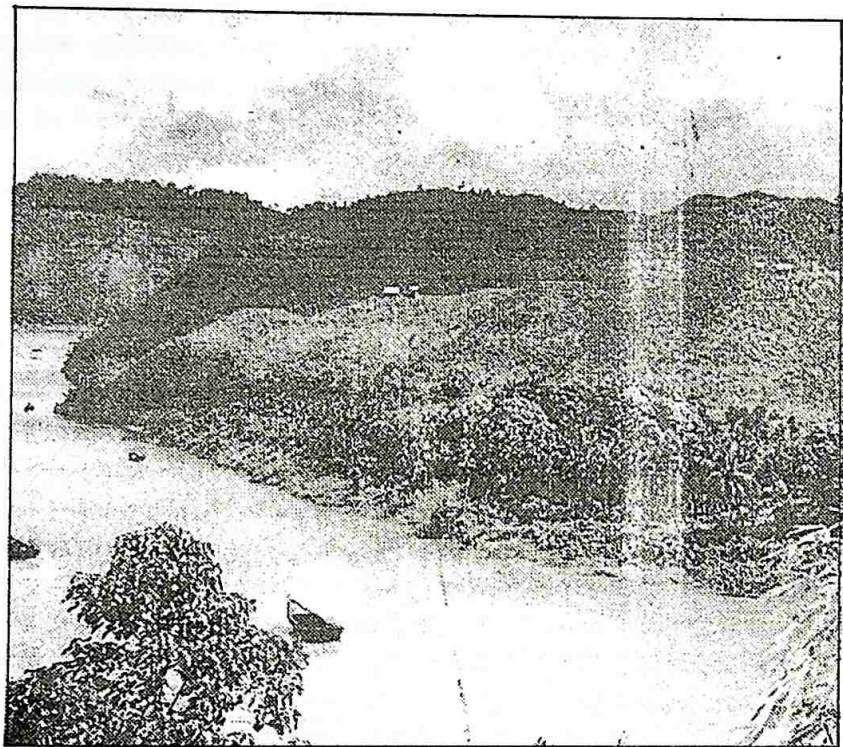
প্রাকৃতিক দৃশ্য

২২ পার্বত্য জন সংহতি সমিতির পাঁচ দফা দাবী নামায় স্বায়ত্তশাসন ও বিচ্ছিন্নতা

এটাই ব্যাপক ধারণা যে, পার্বত্য উপজাতিদের পক্ষে জন সংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তি বাহিনী বাড়াবাড়ি করলেও তারা জুলুম অত্যাচারের বিরুদ্ধে ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ছে। তাদের এই অধিকারের লড়াই, দেশের অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্ব বিরোধী হলেও তা সরলভাবে মান্য নয়। দেশের অধিকাংশ বামপন্থী পন্ডিত ও কিছু মানব দরদী সরলপ্রাণ বুদ্ধিজীবি, এ ধারণাটির পরিপোষক। এরা যুক্তি ও দরদের মোড়কে, এ ধারণাটির পক্ষে কথা বলেন। কিন্তু দেশে বিদেশে এমন লোকেরও অভাব নেই, যাদের লক্ষ্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিপক্ষে মদদ দান। আমার এ প্রবন্ধটির লক্ষ্য ঃ মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে সুধী ও দেশ প্রেমিকদের ঐ গূঢ় রহস্যটি ওয়াকিবহাল করান যাদ্বারা পরিস্কার হয়ে যাবে যে আসলে পাঁচ দফা দাবী নামায় কী ব্যক্ত করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত পাঁচ দফা দাবী নামার চুল চেরা মূল্যায়ন হয়নি। ব্যাপক আলোচনা ছাড়া এর ঘের টোপ উম্মোচিত হবে না। জাতীয় সংকট ও স্বার্থের সাথে জড়িত এ বিষয়টি ব্যাপক আলোচনার অবকাশ রাখে। অবহেলার কারণে দিনে দিনে এটি জটিল হচ্ছে। উভয় পাক্ষিক বৈঠকের আগে বিষয়টির উপর পাঠ ও অভিজ্ঞতা নেওয়া দরকার। আরো দুঃখজনক বিষয় হলো, দীর্ঘদিন যাবৎ পার্বত্য সংকটটি প্রলম্বিত থাকলেও এখন পর্যন্ত এতদাঞ্চল ও অবাঙ্গালী স্থানীয় বাসিন্দাদের সর্বাধুনিক ও নির্ভরযোগ্য কোন পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস সংকলিত বা রচিত হয়নি। কোন কর্তৃপক্ষই তার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নি। হাঁ ইতিমধ্যে কিছু পুঁথি ও কিংবদন্তি পুস্তক রচিত, সংকলিত ও মুদ্রিত হয়েছে এবং সে সবের উপজাতীয় লেখক গণ অনুদানও পেয়েছেন। তবে ঐ সব লেখালেখিতে বিভ্রান্তি বেড়েছে, প্রকৃত তথ্যের বিশেষ যোগান মেলেনি। এতদাঞ্চল ও তার অধিবাসীদের পরিচয় জানার জন্য দরকার ছিলো তথ্য ভান্ডার গড়ার ও গবেষণার দ্বারা ঐ ভান্ডারটিকে ইতিহাসে রূপ দানের। প্রয়োজন কালে না হলে, এ আর কখন হবে? এটা দুর্ভাগ্যজনক যে অন্ধের হাতি দেখার মত পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে বিচার হচ্ছে।

উপজাতীয় বিদ্রোহী পক্ষের আলোড়ন সৃষ্টিকারী দাবীগুলো নিয়ে ভাবতে গেলে প্রথমেই এসে যায়, উপজাতীয় ক্ষমতায়নের কথা। প্রথমে এটি ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে দৃঢ়। দীর্ঘ বিশ বছরের রক্ত ক্ষরণের পর ১৯৯২ সালে এটি আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে সংশোধিত হয়েছে। কিন্তু প্রথম দাবীটি আগেও সাংবিধানিকভাবে আইন সম্মত ছিলো না, সংশোধনের পর এখনো তা সংবিধান সম্মত হয় নি। রাষ্ট্রের এক কেন্দ্রিক কাঠামো তাতে ক্ষুন্ন হয়, এটাই সাংবিধানিক বাধা। এই বাধার পরিপ্রেক্ষিতে জনসংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ তজ্জন্য সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কিন্তু এখানেও পরিস্থিতি বিরূপ। সংবিধান সংশোধনে দুই তৃতীয়াংশ সংসদ সদস্যের সমর্থন প্রয়োজনীয়। এটা মৌলিক সংশোধনী বলেও গণভোটে জাতি কর্তৃক তা গৃহীত হতে হবে। কোন সরকারেরই এটি একক কর্তৃত্বের ব্যাপার নয়। সুতরাং সংশোধনের বিষয়টি সহজ গ্রাহ্য নয়। এই যৌক্তিক পরিবেশে জনসংহতি সমিতির অবস্থান কী

হবে তা অজ্ঞাত। তবে এতে যে তারা ছাড় দিবেন ও শৈথিল্য দেখাবেন, এমন উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ইতিপূর্বে তাদের কাছে পাওয়া যায়নি। অবশ্য বাংলাদেশের পক্ষে অনুরূপ যুক্তি উপস্থাপন করে, তাদেরকে ভাবিয়ে তুলা হয়েছে বলেও কোন খবর নেই। আমাদের জানা মতে, বিদ্রোহী পক্ষের সাথে সরকারি পক্ষের অনেক আলোচনা হলেও, যৌক্তিক ও তথ্যভিত্তিক মত বিনিময়ও বিতর্ক খুব কমই হয়েছে, অথবা মোটেও হয়নি। আলোচনার অনুরূপ দৈন্যাবস্থা, সুফল দায়ক হতে পারে না। সমস্যার সমাধান তাই তো সুদুর পরাহত আছে।

মূল প্রধান দাবী হলো, যথাঃ- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন করিয়া ..... আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা (দাবী-১)। এই আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে যদি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েও যায়, এবং সরকারও বিরোধী দল সমূহ শান্তিস্থাপনের লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণও করেন, তবু সংবিধান সংশোধন সহজ সাধ্য নয়। জনসংহতি সমিতির অভিহিত সংশোধন, গোটা সংবিধানকেই প্রভাবিত ও গ্রাস করবে। মনে করা হয় রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংক্রান্ত সাংবিধানিক অনুচ্ছেদ নং ১ ই মাত্র সংশোধন করা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশ নামীয় রাষ্ট্রটিকে এককেন্দ্রিক বা ইউনিটারী ঘোষণা করেছে। অথচ জনসংহতি সমিতির দাবী নং ১ হলো প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনমূলক যার চরিত্র ফেডারেল বা যুক্তরাষ্ট্রীয়। এই বিপরীত দুই ধারার রাষ্ট্র কাঠামোতে সঙ্গতি বা সমঝোতা স্বাধন ও দুস্কর। সাংবিধানিক ও রাষ্ট্র বিজ্ঞান ভিত্তিক, সম্ভাব্যতা যাচাই, অথবা সুপ্রীম কোর্টে এর বৈধতা পরীক্ষা কালেও এই সমঝোতার পক্ষে পার পাওয়া কঠিন হবে। বিষয়টি আরো জটিল হবে যখন দেখা যাবে যে, দাবীর অন্যান্য অংশগুলোতে ও সংবিধান সংশোধনের প্রয়োজন। শেষ মেষ এই সংশোধনের ধারা, সংবিধান পরিবর্তনেই পর্য্যবসিত হয়। তাতে নিরুপায়ভাবে সবাইকে হতভম্ব আর অক্ষম হয়ে যেতে হবে। অনুরূপ বেকায়দায় পড়ার সম্ভাবন্যকে আগে ভাগেই আঁচ করা উচিত।

আমার কথাগুলোকে আগাম হতাশা ও ফেকড়া আরোপের অভিযোগে অভিযুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু সুধী মহলের ভাববার বিষয় হলো ঃ রাষ্ট্রের গণপ্রজাতন্ত্রী সাংবিধানিক চরিত্র: কোন রূপ গোষ্ঠীতন্ত্রকে সমর্থন করে না। জনসংহতি সমিতির দাবী হলো ঃ পার্বত্য চট্টগ্রামেও অখন্ড অঞ্চল ভিত্তিক উপজাতীয় স্বায়ত্তশাসন, এবং বাংলাদেশের সাথে শিথিল সম্পর্ক যে বিষয়টি সরাসরি নয় তির্যক ভাবে উপস্থাপিত হয়েছে যথা ঃ

দাবী নং (১/খ) ঃ-

আঞ্চলিক পরিষদ সম্বলিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পার্বত্য চট্টগ্রামকে প্রদান করা।

দাবী নং ২(১/খ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রামের নাম পরিবর্তন করিয়া ..... জুম্মল্যান্ড নামে পরিচিতি করা।

দাবী নং ২(খ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রাম/একটি বিশেষ শাসন বিধি অনুযায়ী শাসিত হইবে। সংবিধানের এই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(গ) ঃ-

বাংলাদেশের অন্যান্য অঞ্চল হইতে আসিয়া যেন কেহ বসতি স্থাপন, জমি ক্রয় ও বন্দোবস্ত করিতে না পারে, সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ঘ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রামের স্থায়ী বাসিন্দা নন, এই রকম কোন ব্যক্তি পরিষদের অনুমতি ব্যতিরেকে যাহাতে পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রবেশ করিতে না পারে, সেই রকম আইন বিধি প্রণয়ন করা। .....

দাবী নং ২(ঙ-১) ঃ-

গণভোটের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মতামত যাচাই ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া কোন শাসনতান্ত্রিক সংশোধন যেন না করা হয়, সংবিধানে সেই রকম সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ঙ-২) ঃ-

আঞ্চলিক পরিষদ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিরেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিষয় লইয়া যাহাতে কোন আইন অথবা বিধি প্রণীত না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ছ) ঃ-

..... পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের পরামর্শ ও সম্মতি ব্যতিত পার্বত্য চট্টগ্রামে যেন জরুরী অবস্থা ঘোষণা করা না হয় সংবিধানে সেই রকম শাসনতান্ত্রিক সংবিধি ব্যবস্থা প্রণয়ন করা।

দাবী নং ২(ঘ) ঃ-

পার্বত্য চট্টগ্রামস্থ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ আসন সমূহ জুম্ম জনগণের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার বিধান করা।

দাবী নং ২(৫-গ) ঃ-

পরিষদের নিয়ন্ত্রণ ও আওতাধীন কোন প্রকারের জমি ও পাহাড় পরিষদের সম্মতি ব্যতিরেকে সরকার কর্তৃক অধিগ্রহণ ও হস্তান্তর না করিবার প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দাবী নং ৩(১) ঃ-

১৭ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল হইতে যাহারা বেআইনীভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে অনুপ্রবেশ করিয়া পাহাড় কিংবা জমি ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল করিয়া, অথবা কোন প্রকারের জমি বা পাহাড় ক্রয় বন্দোবস্ত ও বেদখল ছাড়াই বিভিন্ন স্থানে ও গুচ্ছ গামে বসবাস করিতেছে, সেই সকল বহিরাগতদেরকে পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে অন্যত্র সরাইয়া লওয়া।

দাবী নং ৩(৪-ক) ঃ-

সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প ব্যতীত সামরিক ও আধা সামরিক বাহিনীর সকল ক্যাম্প ও সেনা নিবাস, পার্বত্য চট্টগ্রাম হইতে তুলিয়া লওয়া। (সূত্র সংশোধিত দাবী নামা)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতির মাধ্যমে সুধী পাঠক মহলের ধৈর্য্যচুক্তি হলেও এটা তাদের পক্ষে অনুধাবন আর কঠিন নয় যে, সংবিধান বজায় রেখে এবং বাংলাদেশের কর্তৃত্ব বাঁচিয়ে, এই দাবী দাওয়া পূরণ সম্ভব নয়। এটা হলো স্বায়ত্তশাসনের নামে আঞ্চলিক স্বশাসনের ক্ষমতা লাভের প্রচেষ্টা, যার অবস্থান স্বাধীনতা ও বিচ্ছিন্নতার কাছাকাছি। এমনিতে স্বায়ত্তশাসন হলো স্বাধীনতার পূর্ব অবস্থান। এলাকাটিও দুর্গম ও উপজাতি প্রাধান্য ময় সীমান্ত। এই প্রতিকূল পরিবেশ আখন্ডতার রক্ষা করা হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রাম, বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা ও জাতীয় সার্বভৌমত্বের

পক্ষে এক নাজুক পরীক্ষা ক্ষেত্র। শুধু উজাতীয় অসন্তোষ দূরিকরণই ভাবনার বিষয় নয়, এবং এ বলাও সঠিক নয় যে, কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা আদায়ই উপজাতীয় সংগ্রামীদের লক্ষ্য। এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, উপজাতীয় অস্ত্রধারিরা বিদ্রোহী। তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য বাঙ্গালী উচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্নতা। ইতোমধ্যে উপজাতীয় লাঞ্ছনা বঞ্চনার বিপক্ষে বহু প্রতিকার হয়েছে। উন্নতি আর অগ্রগতির পরিমাণও যথেষ্ট। এখন বিদ্রোহ অসন্তোষ অব্যাহত থাকার কার্যকারণ নেই। সন্তোষও কৃতজ্ঞতারই প্রকাশ ঘটা উচিত। দেশ রক্ষার কার্যক্রম প্রকৃত পক্ষে বিদ্রোহকে পাহারা দান বা জিইয়ে রাখা নয়, দমন করা এবংতা দ্রুতই হতে হবে। তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে আলাপ আলোচনার মধ্যমে নিষ্পত্তিকরাই সর্বোত্তম। সরকারী পক্ষে একমাত্র ক্ষমা ও স্থানীয় শাসনই নমনীয়তার বিষয়। অপর পক্ষে শর্তহীন অস্ত্র ত্যাগই হতে হবে সমঝোতার শেষ কথা। এই চূড়ান্ত প্রস্তাবে রাজি না হলে, আর কোন শৈথিল্য নয়। বিদ্রোহীদের দমনও নির্মুলে বাঙ্গালী পুনর্বাসনই মোক্ষম ব্যবস্থা। চিরকালের জন্য বিদ্রোহী পক্ষকে সংখ্যা লঘুতে পরিণত করার মাঝেই, উপজাতীয় বিদ্রোহ আর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ দমনের স্থায়ী ব্যবস্থা নিহিত। এই পথেই সমাধান। সেনা বাহিনীকে শুধু নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।

ঘরে বাইরে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী সন্দেহবাদী লোকেরা সংখ্যায় প্রচুর। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী পক্ষের ক্ষয়ক্ষতিতে ওরা কখনো বিদ্রোহী পক্ষের নিন্দাবাদে সোচ্চার হোন না। ওদেরকে হামেশা বিপক্ষীয় যুক্তি খাটাতেই দেখা যায়। ওরা মাসোহারা ভোগী এজেন্টের মতই ভূমিকা পালন করে থাকেন। কিছু বামপন্থী দেশীয় পত্রপত্রিকা ও তাদের স্তাবক। কল্পনা চাকমার আজগোবি অপহরণ ও তার জীবন কাহিনী জাতীয় উড়ো কথাই তাদের প্রধান উপজীব্য। দিনকে দিন ইনিয়ে বিনিয়ে তাই প্রচার করতেই তারা অধিক উৎসাহী। না পারতে, দায় সারা গোছের হাল্কা ভাষ্যের বাঙ্গালী হত্যা ও অপহরণের কিছু ঘটনা তাদের প্রচার মাধ্যমে আসে। দেশ ও জাতির সমর্থনে তাদের যুক্তিও আলোচনা কমই পরিচালিত হয়। এ জাতীয় যুক্তি ও আলোচনাকে তারা কমই আমল দেন। এদের মদদেও বিদ্রোহী পক্ষ শক্তি পাচ্ছে।

এতদাঞ্চলের জুম্মল্যান্ড নাম, এর উপজাতীয় অধিবাসীদের জুম্মজাতি পরিচয়, বাঙ্গালী ও সেনা বাহিনী প্রত্যাহার দাবী এবং বাংলাদেশের সাথে লোক চলাচল ও বসবাসে নিয়ন্ত্রণমূলক আইন প্রবর্তনসহ পৃথক প্রশাসনিক আইনের সংস্থান দাবীর লক্ষ্য, বাংলাদেশের নিজের দ্বারা স্বেচ্ছায় অঙ্গচ্ছেদ ঘটানও স্বতন্ত্র জুম্মাল্যান্ড প্রতিষ্ঠা। দাবীতেএতদাঞ্চলে কোন আনুষ্ঠানিক কেন্দ্রীয় প্রশাসক থাকার প্রস্তাবও নেই। সর্বেসর্বা নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হবেন আঞ্চলিক পরিষদ প্রধান। এই ক্ষমতা ও স্বাতন্ত্র্যকে বেনামী বিচ্ছিন্নতা অবশ্যই বলা যায়। স্বাধীনতার পক্ষে শুধু একটি ঘোষণাই বাকি থাকে যে, বাংলাদেশের সাথে জুম্মল্যান্ডের আর কোন সম্পর্ক থাকলো না। মুক্ত পরিবেশে, উগ্র জঙ্গীবাদী পক্ষ, কোন চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদী উদ্যোগ নিবে না, এমন নিশ্চয়তা কারো পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। খোদ সরকারই উপজাতিদের ক্ষমতা কুক্ষিগত করার পথে এগিয়ে যেতে, স্থানীয় সরকার পরিষদ আইনে, চেয়ারম্যান পদ একক উপজাতীয় কোটাভুক্ত করে উদাহরণ স্থাপন করে দিয়েছেন। যদিও এ দাবী কখনো সরাসরি উত্থাপিত হয়নি এবং সরকার ও কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি আকারে তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসকের কোন আনুষ্ঠানিক প্রাধান্যের ব্যবস্থা রাখেন নি। দূরবর্তী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। জেলা

প্রশাসক গণ খন্ডিত কর্তৃত্বেরই অধিকারী ও আমলা। রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তাদের দায়িত্ব ভুক্ত বিষয় নয়। সুতরাং এবলা বেঠিক হবেনা যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত সরকারী নীতি নির্ধারণে তথ্য, তত্ব ও বুদ্ধি কৌশল কমই খাটান হয়েছে।

দাবী দাওয়ার গ্রহণ যোগ্যতা বাড়াবার কৌশল হিসাবে জনসংহতি সমিতি ঘোষণা করেছে যে, তারা সংবিধান গণতন্ত্র ও দেশের অখন্ডতাকে মান্য করে। যথা ঃ এই আন্দোলন কোন রকমের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়। তাই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের আওতাধীনে জনসংহতি সমিতি তথা জুম্ম জনগণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক ভাবে বৈঠকের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রাম সমস্যার সমাধান পেতে যে অত্যন্ত আগ্রহী তা বলাই বাহুল্য। স্বীয় জাতীয় সংহতি, জাতীয় পরিচিতি, জন্মভূমি ও ভিটামাটির অস্তিত্ব সংরক্ষণ করে, জুম্ম জনগণ বাংলাদেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির মহান কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে চায়। চায় অতি দ্রুত গতিতে সকল প্রকারের পশ্চাদপদতার অবসান করে, সমগ্র দেশের গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার মহান আন্দোলনে সর্বাত্মকভাবে সামিল হতে। (সূত্রঃ জরুরী বিবৃতি তাং ২১/১২/৯১ইং)

এই ইতিবাচক বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, জনসংহতি সমিতি তৎপ্রতি যথেষ্ট আন্তরিকতার পরিচয় দেয়নি। তাদের সশস্ত্র সন্ত্রাসী সংগঠন ও তার অপতৎপরতা, অস্ত্র বিরতির ঘোষণা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় হয় নি। শান্তি স্থাপনের পক্ষে অস্ত্র ত্যাগই হতো যথার্থ। দেশ ও জাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রবাজি বজায় রেখে এবং স্বদেশবাসী বাঙ্গালীদের মৌলিক অধিকার মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক অধিকার এবং সর্বোপরি দেশের প্রতিরক্ষার অধিকার অস্বীকার করে তাদের এবলা প্রহসন যে, জনসংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনী দেশের সংবিধান গণতন্ত্র ও অখন্ডতার অনুসারী। তাই আলোচনার শুরুতে, এই বিবৃতিরই সূত্র ধরে জনসংহতি সমিতিকে, অস্ত্র ত্যাগ, উগ্রতা পরিহার ও অতীত বাড়াবাড়ির জন্য, জাতির কাছে ক্ষমা প্রার্থনার আহ্বান জানান উচিত। তৎপর জাতীয় ক্ষমা সহানুভূতিও সুযোগ সুবিধা বিবেচ্য হবে। অস্ত্র উচিয়ে রেখে মিঠা কথা অর্থহীন। হয় অস্ত্রত্যাগ, নয়তো বাঙ্গালী আবাসন, এটাই অনমনীয়তার বিপরীতে হতে হবে শেষ কথা।

২৬। নিষ্ফল তোষণ ও বিপজ্জনক ক্ষমতায়ন

(তাং-বুধবার ৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ১৯ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

ঔপনিবেশিক বৃটিশ নীতির লক্ষ্য ছিলোঃ আদিম অনুন্নত সংখ্যালঘুদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষা দান ও তাদের মাঝে একদল অনুগৃহীত বশংবদ সৃষ্টি, যারা শাসন শোষণ ও সাম্রাজ্য বিস্তারে হবে সহযোগী। ভারত দখলের পর তারা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হয়, যার প্রথম দেশটি হলো, বার্মা। সীমান্ত বিরোধ ও দেশান্তরী শরণার্থী সমস্যাই বৃটিশ ভারতের পক্ষে বার্মার উপর হস্তক্ষেপ করার অজুহাত সৃষ্টির সহায়ক হয়। এবং সে কাজে সহায়ক শক্তিরূপে গন্য হয়, বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক বিতাড়িত আরাকানীরা। যারা রাজ্যহারা উদ্বাস্তু রূপে চট্টগ্রামের দক্ষিণ পূর্বের পাহাড়ী সীমান্ত অঞ্চলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো। তখনকার ঐ রাজনৈতিক চাহিদারই ফল হলো আরাকানী উদ্বাস্তুদের অভিবাসন মঞ্জুর এবং তাদের সর্দারদের আধিপত্যের স্বীকৃতি মান, যার প্রশাসনিক ও আইনী ব্যবস্থা হলো ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম নামে পৃথক জেলা গঠন, যেখানে অভিবাসী উপজাতিরা হলো সংখ্যা গুরু। পরে জারি করা হলো স্থানীয় আইন রেগুলেশন নং ১/১৯০০, যা প্রতিষ্ঠিত করে একটি সহযোগী উপজাতীয় প্রশাসন। সুচনাতেই পরিস্থিতি ছিলো বাঙ্গালী থাকায় প্রতিকূল এবং প্রশাসনিক আনুকুল্যের অভাবেও বটে, এতদাঞ্চলে আর বাঙ্গালী বসতি গড়ে উঠেনি। এই বিজাতীয় আধিপত্য এককালে এ দেশীয় রাষ্ট্রীয় স্থিতি ও অখন্ডতাকে চ্যালেঞ্জ করবে, তা ভাবার ফুরসৎ প্রয়োজন ও আগ্রহ তখন বৃটিশদের ছিলো না। তবে তারা আরাকান ও বার্মা দখলে সে দেশীয় উদ্বাস্তু ও তাদের পরিজনদের সহায়তা লাভ করেছিলো। এবং খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের ও উর্বর ক্ষেত্র লাভে সক্ষম হয়েছিলো। যদিও তা ছিলো ধীর গতিক।

এখন পরিবেশ ও পরিস্থিতি পাল্টেছে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাবনাকে স্থানীয় পলিসি নির্ণয়ে অগ্রাধিকার দিতে হবে। এবং এ কথাও ভাবতে হবে যে, দেশের ১/১০ অঞ্চলে ১/২% উপজাতীয় লোকের একাধিপত্য বহাল রাখা, অখন্ডতার পক্ষে বিপজ্জনক হবে কিনা? কোন অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতার ভিত্তি হলো সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের প্রান্তিক অবস্থান, তাদের সংখ্যাগত একাধিপত্য, এবং নিজেদের জাতীয় ভিন্নতা। এই বৈরী পরিস্থিতি পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্যমান। স্বাধীনতার দাবী হালে না ওঠা, সাময়িক ব্যাপার, যা চিরস্থায়ী স্বস্তির কারণ নয়।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াই একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সমস্যাটির স্থায়ী সমাধানে মূল জাতীয় গণগোষ্ঠীর আবাসনের প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু তার অবর্তমানে পরবর্তী প্রশাসন সে কাজটি থেকে পিছিয়ে যায় এবং পরিবর্তে উপজাতীয় তোষণ ও ক্ষমতায়ণকে সমাধান রূপে গ্রহণ করে, যার পুনরাবৃত্তি অদ্যাবধি চালু আছে। কিন্তু বলা যায়, মূল অখন্ডতার সমস্যা তদ্বারা মিটান যায়নি। বিদ্রোহের ত্বরিত দুঃসাহসী উদ্যোগ আবার অনিবার্য হয়ে দেখা দিবে, সেদিন হয়তো দূরে নয়।

তোষামোদ ও সুবিধা দান নীতি সুফল দেয়নি, বরং তা বৈরীতার শক্তিবৃদ্ধি ঘটিয়েছে, এ বলা অত্যুক্তি নয়। পরিস্থিতির মূল্যায়নই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে।

বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথেই ১৯৭২ সালে উপজাতীয় বিদ্রোহী সংগঠন পার্বত্য জনসংহতি সমিতি গঠিত হয়, এবং তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। যাদের চাঁদাবাজি, লুটপাট, উৎপাত, অগ্নিসংযোগ ও আক্রমণে সারা পার্বত্য চট্টগ্রাম হয়ে ওঠে অশান্ত। প্রতিদ্বন্দী এক বিদ্রোহী প্রশাসনই মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৭৪ সালে নদী বন্দর সুবলঙ্গে তাদের সাথে পুলিশের প্রকাশ্য দিবালোকে সংঘর্ষ ঘটে। তাতে শান্তি বাহিনীর পক্ষে কিছু হতাহত ও ধৃত হয়। সেই ঘটনার লাশ সংরক্ষিত না থাকলেও, তাতে ধৃত দুই আসামী এখনো মুক্ত ও জীবিত আছেন। মরহুম শেখ মুজিবের সরকার, তাতে শংকিত হয়ে, শান্তি রক্ষী বাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি এবং দীঘিনালা ও রোমার সেনা নিবাস স্থাপনের আদেশ প্রদান করেন। দলীয়ভাবে বাঙ্গালী সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগও তখন গৃহীত হয়। এ পদক্ষেপগুলো অবিলম্বে কার্যকরী হতে শুরু করে। তবে বিদ্রোহী পক্ষ তাতে আরো মারমুখী হয়ে ওঠে। তাদের কার্যক্রম সমান্তরাল সরকারেরই রূপ ধারণ করে। এই পরিস্থিতিতে দেশে রাজনৈতিক বিপর্যয় দেখা দেয়, এবং শেখ মুজিবের হত্যা ও তার আওয়ামী সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী উত্থান পতনে সেনা প্রধান রূপে জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হোন, এবং বিদ্রোহীদের বাড়াবাড়িতে শংকিত হয়ে, শেখ মুজিবের সুচিত পদক্ষেপকে আরো শক্তিশালী করে তুলেন। তার আপোষ চেষ্টার ব্যর্থতায়, বাহিনীগত শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি, বাঙ্গালী আবাসনের উদ্যোগ গৃহীত হয়। সুতরাং পার্বত্য চট্টগ্রামে বিদ্রোহের বিপরীতে, বাহিনীগত শক্তিবৃদ্ধি ও বাঙ্গালী আবাসন হলো একটি অনিবায্য ধারাবাহিক সরকারী প্রক্রিয়া, যার মূল আওয়ামী সরকারী আমলে নিহিত। তার সুনাম বদনাম এককভাবে জিয়া সরকারের প্রাপ্য নয়, এবং বিদ্রোহের স্থান কালও জিয়ার আমলে সীমাবদ্ধ নেই।

প্রেসিডেন্ট এরশাদের আমলে এসে পূর্বের কঠোর পার্বত্য নীতির মৌলিক পরিবর্তন ও তার স্থলে সুযোগ সুবিধা ও তোষণনীতির প্রবর্তণ ঘটে, যার সুফল ভোগী প্রধান পক্ষ হলো উপজাতীয়রা। বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীরা তাতে নিঃসন্দেহে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষ। কঠোর নীতির ত্বরিত বাস্তবায়ন, এরশাদ আমলে আরো কিছু দিন অব্যাহত থাকলে, উপজাতীয়রা স্থানীয় বাঙ্গালীদের তুলনায় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়ে যেতে বাধা হতো, যার সুফল হতো, রাষ্ট্রীয় অখন্ডতার পক্ষে চিরস্থায়ী সমাধান। আজ উপজাতীয় সন্তোষ ও ক্ষমতায়নের পিছনে দৌড়ানোর কোন প্রয়োজনই হতো না। তাই বলা যায়ঃ অদুরদর্শিতা বশতঃ সমাধানকে গলাটিপে হত্যা করা হয়েছে। পরিবর্তে তোষণ ও ক্ষমতায়নের যে সমাধানকে অভ্যর্থিত করা হচ্ছে, তা পরিণামে উপজাতীয় উভ্যুত্থানের মদদ যোগাচ্ছে। তেমন অবস্থার ফলপ্রসূ রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগ হবে অত্যন্ত কঠিন। আভ্যন্তরীন স্বশাসন দাবীর মীমাংসার আন্ত র্জাতিক হস্তক্ষেপ, বাস্তবরূপে পূর্ব তিমুর ও আলবেনীয় জাতি গোষ্ঠীর পক্ষে বসনিয়ার উপস্থিত হয়ে, ইন্দোনেশিয়াও সার্বিয়াকে চেপে ধরেছে। এটি আমাদের পক্ষে আগাম উদাহরণ সতর্ক। তবে বাংলাদেশের সুবিধাজনক অবস্থান ও যুক্তি হলো, পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী

উপজাতি বা অবাঙ্গালীরা, স্থানীয় আদি বাসিন্দা নয়, বহিরাগত অভিবাসী এবং বর্তমানে বাঙ্গালীদের তুলনায় সংখ্যালঘু। ঔপনিবেশিক বৃটিশের স্বার্থে এবং তাদর আমলেই তাদের আগমন ও অভিবাসন ঘটেছে। বাংলাদেশের মূল আদি বাসিন্দা বাঙ্গালীদের স্বদেশের এই অংশে অধিবাস গ্রহণের অধিকার মৌলিক। স্বদেশের সর্বত্র তাদের সংখ্যাগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা ন্যায় সঙ্গত। দেশকে অখন্ড রাখার প্রয়োজনে কোন বিশেষ অঞ্চলে ভিন্ন কোন জনগোষ্ঠীগত প্রাধান্যকে ভেঙ্গে দেয়া অন্যায় বা নির্যাতন নয়। ভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোকেরা অবশ্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমানাধিকার পাওয়ার অধিকারী। রাষ্ট্র তজ্জন্য যত্নশীল আছে। সংখ্যা গুরু বাঙ্গালী জাতি গোষ্ঠীভূক্ত লোকদের ও দায়িত্ব হলোঃ সংখ্যালঘুদের লালন পালন ও ভালবাসা দান। যা তারা পালন করছে।

(তাং-বুধবার ১২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ২৬ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

এটা বিবেচনার বিষয় যে, বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদান করা সত্ত্বে ও বর্ণিত সংখ্যালঘুরা অশান্ত আর অসন্তুষ্ট। তা হলে কি বিশেষ সুযোগ সুবিধাগুলো বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পন্ন অন্যায় কিছু? এবং এগুলো বাঞ্ছিত সুফল দানে ব্যর্থ? তা হলে এই সুযোগ সুবিধাগুলোর পুনরমূল্যায়ন আবশ্যক।

বিশেষ সুযোগ সুবিধার খতিয়ানটি এখানে বিবেচ্য, যথাঃ

১। তিন উপজাতীয় গোষ্ঠী প্রধানদের আনুষ্ঠানিক চীফ বা সর্দার পদ মর্যাদা প্রদত্ত হয়েছে। যারা সরকারী মাসোহারা পান, নিষ্কর কিছু জমি ভোগ দখল করেন। তারা সামাজিক বিচার ও বিরোধ মীমাংসা, দন্ড দান ও সাময়িক আটক করে রাখার অধিকারী। তারা নিজ নিজ সমাজ ও সম্প্রদায় অধ্যুষিত সার্কেল বা পরগণার সহযোগী প্রশাসক ও তার ভিতরকার জুম চাষীদের জুম কর আদায় ও তা হিসাব মত সরকারকে সরবরাহের দায়িত্ব প্রাপ্ত তহসীলদার ও বটে। এই দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত তারা পরিশ্রমিক রূপে জুম করের বৃহদাংশ, ভূমি করের একাংশ, জরিমানার একাংশ বিভিন্ন সুপারিশ সনদপত্র বাবদ স্বেচ্ছা প্রনোদিত মোটা অংকের সালামী ও নজরানা প্রাপ্য হোন। তারা বেগার সেবা গ্রহণ করেন এবং সদর মৌজার হেডম্যান রূপেও ঐ পদের প্রাপ্য সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। এই নিযুক্তির বলে তারা রাজা রূপে সাধারণে সম্বোধিত। তাদের রাজত্ব হলো সর্কেলরূপী এলাকা, যা সংরক্ষিত বনের বহির্ভূত কম বেশি তিন ভাগে বিভক্ত গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম। এই অভিনব রাজত্বরূপী সার্কেল আসলে তাদের পুরুষানুক্রমিক কোন রাজ্য নয়, এবং তাতে তারা মালিকানা স্বত্বধারী কোন জমিদারও নন।

২। চাকমা, মাং ও বোমাং নামীয় তিন উপজাতীয় সার্কেল ৩৭৩ টি মৌজায় বিভক্ত। তাতে সর্দারের অধীন নিযুক্ত হোন হেডম্যান বা মৌজা প্রধান এবং ঐ হেডম্যানদের অধীন পাড়া প্রধানরূপী কারবারীরা। তারা প্রত্যেকে সরকারী মাসোহারা ও প্রতি মৌজায় ইজমালী নিষ্কর ৫০ একর সার্ভিস ল্যান্ড ভোগ দখল করেন। নিযুক্তি ও দায়িত্বের ক্ষমতা বলে চীফ ও হেডম্যানরা সমুদয় খাস জমি রাষ্ট্রীয় বন ও আবগারী সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক। বিপরীতে

জেলা প্রশাসক তাদের প্রশ্নাতীত আনুগত্যের অধিকারী। অন্যথায় তাদের নিযুক্তি বাতিল যোগ্য। কিন্তু বাস্তবে এরূপ কঠোরতা কখনো আরোপ করা হয় না। এই শৈথিল্যের ফলে চীফ ও হেডম্যানেরা অনেক ক্ষেত্রে সীমা লঙ্ঘন করে ক্ষমতা খাটান এবং সরকারকে রাজনৈতিক বিশৃংখলায় সহায়তা দান থেকে বিরত থাকেন। যদিও তাদের দায়িত্ব হলো জেলা প্রশাসকের পক্ষে আইন শৃংখলা রক্ষায় সচেষ্ট হওয়া, রাজনৈতিক, বৈষয়িক ও উৎপাদন সংক্রান্ত পরিবর্তনাদির তথ্য যোগান এবং বিশেষতঃ শাসন ও প্রশাসন সংক্রান্ত সহায়তা ও সুপারিশ প্রদান ইত্যাদি।

তিন চীফকে নিয়ে জেলা প্রশাসকের অধীন এক এডভাইজারী কাউন্সিলের কাগজে কলমে অস্তিত্ব থাকলেও বাস্তবে তার কোন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায় না, অথবা কোন চীফ বা হেডম্যানের স্থানীয় সংকট সমস্যার সমাধানে সরকারের সহায়তায় স্বতঃপ্রবৃত্ত এগিয়ে আসা ও বিরল। প্রকৃতি ও পরিবেশের পক্ষে জুম চাষ ক্ষতিকর পেশা এবং জুম করে সরকারী অংশটাও বার্ষিক মাত্র লাখ টাকার কম অতি নগণ্য। এ হেন ক্ষতিকর ও অলাভজনক পেশাটি কেবল চীফ হেডম্যান ও কার্বারী পোষণে নিয়োজিত আর অব্যাহত আছে। সরকার প্রতিদানে কিছু না পেলেও, এই অভিজাত শ্রেণীকে মাসোহারা, ভূমি কমিশন, জুম করের বৃহদাংশ সালামী ও নজরানা লাভের সুযোগ দিয়ে রেখেছেন।

৩। সাধারণের প্রাপ্য সুযোগ হলো, প্রত্যেক উপজাতীয় ব্যক্তি মফস্বলে বিনা বন্দোবস্তি তে তিরিশ শতক জায়গা ভোগ দখলের অধিকারী। একটি জুমিয়া পরিবার বিনা বন্দোবস্তি তে যে কোন খাস পাহাড়ে প্রয়োজনীয় জমি নিয়ে জুম চাষ করার পক্ষে নীরব অনুমতি প্রাপ্ত। নিজের গৃহস্থালী প্রয়োজনে যে কোন উপজাতীয় লোক বনজদ্রব্য আহরণ ও ব্যবহারে বাধাহীন। খাস পাহাড় ও রাষ্ট্রীয় বন এ জন্য উন্মুক্ত। চাষের জন্য জমির প্রয়োজন হলে প্রাথমিক আবাদকালীন তিন বছরের জন্য স্থানীয় হেডম্যানই কোন উপজাতীয় প্রার্থীকে খাজনা সালামীহীন পত্তন অনুমতি দানের অধিকারী, তৎপর এই দখলাধিকারের ভিত্তিতে, জেলা প্রশাসক থেকে নিয়মিত বন্দোবস্তি লাভ আনুষ্ঠানিকতা মাত্র। এরূপ অধিকার হলো চলমান প্রথাসিদ্ধ বিষয়।

সারাদেশে জমি নিয়ন্ত্রণ ও খাজনা আদায় তহসীলভূক্ত দায়িত্ব। পার্বত্য চট্টগ্রামে এই নিয়ম বিধির প্রবর্তন কাম্য ছিলো। কিন্তু এখানে ভিন্ন নীতি প্রচলিত থাকায়, খাস জমির উপর প্রথাগত অধিকারের দাবী উঠছে। বাধা আসছে, বনায়ন ও বাঙ্গালী পক্ষে বন্দোবস্তি দানে। এটা উপজাতীয়দের প্রদত্ত সুবিধা সুযোগের কুফল। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলই এই প্রথা ব্যবস্থাও সুবিধাবাদের ধারক। এখন এই আইনটির অবসানই উপজাতীয় প্রথা ব্যবস্থা ও প্রশাসন থেকে মুক্তি সহ স্বাধীন গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ভোগের উপায়।

স্বাধীন গণতান্ত্রিক আমলের পাবর্ত্য নীতিতে এখানে অতীত পশ্চাদপদতা নিহিত। আইন ও প্রশাসনে এখনো পরাধীন আমল টিকে আছে। বৃটিশ প্রবর্তিত উপজাতীয় প্রশাসন এখন নতুন আইনের ছত্রছায়ায় আরো শক্ত ও শক্তিশালী হয়েছে। চীফরা আগে ছিলেন

জেলা প্রশাসকের বাধ্য অনুগত। এখন তারা সনদ দাতা কর্তৃপক্ষ। যে ক্ষমতা আগে ছিলো জেলা প্রশাসকদের দায়িত্বাধীন।

মূলতঃ সর্দাররা উপজাতীয় চীফ। তাই তাদের পদবি হলো চাকমা চীফ, মাং চীফ, ও বোমাং চীফ। বাস্তবে কোন উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর উপর তাদের কোন কর্তৃত্ব নেই। তারা প্রত্যক্ষভাবে জেলা প্রশাসকদের অধীন সামন্ত। কিন্তু এখন উপজাতি অউপজাতিদের উপর চীফদের কর্তৃত্ব সম্প্রসারিত হয়েছে। তারা স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা কিনা, তার চূড়ান্ত প্রত্যয়ন বা সনদ দান ঐ তাদেরই করায়ত্ত। সামন্তবাসী সর্দারী কর্তৃত্ব স্বাধীন দেশে প্রযোজ্য নয়, এবং তা প্রবর্তনকারী আইনটিও অবৈধ। আইনতঃ জেলা প্রশাসকই স্থানীয় প্রধান নির্বাহী কর্তৃপক্ষ। তিনি জেলা হাকিমও বটে। একাধারে তিনি দেওয়ানী ফৌজদারী ও প্রশাসনিক এখতিয়ার সম্পন্ন সরকারী প্রতিনিধি রূপী স্থানীয় প্রধান। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দার পরিচয়মূলক সনদ প্রদান তারই দেওয়ানী ও নির্বাহী এখতিয়ার ভূক্ত বিষয়। উপজাতীয় সর্দার বা চীফদের কারো এরূপ ব্যাপক সরকারী এখতিয়ার নেই। তারা নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রধান হিসাবে, তাদেরকে সনদ সার্টিফিকেট দিবার অধিকারী হতে পারেন। কিন্তু অন্যদের বেলায় তারা অনুরূপ এখতিয়ার প্রাপ্ত কেউ নন। তাদের কোন নির্বাহী ও দেওয়ানী ক্ষমতা প্রাপ্য নয়। অথচ বিস্ময়কর হলোঃ নতুন জেলা পরিষদ আইনে তাদেরকে সার্বজনিন সনদ সার্টিফিকেট দাতা কর্তৃপক্ষে উন্নীত করা হয়েছে। তা হলে কি তারা জেলা প্রশাসকদের সমান্তরাল নতুন নির্বাহী ও দেওয়ানী কর্তৃপক্ষ? জেলা প্রশাসকদের উক্ত ক্ষমতাবলী কি বিভক্ত? তা না হলে চীফদের সনদ ছাড়া কেউ স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা রূপে গন্য হবে না, ভোটার ও নির্বাচন প্রার্থী হতে পারবে না, জমি জমা চাকুরী ব্যবসা ইত্যাদির অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে, এসব কি যুক্তিসঙ্গত আইন? বাঙ্গালী আর উপজাতিদের জন্য এরূপ বাধা নিষেধ ও সীমাবদ্ধতা তো দেশের কোথাও নেই। চীফদের পদ ও ক্ষমতা গণতান্ত্রিক নয়। তারা জনপ্রতিনিধিও নন। রাজতন্ত্র ছাড়া, এরূপ কর্তৃত্বমূলক পদও ক্ষমতা কি কোন স্বাধীন দেশে প্রাপ্য? তা না হলে তাদের ক্ষমতার উৎস কী? বাংলাদেশ সংবিধানের অতিরিক্ত কোন অলিখিত বা গোপন সংবিধান আছে কি. যেটি উপজাতীয় চীফদের নির্বাহী ক্ষমতা অনুমোদন করে, অথবা তাদের রাজ ক্ষমতার স্বীকৃতি দান করে? হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলেও তাদের অনুরূপ কোন ক্ষমতা লিপিবদ্ধ নেই, যে আইন পরাধীন আমলের উচ্ছিষ্ট। উপজাতিরাও আজকাল চীফদের প্রাধান্য দেয় না। জুমিয়ারাও তাদের উদ্দেশ্যে ভীড় জমায় না। তাই পূন্যাহ অনুষ্ঠান চাকমা ও মাং দরবারে অনুষ্ঠিত হয় না। কেবল অতি কষ্টে বোমাং প্রধানরা এই অনুষ্ঠানটি কোন মতে জিইয়ে রেখেছেন। পরিবর্তে আরেক রাজতন্ত্র মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, আর তা হলো স্থানীয় কাউন্সিল বা পরিষদ ভিত্তিক ক্ষমতা। সেই ১৯৮৯ সালে তিন জেলা পরিষদ ভোটারহীন নির্বাচনের মাধ্যমে তিন বছরের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে, গত দীর্ঘ দিন যাবৎ বহাল আছে। এখন আঞ্চলিক পরিষদ নমে, আরেক বড় পরিষদ মনোনীত হয়ে ক্ষমতাসীন। তারও কোন নির্বাচন হওয়া অনিশ্চিত। এটা হলো স্বার্থসিদ্ধি ও ক্ষমতা ভোগের কায়েমী ঘাপলা।

৪। ব্যাপক সংখ্যক প্রাইমারী স্কুল, জুনিয়র ও মাধ্যমিক স্কুল এবং কলেজ প্রতিষ্ঠা ঘটাচ্ছে।

৫। শিক্ষাগত উচ্চ যোগ্যতার বলে, প্রধান তিন সম্প্রদায় চাকমা মারমা ও ত্রিপুরাদের কর্ম সংস্থানের হারও বেশি। কোটা ও সরকারী আনুকুল্যে তারা সর্বাধিক সুবিধা প্রাপ্ত লোক। এরশাদ আমলে কর্ম সংস্থান ও নিযুক্তি বন্ধ থাকা সত্ত্বেও সরকার ও স্থানীয় সেনা কর্তৃপক্ষের আনুকুল্যে বিভিন্ন সংস্থার লোভনীয় পদে, কোন পরীক্ষা ও প্রতিযোগিতা ছাড়াই ১৮০০ উপজাতীয় যুবক যুবতীর কর্ম সংস্থান হয়েছে। স্থানীয় পরিষদ ও উন্নয়ন বোর্ডেও অনেকের নিযুক্তি ঘটেছে। এই নিয়ম বহির্ভূত আনুকূল্যের লক্ষ্য হলোঃ তাদের মন জয় করা ও বিদ্রোহী বাহিনীতে যোগদান থেকে বিরত রাখা। অথচ বাস্তবে তার কিছুই হয়নি।

(তাং-রোববার ১৩ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ৩০ মে ১৯৯৯ খ্রীঃ / দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

৬। পার্বত্য চট্টগ্রাম মূলতঃ খাস পাহাড় ও বনাঞ্চলের সমষ্টি। জনবসতি অঞ্চল রূপে এটি কখনো বিবেচিত ছিলো না। মোগল আমলে এখানে জুম নোয়াবাদ নামীয় এক অস্থায়ী বন্দোবস্তি ব্যবস্থার আওতায়, পূর্ব সীমান্তবর্তী মুক্তাঞ্চলবাসী কুকি নামীয় উপজাতীয় জুমিয়াদের, বর্ষা মওসুমে কিছু এলাকায়, কার্পাস তুলা চাষ ও সরবরাহের শর্তে, জুম চাষ করতে দেওয়া হতো। চাষ ও ফসল কাটা শেষে তারা নিজেদের মুক্তাঞ্চলে ফিরৎ চলে যেতো। তখন বর্তমান উপজাতিদের কারোরই আগমন ও অধিবাস গড়ে উঠেনি। বন সম্পদের ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে তা সংরক্ষণের কোন প্রয়োজনও ছিল না। বরং আবাদ ও বসতি বৃদ্ধির প্রতি সরকারের আগ্রহ বেশি ছিলো এবং তাই ছিলো রাজস্ব আয় বৃদ্ধির সূত্র। তবে বসতিহীনতার এক পর্যায়ে বৃটিশ আমল এসে যায় এবং তখন আরাকানে, চাকমা ও মগ সম্প্রদায়ের পরস্পরের মাঝে সংঘর্ষ ঘটে। যদ্দরুণ নির্যাতিত চাকমা সম্প্রদায় আরাকানে ত্যাগ করে বাংলাদেশী সীমান্ত ভূক্ত বন ও পাহাড়ে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। পরে বার্মার আভা রাজ্য কর্তৃক আরাকান বিজিত হলে, স্থানীয় প্রতিবাদী মগেরাও দেশ ত্যাগ করে, এ পারে আশ্রয় গ্রহণ করে। ঐ আরাকানী উদ্বাস্তু ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে নিযুক্ত বৃটিশ কর্মকর্তা মিঃ স্নিরিল কক্স, এখনো শহর কক্সবাজার নামের ভিতর স্মৃতি হয়ে আছেন।

পরে শরণার্থী চাকমা ও মগদের সাথে আরো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপজাতীয় লোকেরা এসে যোগদান করে। বন পাহাড় সংরক্ষণের কোন প্রয়োজন না থাকায়, বিপুল সংখ্যক শরণার্থী জুমজীবি উপজাতিদের অবাধে বসতি স্থাপন ও জুম চাষের দ্বারা জীবিকা সংগ্রহে উৎসাহিত করা হয়। তারা বার্মার বিরুদ্ধে বৃটিশ সহযোগী যোদ্ধা রূপেও মূল্যায়িত হয়, যদ্দরুণ সহজে অভিবাসীর মর্যাদা লাভ করে। পরে বন ও পাহাড় মূল্যবান ও সমৃদ্ধ রাজস্ব সূত্র রূপে প্রতিভাত হলে ১৮৬৫ সালে আইন নং ৭ ধারা নং ২ জারি ও তা ফেব্রুয়ারী ১৮৭১ সালে কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করে, সরকার পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রায় সমূদয় অঞ্চলকেই বনরূপে ঘোষণা দান করেন। পরবর্তীতে ১২২০.৯৬ বর্গমাইল অঞ্চল নিয়ে গঠিত হয় সংরক্ষিত বনাঞ্চল এবং ৩১৬৬ বর্গমাইল নিয়ে গঠিত হয় অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল বা ইউ এস

এফ। অবশিষ্ট ৬৯৬.০৪ বর্গমাইল মাত্র বসতি বা আবাদী অঞ্চল রূপে স্বীকৃতি পায়, যার ২৫৬ বর্গমাইল এলাকা পরে কর্ণফূলী হ্রদের জন্য অধিগ্রহণ করা হয়। এবার শুভঙ্করের ফাঁকি এটাই যে ৩১৬৬ বর্গমাইল ব্যাপ্ত অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চলটি, এখন বসতিমুক্ত নেই। এখন এটি বিভিন্ন মৌজাধীন অঞ্চল ও জুম ক্ষেত্র, যার তত্ত্বাবধায়ক কর্তৃপক্ষ হলেন তিন উপজাতীয় সর্দার ও তিনশত তেয়াত্তর জন মৌজা প্রধান বা হেডম্যান, যারা জেলা প্রশাসক কর্তৃক নিযুক্ত। তারা সরকারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্তিকে অবজ্ঞা করে এটাকেই বলেনঃ উপজাতীয় ভূমি অধিকার। সরকারের উদার আচরণের ভীষণ কুফল হলোঃ তারা অবাধে খাস পাহাড় ও বনের প্রাকৃতিক সম্পদের ভোগ ব্যবহারের নিজস্ব বাণিজ্যিকরণ ও ধ্বংস সাধনে লিপ্ত। জুমের দ্বারা বন, বন্যপ্রাণী ও পরিবেশ ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। কাজটি বেআইনী হলেও তা কখনো আমলে নেওয়া হয় নি। এখন সংগঠিত উপজাতীয় শক্তি এমনই বেয়াড়া যে অপমান, বদলী ও প্রাণের ভয়ে, সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী ও বাহিনী সদস্যরা সর্বদা তটস্থ থাকেন। জোতের পারমিটের নামে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের মূল্যবান কাঠ সম্পদ আহরিত হচ্ছে আর বিনা শুল্কে পাচার হয়ে যাচ্ছে। অশ্রেণীভূক্ত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল তো উপজাতিদের সামাজিক জোতভূক্ত বাগানেই পরিণত হয়ে গেছে। তার গাছ, বাঁশ, বল্লি, জ্বালানী কাঠ, বেত, ছন, লতা, পাতা ইত্যাদি অবাধে আহরিত হয় ও বাজার হাটে প্রকাশ্যে বিকোয়। সরকার এগুলোর শুল্ক লাভ থেকেও বঞ্চিত। অবাধ গৃহস্থালী ব্যবহারের অধিকারের মানে তো খরিদ বিক্রি ও বাণিজ্য করা নয়। এগুলোকে পণ্য অনুদান ধরা হলে, প্রতি উপজাতীয় পরিবার বার্ষিক লক্ষাধিক টাকার আর্থিক সুবিধা ভোগ করে থাকেন, যা দৃশ্যতঃ অনুদান বলে অনুভূত নয়।

বৈষয়িক ও আর্থিক সুযোগ সুবিধার অতিরিক্ত এই মূল্যবান আনুকুল্য অবহেলা যোগ্য নয়। তজ্জন্য তাদের মাঝে স্বীকৃতি ও কৃতজ্ঞতাবোধ না থাকাটাও বিস্ময়কর।

৭। সরকারী অর্থে পরিচালিত উন্নয়ন বোর্ড ও জেলা পরিষদগুলোর উন্নয়ন কার্যক্রম দুর্নীতিগ্রস্ত হলেও, তাতে দুর্গম ও বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলো পর্যন্ত সড়ক ও নৌ যোগাযোগে সমৃদ্ধ। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রাতিষ্ঠানিক নির্মাণ কাজের ব্যাপকতা সর্বত্রই দৃশ্যমান। স্কুল, কলেজ, বৌদ্ধ মন্দির, কমিউনিটি সেন্টার, পালি টোল, সেচ নালা, বন্যা প্রতিরোধ বাঁধ, কারিগরী ও শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খেলার মাঠ, টিউবওয়েল, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, সিড়িঁঘাট, বাজার হাট ইত্যাদির উন্নয়ন ও নির্মানে এই সংস্থাগুলো অত্যন্ত তৎপর। উন্নয়ন ক্ষেত্রের অভাবে ভবিষ্যতে হয়তো ব্যক্তিগত ঘর বাড়ি নির্মান, ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়া, বিনিয়োগ সহায়তা দান ইত্যাদির উদ্যোগের প্রতিও এ প্রতিষ্ঠানগুলো এগুবে। লক্ষ্য হবে ব্যাপক জনকল্যাণ ও জীবন মানের উন্নয়ন।

এই গঠনমূলক উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে অবশ্য যোগ্য ও সেবা ধর্মী নেতৃত্বের উপস্থিতি আবশ্যক, নতুবা এগুলো হয়ে যেতে পারে অপব্যয়ের ক্ষেত্র ও লুটপাটের আখড়া। ক্ষমতার পাদ পীঠে, স্বার্থান্ধ লোকের আগমন অবশ্যই ঘটে। তাদের প্রধান লক্ষ্য হয় মাল পানি কামান ও আখের গোছান। তা না হয়ে উন্নয়ন বোর্ড আঞ্চলিক ও জেলা পরিষদ

সমূহের মাধ্যমে যে বিপুল অংকের উন্নয়ন বিনিয়োগ হয়েছে, তার যথাযথ সদ্ব্যবহার হলে, পার্বত্য চট্টগ্রামের চেহারা আরো সুন্দর ও স্বাস্থ্যকর হতো। গরীব দেশের টাকা, ততোধিক গরীব অঞ্চলের ভাগ্যোন্নয়নে যথাযথভাবে ব্যয়িত না হওয়া, এবং চাটার দলের পেটে যাওয়া, বড়ই দূর্ভাগ্যের বিষয়। অনেকে খেদ করে বলেনঃ পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়নে যত টাকা ব্যয় হয়েছে, তাতে কর্ণফুলী হ্রদ ও ভরে যেতো। অথচ উন্নয়ন তত দৃশ্যমান নয়। অধিকাংশ চাটার দলের পেটে গেছে। কেউ করেছে ছিনতাই ও চাঁদাবাজী। কেউ বসিয়েছে ভাগ। ঘুষ, কমিশন, সালামী তো আছেই। এই চাটার দলে পাহাড়ী অপাহাড়ী সবাই যুক্ত।

৮। আরেক রাহাজানি ব্যবস্থা সামনে অগ্রসরমান। সে হলো উপজাতি, আদিবাসী ও পাহাড়ীর নামে অগ্রাধিকার ও সংরক্ষণবাদ। বাঙ্গালীদের বঞ্চিত করে সব পাওয়ার পায়তারা। আইন হয়ে গেছে। এখন বাস্তবায়ন চলছে। পার্বত্য মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী পদ, টাস্কফোর্স, উন্নয়ন বোর্ড, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদ, পার্বত্য বাঙ্গালীদের জন্য নিষিদ্ধ। এর কোন মিয়াদকাল নেই। এটি কায়েমী ব্যবস্থা। পরিষদ সমূহে নির্বাহী কর্মকর্তাদের পদ ও অন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদের নিয়ুক্তিতেও অবাঙ্গালীদের অগ্রাধিকার। অন্য স্থানীয় কর্মসংস্থান, ব্যবসা বাণিজ্য, জমি বন্দোবস্ত, লাইসেন্স, পারমিট ইত্যাদিতেও বাঙ্গালীরা উচ্ছিষ্টের ভাগীদার। দেশ ভিত্তিক উচ্চ শিক্ষা, কারিগরী প্রশিক্ষণ, বৃত্তি ও নিয়ুক্তির ক্ষেত্রেও উপজাতীয় বৃহৎ কোটা ও অগ্রাধিকার নির্ধারিত। পার্বত্য বাঙ্গালীরা এসবে বৈষম্যের শিকার। অথচ দেশের সর্বাধিক অনুন্নত ও পশ্চাদপদ সমাজ হলো এই পার্বত্য বাঙ্গালীরা। বৃহৎ তিন উপজাতি সম্প্রদায়, অবশিষ্ট ক্ষুদ্র উপজাতিদের প্রাপ্য সুযোগ সুবিধাকেও শোষণ ও ছিনতাই করে ভোগ করছে। সম্প্রদায় ভিত্তিক ভোগ ও ভাগের সুনির্দিষ্ট সময় পরিমাণ ও পরিমাপের উল্লেখ না থাকায়, সুযোগ সুবিধা ভোগের ক্ষেত্রে বঞ্চনা ও তারতম্য ঘটছে। এ ক্ষেত্রে সময়সীমা, মাপকাঠি ও হ্রাস বৃদ্ধি ধরণের বিধি ব্যবস্থা থাকা উচিত ছিলো।

পরিশেষে স্মর্তব্য যে, বিপুল সুযোগ সুবিধা দান সত্বেও তা উপজাতীয় সন্তুষ্টি বিধানে ব্যর্থ হয়েছে। এসবই বর্ধিত ক্ষমতা ও স্বাধিকার লাভের অগ্রাভিযানে শক্তি বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে।

(তাং-শনিবার ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৪০৬ বাংলা ৫ জুন ১৯৯৯ খ্রীঃ দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

৯। কারিগরী ও উচ্চ শিক্ষার সংরক্ষিত আসন বা কোটার সুযোগে প্রতি বছর ইঞ্জিনিয়ার, কৃষিবিদ প্রফেসার, ডাক্তার, উচ্চ প্রযুক্তিবিদ, বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি পর্যায়ে শতাধিক যোগ্য ব্যক্তি দেশী বিদেশী বিশ্ব বিদ্যালয় ও বিশেষায়িত শিক্ষায়তন থেকে উত্তীর্ণ হয়ে, উপজাতি সমাজের যোগ্যতা বৃদ্ধি ও মুখ উজ্জ্বল করছেন। এই ধারা অব্যাহত থাকলে অচিরেই, উপজাতি সমাজ বাংলাদেশের শিরোমনি হয়ে দাঁড়াবেন। লেখা পড়ার শীর্ষ যোগ্যতা, তাদের হাতে এনে দিবে, সম্পদ সম্পত্তি, শীর্ষ পদ ও ক্ষমতা। এখনই সারা দেশের অফিস আদালত, ব্যাংক বীমা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিতে কর্মকর্তা কর্মচারী ও শিক্ষক রূপে উপজাতিরা আনুপাতিক হারের চেয়ে অধিক সংখ্যায় গিজ গিজ করছেন। এখন তারা পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠী নন, এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পিছিয়ে পড়া এলাকা নয়। গোটা উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর চেয়ে বহুগুণ অধিক অভাগা বাঙ্গালী,

বাংলাদেশের যে কোন বড় শহরের বস্তিতেই মানবেতর জীবন যাপন করে। এই গরীব দেশের এটা স্বাভাবিক চিত্র। তবু উপজাতীয় ভাগ্যোন্নয়নে বাংলাদেশ সচেষ্ট। এ কারণে এতদাঞ্চলে এখন বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের আদিম জীবন মান ও পশ্চাদপদতা কেটে ওঠেছে। এ জন্য বাংলাদেশ প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য হলোঃ উপকৃতরা মোটেও কৃতজ্ঞ ও সন্তুষ্ট নন। তাদের খাই ও দাবী অত্যধিক। এখনো বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলের দায়ভার বাংলাদেশর উপর আরোপিত হয়। উপকার ও উন্নয়নের বিপরীতে উপজাতিদের কিছুই যেন করার নেই। এতদাঞ্চলের বাংলাদেশ হয়ে থাকা যেন অন্যায় ও অপরাধ, অথবা উপজাতিদের বাংলাদেশী হয়ে থাকা যেন এক মস্ত অবদান। এর প্রতিদান হিসাবে তাদের অলস ভোক্তা হয়ে থাকা, নিরেট মেহেরবানী। পদ, সম্পদ, ক্ষমতা, অনুদান লাভ, সে তো তাদের প্রাপ্য।

১০। উপজাতীয় ক্ষমতায়ন ও আনুকূল্যের বিপরীতে জাতি বৈষম্যের শিকার, এবং রাষ্ট্রীয় এক কেন্দ্রিকতা বিপন্ন। গণতান্ত্রিক আর অসাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রীয় নীতি এখন আর অক্ষুণ্ন নেই।

বিশেষ আইন ও ক্ষমতার ধারায়, পর্বতাঞ্চলের আঞ্চলিক পরিষদের জন্য যা স্থানীয় শাসন জাত, না রাজনৈতিক রূপান্তর, এই প্রশ্নটি ধামাচাপা দেয়া হচ্ছে। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ রাষ্ট্র ফেডারেল নয়, এক কেন্দ্রিক। এই চরিত্রকে বজায় রেখে, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের উপায় হলো, প্রশাসনিক ইউনিটগুলোতে, অভিন্ন আইনের আওতায় স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন। সংবিধানের ৫৯ অনুচ্ছেদে তা-ই ব্যক্ত আছে। কিন্তু কর্তৃত্বের ধারা প্রায় পরিষ্কার নয় যে, তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ অনুরূপ স্থানীয় শাসন ভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কিনা। ফেকড়া হলোঃ পার্বত্য পরিষদ আইন, সারা দেশের উপযোগী অভিন্ন স্থানীয় শাসন বিধি নয়। ভিন্ন ভিন্ন স্থানীয় আইন প্রবর্তিত হয়ে, বিধিগত বৈষম্যের সৃষ্টি হচ্ছে, যার পরিনামে জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় অখন্ডতা বিরোধী উদাহরণ সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। এই বিপদকে টেনে আনা যুক্তিসঙ্গত বলা যায় না।

উপরোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এ বলা সঙ্গত যে, বিশেষ ক্ষমতা সম্পন্ন পার্বত্য জেলা ও আঞ্চলিক পরিষদ হলো বাংলাদেশের পক্ষে বৈষশ্য মূলক রাজনৈতিক বিষফোড়া বিশেষ।

১১। সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী, তথা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। জনগণের পক্ষে জনগণ কর্তৃক জন সমর্থনের ভিত্তিতে, এর শাসন প্রশাসন আইন ও নীতি নির্ধারণ সম্পন্ন হবে, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের শাসন প্রশাসন আইন ও নীতি নির্দেশে এই মৌলিকতা পালিত হচ্ছে না। সরকার ৫০% এর বেশী জন সমর্থনের দ্বারা গঠিত নয়। এই ক্রুটির ক্ষতি পূরণ রূপে তার উচিতঃ নীতি নির্দেশের পক্ষে জনমত ও সমর্থন নিশ্চিত করা। এই আনুষ্ঠানিকতার প্রথম ধাপ হলো, জাতীয় সংসদের সমর্থন গ্রহণ, ও তৎপর গণভোটের ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক জাতীয় সংকট ও সমস্যার নিরসনে সরকারের পদক্ষেপের পক্ষে এরূপ জনসমর্থন গ্রহণ করা হলেই দেশ হবে সত্যিকার গণপ্রজাতন্ত্রী।

পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রশ্নে সরকার এক নায়ক সুলভ ব্যবস্থা নিয়ে অগ্রসরমান। জাতি এই প্রশ্নে দ্বিধা বিভক্ত ও সন্দিহান। এখানে এক নায়ক সুলভ পদক্ষেপ গ্রহণ যথার্থ নয়। গণতান্ত্রিক নিয়মনীতি ও আদর্শের গুরুতর ব্যত্যয় এই ক্ষেত্রে স্পষ্ট।

রাষ্ট্রীয় মৌলিক আইন সংবিধানে, বিশেষ কোন অঞ্চল গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের জন্য কোন বিশেষ অধিকার সংরক্ষিত করা অনুমোদিত নয়। অনুচ্ছেদ ১৯, ২৭ ও ২৯ মানুষে মানুষে আর অঞ্চলে অঞ্চলে বৈষম্য অনুমোদন করেনা, এবং সবার জন্য ন্যায় বিচার ও সমতারই নির্দেশ প্রদান করে। কিন্তু পার্বত্য আইনে, স্থানীয় বাঙ্গালীদের জন্য জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান পদ লাভ নিষিদ্ধ। তারা স্থানীয় জনসংখ্যায় প্রায় অর্ধেক হলেও, ঐ পরিষদ সমূহের ১/৩ সদস্য পদের অধিকারী। কর্মসংস্থান, নিযুক্তি ও আর্থিক সুবিধাদির ক্ষেত্রে, পরিষদ আইনে উপজাতি বা অবাঙ্গালীদেরই অগ্রাধিকার প্রাপ্য। পার্বত্য মন্ত্রনালয়ের মন্ত্রী পদ, দুই পরিষদ, উন্নয়ন বোর্ড ও টাস্কফোর্সের চেয়ারম্যান পদ উপজাতি কোটা ভূক্ত সংরক্ষিত। ভোটার হওয়ার সাংবিধানিক যোগ্যতা ও বাঙ্গালীদের জন্য শর্ত সাপেক্ষ। স্থানীয় স্থায়ী বাসিন্দা-হওয়ার সার্টিফিকেটটি ও তাদেরকে উপজাতীয় চীফদের নিকট থেকে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। অথচ এ বাঙ্গালীরাই বাংলাদেশ ভূখন্ডের আদি বাসিন্দা, স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা। উপজাতিরা বহিরাগত অভিবাসী অথবা তাদের বংশধর। ভাগ্যের পরিহাস এটাই যে, যারা এ দেশের আদিবাসিন্দা নয়, তাদেরই দাবী অনুযায়ী সরকার ও ভাবেনঃ স্থানীয় বাঙ্গালীদের অধিকাংশ বহিরাগত আর উপজাতিরাই স্থানীয় আদি অধিবাসী। তাতে ভাবার অবকাশ থাকে যে বাঙ্গালীরা জাতীয় প্রধান জনগোষ্ঠী রূপে বিশেষ সুবিধা পাওয়ার হকদার। এ নিয়ে বিতর্ক অনাকাঙ্খিত। এর প্রতিকারে স্থানীয় অস্থানীয়, আদি ও বসতি স্থাপনকারী পরাগত বহিরাগত ইত্যাদি ভাবার সব সূত্র সম্বন্ধ পরিহার করা দরকার। এর পক্ষে সংশোধনী হবেঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম বন ও বসতি সমৃদ্ধ উপজাতি ও বাঙ্গালী অধ্যুষিত মিশ্র অঞ্চল। স্থানীয় বাসিন্দা ও সম্প্রদায় পরিচিতির সনদ দিবেন স্থানীয় জেলা প্রশাসক। জনপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা লাভের সুত্র হবে গণতান্ত্রিক অবাধ নির্বাচন। সাংবিধানিক ভোটাধিকারই প্রযোজ্য হবে। সামন্তবাদ, মনোনয়ন ও ঔপনিবেসিক আইনঃ হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলের স্থান গ্রহণ করবে, দেশে প্রচলিত অভিন্ন বিধি ব্যবস্থা ও সংবিধান। ভূমি প্রশাসনের দায়িত্ব রাজস্ব বিভাগ ও তহসীলের উপর ন্যস্ত হবে। প্রথাগত নিযুক্তি, শাসন প্রশাসন ক্ষমতা, ও ভোগ দখলের বিধি ব্যবস্থা রহিত হবে। এক সাথে উপজাতীয় সার্কেল ও নির্বাচিত সংস্থা পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদের নির্বাচিত আর মনোনীত *রাজা*, চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের অবস্থান মাথাভারি ব্যবস্থা। এতে ছাটাই বাছাই হওয়া দরকার। এবং তন্মধ্যে প্রথাগতভাবে নিযুক্ত চীফ, হেডম্যান ও কারবারীদের পদ ও দায়িত্ব সর্বাগ্রে বিলোপযোগ্য। হিল ট্রাক্টস ম্যানুয়েলটিও এখন আমল যোগ্য নয়। সর্বোপরি পার্বত্য মন্ত্রণালয় উপজাতীয় মন্ত্রী পদ ও চেয়ারম্যান পদ সমূহ বাড়তি তোষণ ও পক্ষপাত মূলক ব্যবস্থা। এসব পরিত্যজ্য।
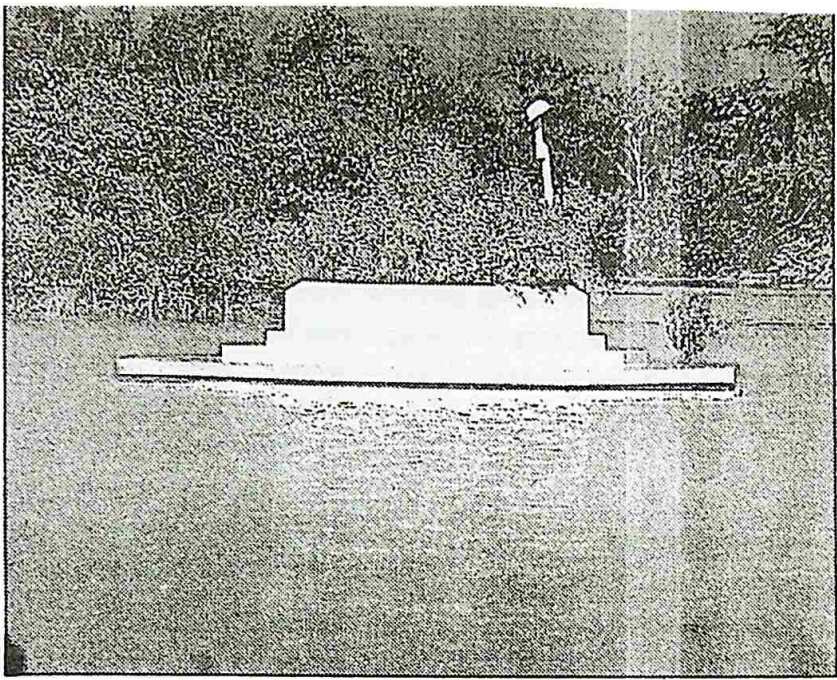
বীর শ্রেষ্ঠ মুন্সি আং রউফ এর স্মৃতি স্তম্ভ

২৪. উপজাতীয় আনুগত্যের সংকট

সূত্রঃ দৈনিক ইনকিলাব ২৮ জানুয়ারী ২০০৪

পার্বত্য চুক্তি নিজেই সরকারকে অসাংবিধানিক দায়িত্ব পালন থেকে মুক্ত করে দিয়েছে। এটি বাতিল, বা সংশোধনের প্রয়োজন নেই। উপজাতীয় প্রধান নেতা জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমা গত বহু বছরেও পার্বত্য চুক্তি বুঝতে ও নিজ উগ্র অশালীন বিদ্রোহী চরিত্র শুধরাতে সক্ষম হননি। পূর্ববর্তী আওয়ামী লীগ সরকার স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন, সন্তু লারমার মাঝে আচরণগত পরিবর্তন অবশ্যই হবে। দীর্ঘ দিন যাবৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের নেতৃত্বদানের দ্বারা, তার মাঝে উগ্র একনায়ক সুলভ চরিত্র গড়ে উঠেছে। তার অবসান হওয়া সময় সাপেক্ষ। তিনি নিজেকে একজন ক্ষুদ্র রাষ্ট্রপ্রধানরূপে ভাবতে শিখেছেন। আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান পদে বরিত হয়ে, তিনি নিজেকে আরো ছোট কিছু ভাবতে পারছেন না। এ কারণে কেবিনেট মন্ত্রীদের পরোয়া না করা, তাদের স্বাগত জানাতে উপস্থিত না হওয়া ইত্যাদি ঔদ্ধত্য হলো, তার সাময়িক সুপিরিওরিটি কমপ্লেক্স ধরণের অহমিকা। তবে তাকে শুধরাবার সময় দেয়া উচিত।

উপরোক্ত বিচেনায়, সন্তু বাবুর উগ্র আচরণ ও সমালোচনায় আওয়ামী সরকার ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন। তাকে ক্ষেপাতে কড়া বক্তব্য দেননি, কঠোর কোন ব্যবস্থাও গ্রহণ করেননি। অথচ দেশ ও জাতির অখন্ডতা রক্ষা ও সংবিধান মান্যতায়, সন্তু বাবুকে

অঙ্গীকারাবদ্ধ করা সত্ত্বেও, তার অপ্রিয় প্রতিটি কাজের গোড়াপত্তন আওয়ামী সরকারই করে গেছেন। তাকে একদিকে মর্যাদার তুঙ্গে তুলেছেন। রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে অভ্যর্থনা দিয়ে আপ্যায়িত করে রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদা দিয়েছেন। অপরদিকে সাংবিধানিক সংস্থানহীন একটি ভঙ্গুর আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষুদ্র চেয়ারম্যান পদে নামিয়ে দিয়ে অনুগ্রহের পাত্রে পরিণত করেছেন। যে অগ্রাধিকার ও মর্যাদাগুলো মঞ্জুর করে, তাকে খুশিতে ফাঁপিয়ে তোলা হয়েছিল, তা সাংবিধানিক বাধায় এখনি ফাঁপা বেলুনের মত ফুটে যাওয়ার উপক্রম। জোট সরকারের প্রধানমন্ত্রী পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক পূর্ণ মন্ত্রীর পদ নিজেই ধরে রেখেছেন, আর পার্বত্য উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান পদটিও জনৈক বাঙ্গালী এমপি'র করায়ত্ত হয়েছে। এ করা বেআইনী নয়। সন্দেহ থাকলে সন্তু বাবু আইনী লড়াই করে দেখতে পারেন। অগ্রাধিকার আর সংরক্ষিত পদের ব্যাপারেও আইনী লড়াই হলে, নিশ্চিতরূপেই সন্তু বাবু হেরে যাবেন। এসবই হবে আওয়ামী চুক্তির কৌশলপূর্ণ মোসাবিদার সুফল। সন্তু বাবুদের ডুবাতে আর কাউকে কিছু করতে হবে না।

তবু সন্তু বাবু কিসের বলে বকে বেড়ান যে, চুক্তি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে না। অথচ চুক্তির মূলোৎপাটনের বর্ণনায় তারই স্বাক্ষর আছে। মুখবন্ধেই চুক্তির গোড়া কর্তন হয়ে গেছে। এ জন্য কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। দোষ তার নিজেরই। দোষ ধরিয়ে দিয়ে তাকে কেউ ক্ষেপাতে চায় না। ধামাচাপা চলছে। বকাঝকা সহ্য করা হচ্ছে। কেউ রহস্য ভেদ করছে না। এ যে অপ্রিয় সত্য কথন। উপজাতীয় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন শিবিরে বিভক্ত, তবু তারা এক সুতায় বাঁধা। বিএনপি আর আওয়ামীতে উপজাতীয়দের যারা দলভূক্ত, তারাও সন্তু বাবুর প্রতি অনুরক্ত। কেউ তার বক্তব্যের প্রত্যুত্তরে সোচ্চার নন। আগে তিনি আওয়ামী সরকারের চৌদ্দ পুরুষ উদ্ধার করেছেন। কিন্তু আওয়ামীপন্থী এক দীপঙ্কর তালুকদারের মৃদু কিছু পত্যুত্তর ছাড়া, অন্যান্য আওয়ামীপন্থী উপজাতীয়রা নিশ্চুপ থেকেছেন। দীপঙ্কর বাবুর দৃঢ়তা এখানে যে, তিনি খাঁটি আওয়ামীপন্থী। বর্তমান জোট সরকারে বা বিএনপিতে দৃঢ় চেতা এরূপ কোন উপজাতীয় নেতা নেই। যারা আছেন তারা জে এসএস থেকে ধার করা। তাই দলে না থাকলেও তারা মূল গুরু সন্তু বাবুর বক্তব্যের কোন প্রত্যুত্তর দেন না। গুরু যখন বলেনঃ গত ইলেকশনে আমি ভোট বর্জন করায় আওয়ামী বাক্সে উপজাতীয় ভোট পড়েনি, তাই তুমি বিএনপি প্রার্থী মণি স্বপন বাঙালী ভোটে এমপি নির্বাচিত হয়েছো। আমারই কৃত চুক্তির বলে তুমি এখন উপমন্ত্রী। আমি পূর্ণমন্ত্রীর জন্য আন্দোলন করছি। তাতে সফল হলে তার সুফল পাবে তুমি। আমার বিরোধিতা করা তোমার পক্ষে আত্মঘাতী। সুতরাং স্বাভাবিকভাবে মণি স্বপন দেওয়ান সরকারের পক্ষে মুখ খুলেন না। সন্তু বাবু সরকারকে নেস্ত-নাবুদ করেন, কিন্তু গুরুকে তিনি প্রত্যুত্তর দেন না। একই অবস্থা রাঙ্গামাটির জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ডঃ মানিক লাল দেওয়ানের ও উদ্বাস্তু পূণর্বাসন টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান সমীরণ দেওয়ানের। মণি স্বপনের মত এই দুজনও জেএসএস শিবির ত্যাগী

লোক। তবে সাবেক গুরু সন্তু বাবুর প্রতি এখনো তারা অনুগত। তারা তাকে ক্ষেপাতে অনিচ্ছুক। হুমকি ধমকি আর সমালোচনায় সরকার নেস্ত-নাবুদ হচ্ছেন। কিন্তু সরকারের এই ক্ষমতাভোগীরা গুরুর বিপক্ষে চুপ। এদের ক্ষমতায় বসিয়ে রেখে বিএনপি বা জোট সরকারের লাভ অতি ক্ষীণ? এরা খাঁটি সরকার দলের লোক হলে, প্রতিবাদী আওয়াজে সন্তু বাবুকে কোণঠাসা করে তোলা সম্ভব হতো। উল্টা তারা ভাবছেন, তাদের পদোন্নতি ও মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হলো সন্তু বাবুরই আন্দোলন। উপ মন্ত্রী দেওয়ানের সুপারিশে অপর দুই দেওয়ান চেয়ারম্যান হয়েছেন। এটা আরেক স্বজনপ্রীতি।

শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমল থেকে প্রতিটি সরকার পছন্দসই উপজাতীয় নেতৃবৃন্দকে বড় বড় রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পদে সমাসীন করে তাদের সপক্ষে টানার ও উপজাতীয়দের খোশ করার চেষ্টা করে আসছেন। এছাড়াও সাধারণভাবে উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে উপজাতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্যঃ তাদের মন থেকে বঞ্চনার মনোভাব আর বিদ্রোহ অসন্তোষ দূর করা। তবু তাতে বাঞ্ছিত সুফল ফলেনি। অতঃপর রাজনৈতিক মাধ্যমে সুবিধা পত্তন করা হয়। গঠিত হয় স্থানীয় শাসন ভিত্তিক আঞ্চলিক জেলা ও উপজেলা পরিষদ।

উন্নয়ন বোর্ডকে করা হয় আরো গতিশীল। সংসদীয় আসন দু'টির স্থলে তিনটি করা হয়েছে। শান্তি স্থাপন ও ভারত থেকে শরণার্থীদের ফিরিয়ে এনে প্রত্যাবাসনের লক্ষ্যে ক্ষমা ও প্রচুর সুযোগ সুবিধা সম্বলিত একটি সমঝোতা চুক্তিও সম্পাদিত হয়েছে। প্রধান বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমা আঞ্চলিক পরিষদে চেয়ারম্যান ও তার সঙ্গী সাথীদের সদস্য পদে সম্মানজনক ভাবে পূনর্বাসিত হয়েছে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক একটি মন্ত্রণালয় ও একটি উদ্বাস্তু পূনর্বাসন টাস্ক ফোর্স গঠন করে, তাতে উপজাতীয়দের করা হয়েছে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান। অনেককে দেয়া হয়েছে উপমন্ত্রী ও প্রতি মন্ত্রীর মর্যাদা। মোটা বেতন ভাতা আর দামী গাড়ী-বাড়ী তাদের প্রাপ্য হয়েছে।

আশা করা গিয়েছিলঃ এই অনুগৃহীত নেতারা অতঃপর কৃতজ্ঞতা ও শালীনতায় অভ্যস্ত, আর বিদ্রোহী আচার আচরণ ও উগ্রতা পরিত্যাগে উদ্বুদ্ধ হবেন। ফিরে আসবেন স্বাভাবিক ও ভদ্র জীবনযাপনে। অবসান হবে অশান্তি, হানাহানি, হিংসা ও বৈরিতার। কিন্তু সকলই গরল ভেল। নতুন করে সৃষ্টি হয়েছে প্রচন্ড সন্ত্রাস ও অরাজকতার। এই পরিস্থিতি আরো অধিক উপজাতীয় তোষণ, অশান্তি ও অসন্তোষকে মদদ দিচ্ছে।

সব পাওয়ার সূত্র বৈরিতা নয়। সব পাওয়া ঝটপট এক সাথে হয় না। পূর্ণতা অর্জন সময় ও ধৈর্যসাপেক্ষ। তজ্জন্য দেশ ও জাতিকে স্বপক্ষে টানতে হবে। উপজাতীয় সমাজে এই কৌশলের প্রচন্ড অভাব আছে। বাঙালী প্রধান এই দেশে বাঙালী বিতাড়ন আন্দোলন, আর ক্ষমতাসীন সরকারকে হেনস্তা করা, উপজাতীয় রাজনীতির সঠিক কৌশলরূপে মান্য হতে পারে না। সন্তু লারমা তাদের ভূল নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সচেতন উপজাতীয়দের এই ভূল শুধরাতে এগিয়ে আসার প্রয়োজন আছে।

সরকারে উপজাতীয়দের অনেক বন্ধু আছেন। সবাইকে বৈরী ভাবা ভুল। এভাবে বৈরী করার দায়-দায়িত্ব তাদের নিজেদেরই উপর বর্তাবে।

২৫. সময়ের হাতে মীমাংসার ভার ছেড়ে দেয়া সংগত নয়

(সূত্র: দৈনিক ইনকিলাব ৩১ জানুয়ারী ২০০৪)

আঞ্চলিক পরিষদ কার্যত স্বায়ত্তশাসণ ভোগ করছে। যে কারণে এই সংস্থার প্রধান সন্তু লারমা সরকারকে বিভিন্ন দাবীতে চ্যালেঞ্জ করেন ও হুমকি দেন। যে স্বায়ত্তশাসনের মঞ্জুরী পার্বত্য চুক্তিতে নেই। পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ মূলত সরকার সৃষ্ট একটি মোসাহের সংস্থা। এর ভিত্তি সাংবিধানিক নয়, সরকারের নির্বাহী আদেশ। দেশ সাংবিধানিক এককেন্দ্রিক হওয়াতে রাজনৈতিকভাবে আঞ্চলিকতার স্বীকৃতি আইনসঙ্গত নয়। তাই স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগের ব্যাপারটিও অবৈধ। রাজনৈতিক অঞ্চলরূপে স্বীকৃতি ছাড়া স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগযোগ্য হয় না। পার্বত্য চট্টগ্রাম একটি অরাজনৈতিক অঞ্চল হওয়াতে, তথভিত্তিক আঞ্চলিক পরিষদ ও তার চেয়ারম্যানের মর্যাদা নিতান্তই মোসাহিবের। সরকারের বিরুদ্ধে তার সমালোচনা, বিরোধিতা ও হুমকিদানকে অবাধ্যতা বলা যায়। প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদা সম্পন্ন রাষ্ট্রীয় ফ্লেগধারী এরূপ অবাধ্য ব্যক্তিত্বের সহাবস্থান সরকারের ভিতর থাকা অনভিপ্রেত। এই ভিন্নতা আইনত সংস্থানযোগ্য নয়। অনুগত স্বপক্ষদের সমন্বয়ে সরকার গঠন ও পরিচালনাই বিধি সঙ্গত। সরকারের ভিতর আঞ্চলিক পরিষদের সহাবস্থান ও স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা ভোগ আইনত সংস্থানহীন। পার্বত্য চুক্তিতে আঞ্চলিক পরিষদের স্বীকৃতি আছে। এর প্রধান ব্যক্তি তাই সঙ্গতভাবেই বিপুল ক্ষমতার অধিকারী। কার্যত তার অবাধ্যতা আর ঔদ্ধত্য সমর্থনযোগ্য নয়। রাজনৈতিক স্বার্থে তাকে পালন-পোষণ করা যায়, তবে রাষ্ট্রীয় ফ্লেগ আর মন্ত্রী পদ কোন অবাধ্যের প্রাপ্য নয়। এগুলো বর্জন আবশ্যক।

সরকার কি আরেক বিদ্রোহের ভয় করছেন। তাই সন্তু লারমাকে মোটা বেতন ভাতা, আলিশান গাড়ী বাড়ী আর উচুঁ পদমর্যাদা দিয়ে ধরে রেখেছেন। কিন্তু সরকারী ছত্রছায়ায় আর উদারতার আড়ালে ঔদ্ধত্য প্রদর্শণ অবাঞ্ছিত। লড়াই, খুনোখুনি, বিপক্ষ দমন, সশস্ত্র তৎপরতা, অস্ত্র উদ্ধার ও ক্যাম্প দখলের খবর প্রচার মাধ্যমে প্রায়ই স্থান পাচ্ছে। সন্তু লারমাকে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী প্রকাশ্যে বেষ্টন করে থাকে। বাঙালী আর সরকার বাহিনীর সদস্যরা তাদের দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছেন না, এটা একান্তই কোন সুখবর বা বিদ্রোহ না ত্যাগের প্রমাণ নয়। গৃহশত্রুদের দমনে এখন তারা ব্যস্ত। তা থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেই পরিস্থিতি

ভয়াবহ রূপ নিতে পারে। সেদিনের অপেক্ষাই কি সরকার করছেন? সরকার কি ওয়াকিবহাল যে, উল্লেখযোগ্যসংখ্যক উপজাতীয় যুবক ট্রেনিং নিয়ে সশস্ত্র ও সংগঠিত হয়েছে এবং হচ্ছে। দিকে দিকে গভীর অরণ্য আর দূর্গম পাহাড়ে অস্ত্রভান্ডার গড়ে উঠেছে ও উঠছে। তাদের ঘোষিত রাজনৈতিক লক্ষ্য 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার' অর্জন। সময় থাকতে সরকারকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, এতদঞ্চল নিয়ে কি করবেন। সন্তু বাবুরা সশস্ত্র উৎপাতের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ কামনায় উৎসাহী বলেই মনে হয়। এছাড়া তাদের অস্ত্রসজ্জার আর কোন মানে হয় না। তারা যুদ্ধ জয়ের কোন আশা করে না। যুদ্ধে তারা পরাজিত হবে, এটা নিশ্চিত। তবুও মনে হয় যেন তারা যুদ্ধই করতে প্রস্তুত হচ্ছে। হতাহত, ধ্বংস আর জাতিগত বিপর্যয়কে পুঁজি করে, তারা আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে চায়। তাদের এবারের রণপ্রস্তুতির লক্ষ্য এটা বলেই অনুমান করা যায়। সশস্ত্র কার্যক্রম শুরুর লক্ষ্যে তারা ১৯৭৫ সালে তাই করেছিলেন। সন্তু লারমা ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন ঃ প্রয়োজনে পূর্ব কর্মসূচীতে ফিরে যাবেন। দামী গাড়ী-বাড়ী, মোটা বেতন ভাতা, উচ্চ পদমর্যাদা আর চুক্তি দফাগুলোর পূরণ তাকে সন্তুষ্ট, অনুগত ও শান্ত করতে পারবে, এমন আশাবাদ সন্দেহজনক। তার প্রধান দাবী বাঙালী অপসারণ আর উপজাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা। অথচ এমনটি হওয়া বাংলাদেশের পক্ষে আত্মঘাতী। একটি সম্ভাব্য আপোষ রফায় এ নিয়ে সংলাপের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। হয়তো তা থেকে মীমাংসার সূত্র বেরিয়ে আসা সম্ভব। সময়ের হাতে মীমাংসার ভার ছেড়ে দেয়া আর সময় কাটানো যথার্থ কাজ নয়।

বসে না থেকে একটা কিছু করা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রাম এখন বিস্ফোরণোন্মুখ। সন্তু লারমা একজন শক্ত চরিত্রের সাংগঠনিক ক্ষমতাধর প্রধান উপজাতীয় নেতা। তাকে বশ করার সূত্র খুঁজতে নিযুক্ত হওয়া উচিত। আলোচনায় নানা বিকল্পের প্রস্তাব দিতে হবে।

তাতে আলোচ্য হবেঃ

ক) চুক্তি বাস্তবায়নের বিপক্ষে সাংবিধানিক বাধা অপসারণের সম্ভাবনা যাচাই এবং চুক্তি মুখবন্ধের অঙ্গীকার পালনে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা।

খ) সাংবিধানিক বিধি ব্যবস্থার আওতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলকে, একটি ডিভিশনে উন্নয়ন পূর্বক, ৫৯ অনুচ্ছেদের ব্যবস্থা অনুসারে বিভাগীয় আঞ্চলিক পরিষদ গঠন ও তার ক্ষমতার বিন্যাস সাধন। দেশভিত্তিক প্রতিষ্ঠিতব্য অনুরূপ বিভাগীয় আর জেলা পরিষদসমূহের আইন ও বিধি ব্যবস্থায় সঙ্গতি বিধান করা।

গ) সাংবিধানিক স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার আওতায় কোন এক ধরণের স্বায়ত্ত শাসন ক্ষমতার সংস্থান নিয়ে যাচাই-বাছাই করাও সিদ্ধান্তে পৌঁছা।

ঘ) বাঙালী-অবাঙালী উভয় সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার পক্ষে করণীয় নির্ধারণ। বর্তমান সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার সম অনুপাতকে স্থির রাখার সম্ভাবনা যাচাই।

ঙ) শীর্ষ পদসমূহ, প্রতিনিধিত্ব মূলক বারি ভিত্তিতে পাহাড়ী ও বাঙালীদের মাঝে

বন্টনের নমিনেশনভিত্তিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। তাতে সব প্রতিনিধিত্বমূলক শীর্ষ পদ, সমকালে একক কোন সম্প্রদায়ের প্রাপ্য হবে না।

চ) বর্তমান কোটা পদ্ধতি ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা রহিত করা। তবে মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে চাকুরি ও প্রার্থী বাছাই ব্যবস্থা চালু করা। সাময়িক পশ্চাৎপদদের জন্য পৃষ্ঠপোষকতা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা।

ছ) বাংলাদেশী সনদই হবে স্থায়ী বাসিন্দা সনদ ও ভোটাধিকার লাভের ভিত্তি। এই সনদ দান হবে স্থানীয় প্রশাসনিক দায়িত্ব।

জ) বাংলাদেশ সংবিধানই হবে একমাত্র মান্য সর্ব্বোচ আইন। তদভিন্ন সকল আঞ্চলিক ও প্রচলিত আইন ও প্রথা রহিত হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলোর ব্যাপারে সমঝোতায় পৌঁছা গেলে সকল নেতৃস্থানীয়দের স্বাক্ষরে সরকারের সাথে আরেকটি অতিরিক্ত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। তারপক্ষে স্থানীয়ভাবে গণভোট হলে তা হবে তৃণমূল ভিত্তিক আরো শক্ত ব্যবস্থা।

এটা আমার একটি মীমাংসা প্রস্তাব। এটিকে আলাচনার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। এতে উভয় পাক্ষিক দাবী ও আপত্তিসমূহ অন্তর্ভুক্ত আছে।

২৬. গুচ্ছ গ্রামবাসী বাঙ্গালীদের জিম্মিদশা

১৯৮৬ সালে এরশাদ আমলে স্থানীয় উপজাতি ও বাঙ্গালীদের পারস্পরিক হানাহানি প্রায় গৃহযুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। এতো ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা সরকারী বাহিনীগুলোর পক্ষে সামাল দেয়া অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। ঐ বিশৃঙ্খল অবস্থায় মারমুখী উপজাতি ও বাঙ্গালীদের নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের আওতায় উঠিয়ে এনে, অস্থায়ীভাবে গড়ে তোলা গুচ্ছ গ্রামসমূহে পুনর্বাসিত করা হয়। তবে উপজাতিদের কোন গুচ্ছ গ্রামেই ধরে রাখা যায়নি। তারা ক্রমে ক্রমে সীমান্তের এপারে-ওপারে সরে পড়ে, শরণার্থীর জীবন শুরু করে। কিন্তু বাঙ্গালী গুচ্ছ গ্রামবাসীরা হয়ে পড়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে জিম্মি। ১০-১৫ হাত জায়গার ভিতর একটি অস্থায়ী কুঁড়ে ঘর ও কিছু ফ্রি রেশনই হয়ে পড়ে তাদের জীবন ও জীবিকার অবলম্বন। সেই ১৯৮৬ সালে শুরু হওয়া অস্থায়ী গুচ্ছ গ্রামের বসবাস এখন পর্যন্ত তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। গত দীর্ঘ বছরে মূল আঠাশ হাজার গুচ্ছ গ্রামবাসী বাঙ্গালী পরিবার বেড়ে এখন অন্তত পঞ্চাশ হাজারাধিক পরিবারে পরিণত হয়েছে। সেই আগের দেড় লাখ গুচ্ছ গ্রামবাসী জনসংখ্যা এখন কমপক্ষে আড়াই লাখের কম নয়। পরিবার বেড়েছে, কিন্তু গৃহসংস্থানের জায়গা বাড়েনি। সেই আগের এক ঝুপড়িতেই বাপ-বেটার পৃথক সংসার আর গৃহপালিত পশু-পাখি একসঙ্গে গাদাগাদি করে বসবাস করছে। পেশাব-পায়খানা, গোবর-চোনা ইত্যাদি ময়লা-আবর্জনাসহ মানুষের এক সাথে সহাবস্থান। রেশন কার্ড আগে যা ছিলো, এখনো তাই আছে। বাড়তি লোকজনের কোন খাদ্য সংস্থান নেই। কাজ নেই, কৃষি সংস্থান নেই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবা অনুপস্থিত। বাড়তি প্রায় এক লাখ লোক মূল পরিবারের বোঝা হয়ে আছে। এদের নিজ মূল জায়গা জমিতে ফিরতেও দেয়া হচ্ছে না। অজুহাত- শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা। বলা হচ্ছে, জায়গাগুলো নিষ্কন্টক ও নির্বিরোধ নয়। উপজাতীয়রা তার দাবীদার। তজ্জন্য তাদের হামলে পড়া সম্ভব।

এদিকে অধিকাংশ ফ্রি রেশন কার্ড বেহাত হয়ে গেছে। মহাজনরূপী সচ্ছল সুযোগ সন্ধানীরা অভাবী, অসুবিধা গ্রস্ত, রোগ-শোকে অসহায় এই লোকদের রেশন কার্ডগুলো হাওলাত কর্জ আর বন্ধকের নামে হাতিয়ে নিয়েছে। তারাই এখন ফ্রি রেশন গ্রহীতা। রেশন নেই, জমি নেই, রুজি-রোজগারও নেই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থা অনুপস্থিত, অসহায় ও দারিদ্র্যে জর্জরিত এই গুচ্ছ গ্রামবাসীরা এখন নিরুপায়। তাদের এই মানবেতর জিম্মিদশার কোন প্রতিকারও লক্ষণীয় নয়। তাদের কোন আশাভরসা আর ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাও কল্পনীয়

নয়। এরূপ বাঁচা-মরার প্রশ্নে তাদের মাঝে কোন আন্দোলন আর আলোড়নও নেই। এই প্রশ্নে সরকার, দেশ ও জাতি সবাই নীরব। বিষয়টি দুঃখজনক। তবে আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে এ লোকজনের ভোটগুলো পাওয়ার প্রয়োজন হবে। সেই প্রয়োজনেই রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীরা, সপক্ষের বা বিপক্ষের ব্যর্থ প্রতিশ্রুতির মিঠাকথা নিয়ে হাজির হবেন এবং তাতে আবার এই বঞ্চিত ভোটাররা আরেক দফা মিথ্যা আশায় আশান্বিত হবার সুযোগ পাবেন। দল আর প্রার্থীরা তো সেই আগের তারাই, যারা জয়ী হয়েছেন, ক্ষমতা ভোগ করেছেন, কিন্তু এই অভাগা ভোটারদের ভাগ্যের পরিবর্তনে তারা কেউ উল্লেখযোগ্য কিছু করেননি। একথা বলে ঐ ক্ষমতাশালীদের বিরাগভাজন হওয়ারও সাহস এই হতভাগ্যদের নেই। এরা ভোটার হিসেবেও জিম্মি। উদাহরণ রূপে বলা যায় -দীঘিনালা উপজেলার গুচ্ছগ্রাম কবাখালী জামতলী, রসিক নগর, বোয়ালখালী, পাবলাখালী, সোহানপুর ইত্যাদি এলাকার ৯৪৫টি গুচ্ছগ্রামবাসী পরিবারের মধ্যে ৫১২টি পরিবারেরই কোন রেশন কার্ড ও গৃহসংস্থান নেই। বাকি ৪৩২টি পরিবারের ২২২টি কার্ডই হাতছাড়া। তারা তাদের মূল রেশন কার্ড ও গৃহ সংস্থানধারী বাপ-দাদাদের উপর বোঝা। এই পাড়াগুলোর অনেক রেশন কার্ড স্থানীয় মহাজন, মাতবর, দোকানদার, ফড়িয়া ইত্যাদি সুযোগ সন্ধানী লোভী লোকদের হাতে বন্ধক অথবা ঋণের দায়ে আটক আছে। এখন ঐ ফ্রি রেশন ওরাই খায়। ফ্রি রেশনের মূল্যে কবে ঐ ঋণ বা বন্ধকীয় দায় শোধ হয়ে গেছে, তবু ঐ রেশন কার্ডগুলো মুক্তহয়নি। ঋণ আর বন্ধকও বহাল আছে। মাতবর ও মহাজন চরিত্রের লোকেরা রেশন কার্ড হাতিয়ে নিয়ে বহুদিন যাবৎ ফ্রি রেশন ভোগ করছে। বর্ণিত ৭৩ জন কার্ড শিকারীদের ৩১ জনই হিন্দু, ২২ জন বড়ুয়া, আর ২০ জন মুসলমান। ব্যবসা, চাকুরি কৃষি ইত্যাদি পেশায় তাদের সবাই জড়িত। তাদের অনেকের পাকা বাড়ীঘর, দোকান ও কৃষি খামার আছে। পরিবারের কোন কোন সদস্য দেশে-বিদেশে বিভিন্ন পেশায়ও নিয়োজিত। আদি পুরাতন বাসিন্দা হওয়ার সুবাদে উপজাতীয়দের সাথেও তাদের সম্পর্ক ভালো। তবে ভুক্তভোগী সেটেলারদের বক্তব্যে প্রকাশ- শতকরা পঞ্চাশ থেকে ষাট ভাগ রেশন কার্ডই অসেটেলার মহাজন শ্রেণীর লোকেরা হাতিয়ে নিয়ে আটকে রেখেছে। প্রতি মাসে তারাই ঐ ফ্রি রেশন তুলেও ভোগ করে। এই অপ্রিয় বিষয়টি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অজানা নয়। তবে কতৃপক্ষ এ নিয়ে ঘাটাঘাটি করেন না। তাদের এই নীরবতা রহস্যজনক। ইচ্ছা করলে রেশন উঠাবার সময় ঐ বেআইনী রেশন কার্ডধারীদের পাকড়াও করা যায় এবং ঐ কার্ডগুলো জব্দ করে তা মূল মালিকদের ফিরিয়ে দেয়াও সম্ভব। কিন্তু কে এই ঝামেলা করে? সেটেলাররা অসংগঠিত, অসচেতন। দিন রাত ভাত কাপড়ের চাহিদা মিটাতে প্রাণান্তকর ভাবে ব্যস্ত। সরকারী কর্তৃপক্ষেরও গায়ে পড়ে ঝামেলা বাড়াবার তাগিদ ও ফুরসৎ নেই। সুতরাং বিনা বাধায় এই ফ্রি রেশনের লুটপাট চলছে। গুচ্ছ গ্রামবাসী সেটেলাররাও ধুঁকে ধুঁকে কালাতিপাত করছে। এই রেশন লোপাট ও পুনর্বাসন সংকট একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। এর সুরাহা হবে কিনা কেউ জানে না।

এই প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়ায় খাগড়াছড়ির জেলাপ্রশাসক বর্নীত রেশন কার্ড গুলো জব্দ করে নিয়েছেন। তাতেও ভূক্ত ভোগিরা উদ্বিগ্ন।

বিষয়টি সাংবিধানিক মৌলিক অধিকার, মৌলিক চাহিদা ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনের এক গুরুতর ব্যাপার। কিন্তু কে এই অভিযোগের পক্ষে সক্রিয় হয়? এ ব্যাপারে কারো যেন কোন দায় নেই। প্রশাসন, গোয়েন্দা সংস্থা, আইন ও বিচার বিভাগ, মানবাধিকার সংস্থা এবং আইনজীবী/পেশাজীবীদের সবাই আনুষ্ঠানিকভাবে অভিযোগ উত্থাপিত হোক সে অপেক্ষায় আছেন। আর ভুক্তভোগী নেংটি বাঙ্গালীরাও আশা করছে; কর্তৃপক্ষীয়ভাবে একটা কিছু সুরাহা নিশ্চয় হবে। এই অপেক্ষার পালা কখন শেষ হবে, তা কেউ বলতে পারে না।

পাহাড়ীরাও বিভ্রান্ত। নেতৃপর্যায় থেকে তাদের বুঝান হচ্ছে, এই গোটা পর্বতাঞ্চল আদিকাল থেকেই তাদের দখলভুক্ত ভূমি। এখানে বাঙ্গালী আবাসন গড়াই হলো উপজাতীয় দখলাধিকার হরণ। এটি অব্যাহত থাকলে তদ্বারা ধীরে ধীরে পাহাড়ীরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হবে। তারা বাঙ্গালী সংখ্যাধিক্যের মাঝে হারিয়ে যাবে। তখন নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করাই হবে দায়। তাই উপজাতীয় আধিপত্য রক্ষার আন্দোলন, তাদের বাঁচামরারই আন্দোলন। এর কোন বিকল্প নেই। বাঙ্গালী গ্রহণ মানে উপজাতিদের আত্মহত্যা। বাঙ্গালী আবাসন প্রতিরোধ আন্দোলনকে জোরদার ও ভয়ংকর করার উপায় হলো সশস্ত্র প্রতিরোধ। তাছাড়া ক্ষুদ্র নিরীহ এই পাহাড়ী জাতির দাবীর প্রতি সমর্থন আদায় সম্ভব নয়।

পাহাড়ী সমাজে এই প্রচারণা এ পর্যন্ত সফল হয়েছে। এর প্রথম সুফল হলো- পুরাতন বিধি ব্যবস্থাসহ উপজাতীয় শাসন বহাল আছে। দ্বিতীয় সুফল হলো, উপজাতি শাসিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ গঠিত হয়েছ এবং রাষ্ট্রীয় মন্ত্রী পরিষদেও ভাগ লাভ নিশ্চিত হয়েছে। এবং শেষ সুফল হলো বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ স্রোত থেমে গেছে।

বিপরীতে রাষ্ট্র ও বাঙ্গালী পক্ষের যুক্তি প্রদর্শন ও জনমত গঠনের প্রবণতা একেবারে অনুপস্থিত। এ পক্ষের যুক্তি হতে পারে, বাংলাদেশ পাহাড়ী বাঙ্গালী সবার জাতীয় স্বদেশভূমি। এখানে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীগত আধিপত্য স্বীকার করা মানে বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দেয়া। একদেশ ও একজাতি হয়ে থাকার উপায় হলো সহিষ্ণুতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। সমানাধিকার, মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার সবার প্রাপ্য। ক্ষুদ্র ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর সমান পর্যায়ে উন্নয়ন না ঘটা পর্যন্ত, তাদের অগ্রাধিকারের মেয়াদ ভিত্তিক বিশেষ সুযোগ দানের মঞ্জুরি, বাংলাদেশ সংবিধানের বিধান নং- ২৮(৪) ধারায় সন্নিবেশিত আছে। তার আওতায় ব্যবস্থা গ্রহণে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই সাংবিধানিক ব্যবস্থায় দেশ ও জাতিকে উদ্বুদ্ধ করাই উপজাতীয় রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত। এর বিপরীতে সশস্ত্র বিদ্রোহ হলো চরম হটকারিতা। শান্তি-শৃঙ্খলা ও অখণ্ডতা রক্ষার প্রয়োজনে এই হটকারিতা দমন রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। এর বিকল্প হলো অস্ত্র ত্যাগ, বাড়াবাড়ি পরিহার, শান্তি অবলম্বন ও আনুগত্য। রাষ্ট্রের পক্ষেও কঠোরতা বর্জনীয়। তবে উপজাতীয় বাড়াবাড়ির বড় জবাব হলো তারা এ দেশের আদি ও স্থায়ী বাসিন্দা নয়, বহিরাগত শরনার্থী বংশধর। এ কারণে বৃটিশ আমলে তাদের ভোটাধিকার ছিলো না।

২৭. পার্বত্য বাঙ্গালী বনাম পাহাড়ী জনগোষ্ঠীর রাষ্ট্রীয় জীবন

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এই তিন জাতি রাষ্ট্রের জন্ম ইতিহাসই এই উপমহাদেশে আরো আঞ্চলিক ও ক্ষুদ্র জাতি স্বাতন্ত্র্যের উৎসাহ ভিত্তি। সম্প্রদায়গত উত্তেজনার মুহুর্তে ১৯৪৭ সালে রেড ক্লিফ সাহেবের হাতেই অবাঙ্গালী অমুসলিম অঞ্চল পার্বত্য চট্টগ্রাম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। আর তখনই উত্থিত হয় স্থানীয় উপজাতীয় প্রতিবাদ, যার পরিণতি হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তাদের বিদ্রোহ। এটা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধাচারণও বটে। এই বিরুদ্ধাচারণের উৎপত্তির মূল ক্ষেত্র হলো ১৮৬০ সালে উপজাতীয় অঞ্চল নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা গঠন। অথচ তখন এটিকে বাঙ্গালী প্রধান জেলায় পরিণত করা সম্ভব ছিল। তাতে বাংলাদেশকে আজ উপজাতীয় বিদ্রোহের মোকাবেলা করতে হতো না। সেই বিভক্তিকালে পার্বত্য অঞ্চলের সংলগ্ন ফটিকছড়ি, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও রামু উপজেলার পূর্বাঞ্চলকে নতুন জেলার সাথে সংযুক্ত করা হলে অথবা গোটা চট্টগ্রাম পূর্ব-পশ্চিমে অথবা কর্ণফুলী বা শঙ্খের সীমারেখায় বিভক্ত করা হলে, জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক ভারসাম্যের সৃষ্টি হতো। তাই বলা যায় আজকের জাতিগত ও সাম্প্রদায়িক সংঘাত ও সংঘর্ষের কারণ ঐ অতীতের উপজাতি গরিষ্ট জেলাকরণ ও সুবিধাদান তথা বাঙ্গালীদের বিপরীতে পাহাড়ীদের মেরুকরণ।

মূলত বাঙ্গালী অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে বাংলাদেশ গঠিত। দেশের ৫০ হাজার বর্গমাইলের ওপর এই সত্য প্রযোজ্য। অবশিষ্ট ৫ হাজার বর্গমাইল হলো এর ব্যতিক্রম, যেখানে বাঙ্গালীরা সংখ্যালঘু। উপজাতীয় অঞ্চলের আনুগত্য লাভ, এই বাঙ্গালী রাষ্ট্রের পক্ষে প্রশ্নসাপেক্ষ। সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিদ্রোহের দ্বারা এটা একাধিকবার প্রমাণিত হয়েছে। ১৭২৪ সালে উপজাতীয় সামন্ত জালাল খান মোগল সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। ১৭৭৬-৮৬ আমলে চাকমা সর্দার শের দৌলৎ খান ও তদীয় পুত্র জান বখশ খান বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের জন্মলগ্নে চাকমা ও মগেরা ঐ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলো। ১৯৭২ সালে শিশু বাংলাদেশের বিরুদ্ধেও তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটায়, যা ১৯৯৭ সালে চুক্তি ও আপোষ রফার মাধ্যমে অস্ত্রত্যাগ ও আত্মসমর্পণের ধারায় দমিত হয়। পূর্ববর্তী তিন বিদ্রোহ সামরিকভাবে দমানো হলেও বাংলাদেশ আমলের বিদ্রোহটি সামরিক জয়ের মাধ্যমে নির্মূল করা হয়নি।

দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয় বিদ্রোহ একটি ধারাবাহিক আশংকার বিষয়।

তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়ার কোন উপায় নেই। সুযোগ-সুবিধা ও উন্নয়নে এখন এই অঞ্চল বাংলাদেশের সমপর্যায়ভুক্ত, কোন কোন ক্ষেত্রে বেশি উন্নত। শিক্ষা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এই অঞ্চল এখন আর পশ্চাদপদ নয়। তবু ক্ষোভ-অসন্তোষের সুরাহা হচ্ছে না। রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূরণই এখন উপজাতীয় নেতৃমহলের লক্ষ্য। আঞ্চলিক পরিষদ, জেলা পরিষদ, জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা পর্যন্ত পদ ও ক্ষমতা লাভ করেও তারা সন্তুষ্ট নন। আরো বড় রাজনৈতিক লক্ষ্য উদ্দেশ্যই তাদের কাম্য বলে অনুমান করা যায়, যা বাংলাদেশ ভাঙ্গা ও স্বতন্ত্র উপজাতীয় রাষ্ট্র গঠন ছাড়া সম্ভব নয়। ওই চূড়ান্ত পরিণতি থেকে বাংলাদেশকে বাঁচতে হবে। সুতরাং উপজাতীয় বিদ্রোহ আর বিচ্ছিন্নতা থেকে বাঁচার জন্য জাতীয় নেতা শেখ মুজিবই সংবিধানে বাংলাদেশকে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে রূপদান করে, দীঘি-নালা ও রুমায় সেনা ঘাঁটি স্থাপনের আদেশ দিয়েছিলেন। তৎপর প্রেসিডেন্ট জিয়া ভূমিহীন বাঙ্গালীদের আবাসন গড়ার আদেশ দেন, যাতে দুর্গম জঙ্গলাকীর্ণ ও জনবিরল পার্বত্য চট্টগ্রাম বিদ্রোহীদের অপতৎপরতা ও আত্মগোপন থেকে আবাদ হয়ে মুক্ত হয়। এই পরিস্থিতিতে উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা প্রদর্শনের প্রয়োজন ছিলো বিদ্রোহ ত্যাগ, আনুগত্য প্রদর্শন ও নিজেদের সংখ্যা প্রাধান্য রক্ষায় সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা। বিপরীতে সংঘাত ও বিদ্রোহ জোরদারই হয়েছে। সুতরাং উপজাতিদের সংখ্যাগতভাবে দুর্বল করার লক্ষ্য অর্জনে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন ছাড়া সরকারের হাতে আর কোন বিকল্প ছিল না। অতএব বলা যায়, উপজাতীয় বিদ্রোহেরই ফল বাঙ্গালী বসতি স্থাপন। এই বাঙ্গালীদের প্রতিষ্ঠিত করার মাঝেই ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উপজাতীয় বিদ্রোহের প্রতিকার নিহিত। এটা উপজাতি দমন নয়, দেশ রক্ষা ব্যবস্থা।

এখন সরকারের নীতি হওয়া উচিত উপজাতিদের সুযোগ-সুবিধা দান ও পার্বত্য অঞ্চলের উন্নয়ন এবং বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদেরও পূর্ন নাগরিক সুবিধা মঞ্জুর। পাহাড়ী-বাঙ্গালী উভয়ে মিলে এক জাতি, এই অনুভূতিতে এগিয়ে যেতে হবে। কারো প্রতি বৈষম্য আর অবিচার আরোপনীয় নয়। পার্বত্য চুক্তি সংবিধানের আওতাভুক্ত বলে ঘোষিত হওয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হওয়া যুক্তিসঙ্গত নয়। অনুরূপ ত্রুটিগুলোর সংশোধন করা জরুরী।

পাহাড়ী ও বাঙ্গালীদের প্রতি সরকারীভাবে কিছু কিছু বৈষম্য ও অবিচার হচ্ছে, যা দুর্ভাগ্যজনক। সরকার প্রজ্ঞাপন জারি করে জমি বন্দোবস্ত বন্ধ রেখেছেন। শহর-বাজারে এই নিষেধাজ্ঞা পাহাড়ী বাঙ্গালী সবার প্রতি প্রযোজ্য। গ্রামাঞ্চলে এই নিষেধাজ্ঞা উভয়ের প্রতি প্রযোজ্য হলেও পার্বত্য শাসন আইনের ৫০ ধারা বলে উপজাতিদের বেলায় তা ৩০ শতক পর্যন্ত শিথিল। কার্যত এই নিষেধাজ্ঞা জনস্বার্থবিরোধী। পাহাড়ী-বাঙ্গালী উভয় সম্প্রদায়ই এই নিষেধাজ্ঞার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত। এটা সংবিধানের ৪২ ধারার গুরুতর লজ্ঞন, যা নাগরিকদের মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত বিষয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকারও এই অধিকার লজ্ঘনের বিরোধী। জমি-বাড়ি লাভ মানুষের মৌলিক চাহিদার বিষয়। সংবিধানের ১৫নং ধারা নাগরিকদের এই মৌলিক চাতিদা পূরণকে সরকারের দায়িত্ব বলে ঘোষণা করেছে।

এই সাংবিধানিক আইন লঙ্ঘন করা গুরুতর অন্যায়। ক্ষমতাসীনদের মাঝে এই অন্যায়বোধ না থাকা দুর্ভাগ্যজনক।

বাঙ্গালী বসতি স্থাপনকারীদের উপজাতীয় সন্ত্রাসীদের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে সরকার ২৮ হাজার পরিবারকে তাদের বাড়িঘর ও জমি-জমা থেকে তুলে নিয়ে, নিরাপত্তা ক্যাম্পসমূহের পাশে, একেকটি ঘরের জায়গায় মাত্র পুনর্বাসিত করেন। পার্বত্য অঞ্চলে এভাবে অসংখ্য বাঙ্গালী গুচ্ছগ্রাম গড়ে উঠেছে, যাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র সম্বল পরিবার প্রতি প্রদত্ত একটি ফ্রি রেশন কার্ড মাত্র। তাতে মাসিক বরাদ্দ ৮৫ কেজি ৭২ গ্রাম চাল অথবা গম। এ থেকে একটি কল্যাণ ফান্ডের জন্য ৫ কেজি কেটে রাখা হয়। গত বিশ বছরে বর্ণিত ২৮ হাজার পরিবার গুচ্ছ গ্রামবাসী ৫০ হাজার পরিবারের অধিক হয়ে গেছে। তাদের লোকসংখ্যাও দেড় লাখ থেকে বেড়ে প্রায় আড়াই লাখে পরিণত হয়েছে। কিন্তু বাড়েনি তাদের গৃহসংস্থান। সেই আগের ১০X১৫ হাতের জায়গাটিতে বাড়তি মানুষ ও পশু পাখি একসঙ্গে গাদাগাদি করে থাকে। রেশন কার্ডের সংখ্যাও বাড়েনি। অনাহার, অর্ধাহার, অশিক্ষা, অচিকিৎসার এক মানবেতর জীবনযাপনে তারা আবদ্ধ। পাহাড়ের এই বস্তিবাসী, শহরের বস্তিবাসীদেরও অধম। এদের কোন কর্মসংস্থানও নেই। গুচ্ছগ্রামবাসী রেশন কার্ডধারীদের ৫০% প্রায় অভাব, অসুবিধা রোগে-শোকে নিজেদের রেশন কার্ড হয় বন্ধক দিয়ে আর ফেরত নিতে পারেনি অথবা বিক্রি করে দিয়েছে। এখন ওই ফ্রি রেশন ভোগ করছে স্থানীয় ভাগ্যবান দোকানী, মহাজন, ফড়িয়া ও মাতবর লোকেরা। গঠিত কল্যাণ তহবিলেরও হর্তাকর্তা তারা। স্থানীয় উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে গঠিত কল্যাণ তহবিল পরিচালনা কমিটিতে ১৫/২০ জন স্থানীয় গণ্যমান্য লোকের ভেতর প্রকৃত কোন তহবিল মালিক নেই বললেই চলে। এ তহবিলে একেক উপজেলায় প্রায় কোটি টাকার মত জমেছে। কিন্তু ভুক্তভোগীদের কল্যাণে তা মোটেও ব্যয়িত হচ্ছে না। ভুক্তভোগী, দুর্দশাগ্রস্ত লোকদের শিক্ষা, চিকিৎসা, আবাসন ইত্যাদি কাজে আজ পর্যন্ত একটি টাকাও ব্যয়িত হয়নি। তহবিল পরিচালকরা বড় বড় আশার বাণী শুনিয়ে কেবল বৃথা সান্ত্বনাই দেন। সন্দেহ হয়, সুযোগমত ঐ তহবিল পরিচালকরা একমত হয়ে ওই টাকাগুলো ভাগ করে খাবেন। মিল-কারখানা গড়ে তুললেও তাতে তাদেরই লাভ হবে। সমবায় বা সরকারী পরিচালনায় আজ পর্যন্ত কোন মিল-কারখানাই লাভজনক হয়নি।

পার্বত্য বাঙ্গালীরা দুর্দশা-দুর্ভোগের শিকার। তারা সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার এবং জাতিসংঘ ঘোষিত মানবাধিকার থেকেও বঞ্চিত। পার্বত্য চুক্তির বলে উপজাতিরা সংবিধান প্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা থেকে অধিক পাচ্ছে। পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ও পার্বত্য শাসন আইনে সংবিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। বাঙ্গালীরা মৌলিক অধিকারের প্রশ্নে অবিচার ও বৈষম্যের শিকার। সরকার ও প্রশাসন তাদের কোণঠাসা করে রেখেছে। বাঙ্গালীরা সুবিচার পাচ্ছে না। এই পরিস্থিতিতে তাদের একমাত্র করণীয় হলো সুপ্রীমকোর্টের কাছে বিচারপ্রার্থী হওয়া। সুপ্রিমকোর্ট একমাত্র কর্তৃপক্ষ যে সংবিধান প্রদত্ত মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার রক্ষায় সরকারকে বাধ্য করতে পারে।

পার্বত্য বাঙ্গালীদের মাঝে শিক্ষিত, সচেতন, বিত্তশালী লোকের অভাব। তবু তাদের দ্বারা সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ সুপ্রিমকোর্টে বেশ কিছু মামলা দায়ের হয়েছে ও তা বিচারাধীন আছে। ওই মামলাগুলোর প্রায় সবই সংশ্লিষ্ট আইনজীবীদের নিষ্ক্রিয়তা, তদবিরের অভাব এবং খরচ যোগানোর অসুবিধায় এগুচ্ছে না। বসতি স্থাপনকারী বাঙ্গালীদের কল্যাণ তহবিল থেকেও এই মামলা সংক্রান্ত ব্যয় সংকুলান করা যেতো। কিন্তু তহবিল পরিচালনা কমিটি তৎপ্রতি অনীহ। এটি কি কারুনের ধন যে, মূল মালিক শুধু জমিয়েই যাবে এবং পরে লুটেপুটে খাবে ওঁৎ পেতে থাকা সুযোগসন্ধানী লোভীরা।

ঠিক একই ঘটনার শিকার ত্রিপুরা ফেরত উপজাতীয় শরণার্থীরা ও। তাদের খয়রাতী রেশন থেকেও একাংশ কল্যাণ তহবিলে জমা হচ্ছে। অনুমান তার পরিমাণ হবে কয়েক কোটি টাকা। কিন্তু টাকাগুলো কি কোন কল্যাণ কাজে ব্যয় হচ্ছে বা হবে? এই প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

২৮. সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও পাহাড়ীদের রণপ্রস্তুতি ইত্যাদি

ভাল হোক, মন্দ হোক পূর্ববর্তী আওয়ামী সরকার পর্যন্ত পর্বত নিয়ে ত্বরিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এখন যেন এই প্রক্রিয়া থেমে গেছে। উপজাতীয় তোষণ আর দেখি কি হয়, এই অপেক্ষায়, দ্বিতীয় আরেক বিদ্রোহের দ্বারপ্রান্তে দেশ। জেএসএস আর ইউপিডিএফ এর মধ্যে রীতিমতো যুদ্ধ চলছে। রোজ লোকজন আটক আর হতাহত হচ্ছে। ধরা পড়ছে প্রচুর অস্ত্র আর গোলাবারুদ। উদঘাটিত হচ্ছে সন্ত্রাসী ঘাটি। তবু হুশ নেই এর পরিণতি নিয়ে। এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিতে ইউএনডিপি উন্নয়নের নামে গোপন বৈঠক করছে বিদ্রোহী নেতা সন্তু লারমার সাথে। এ কি কেবল উন্নয়নের জন্য নেতাকে বাগে আনার চেষ্টা? উন্নয়নের জন্য ইউএনডিপি'র এত কি দায়?

এটা সঠিক নয়, সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের নামে কিছু অকাজ ও করছেন। চুক্তির মুখবন্ধের অঙ্গীকার অনুসারে সাংবিধানিক আইন রক্ষাটা ও চুক্তিভূক্ত দায়িত্ব। চুক্তি বাস্ত বায়নের সাথে অসাংবিধানিক ব্যবস্থাদি রহিতকরণে তো বাধা নেই। উপজাতীয় পক্ষে মন্ত্রী ও চেয়ারম্যান পদ সংরক্ষণ এবং বিভিন্ন সুযোগ সুবিধামুলক অগ্রাধিকার দান, খোদ সংবিধানই যদি অনুমোদন না করে এবং তা ঐ সর্বোচ্চ আইনের সাথে অসমঞ্জস হওয়া হেতু বাতিল হয়ে যায়, তাতে সরকারের দোষ হবে কেন? এঁও তো চুক্তির অঙ্গীকার পালনমূলক অন্যতম দায়িত্ব। এটি দোষ হলে হবে চুক্তিকারী জেএস এস ও আওয়ামী পক্ষের। সরকার সার্বিকভাবে চুক্তি বাস্তবায়নের চাপের মুখে, সাংবিধানিক কাজটি সহজভাবে করে নিতে পারেন। সমালোচিত বা আক্রান্ত হলে, চুক্তির মুখবন্ধটা তুলে ধরাই হবে অকাট্য জবাব। এতো বড় অস্ত্র হাতে থাকতে সরকার অযথাই ভয় পাচ্ছেন। সরকার কি খবর রাখেন যে, চুক্তিকারী সরকারের আমলে আরব্ধ চুক্তি বহির্ভূত কিছু বাড়াবাড়ির অনুসরণ এখনো চলছে। এটি এক অপ্রিয় রহস্য। জানতে পারলে সবাই থত মত খেয়ে যাবেন। ঘঁটনাটি ঘটেছে প্রশাসনিক পর্যায়ে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মোট ভৌগোলিক আয়তন ৫০৯৩ বর্গমাইল। কিন্তু এর সবটাই বসতি অঞ্চল নয়। পার্বত্য শাসন আইন হিল্ট্রাক্টস ম্যানুয়েল এটিকে ৫টি সার্কেলে বিভক্ত করেছে। সংরক্ষিত বনাঞ্চল মৌজাভূক্ত নয়, যা বন আইনে শাসিত হয়। এর সাথে আরো কিছু এলাকাও যুক্ত। যথা ঃ ১. শিল্পাঞ্চল, ২. অধিগ্রহণকৃত কর্ণফুলী হৃদ ও অন্যান্য জায়গা জমি, ৩. বন আইন ৭ (২) ১৮৬৫ মূলে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় বনাঞ্চল ৪. আবগারি আইনে পরিচালিত পাহাড় ও খনিজ এলাকা ৫. নদী, জলা, খাস ও সরকারী দফতর এলাকা, ৬. প্রকৌশল স্বার্থসংশ্লিষ্ট এলাকা, ৭. সড়ক, আকাশপথ ও প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট অঞ্চল। চুক্তিতে এসবের সংস্থান নেই, এগুলো চুক্তিমুক্ত জাতীয় অঞ্চল। জনসংহতি সমিতির পাঁচ-দফা দাবীভূক্ত ২ (৫-ক) ও ২ (৫-খ) মতে, গোটা পার্বত্য চট্টগ্রাম বিরোধীয় অঞ্চল নয়। পার্বত্য চুক্তি দফা নং খ./ ২৬ ও পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন নং- ৬৪ অনুসারে ও জেলা পরিষদের আওতামুক্ত একটি পৃথক জাতীয় অঞ্চল স্বীকৃত। পৃথক জাতীয় অঞ্চলটি কি করে জেলা পরিষদের অন্তর্ভূক্ত হলো? এঁটা কি চুক্তি লঙ্ঘনমূলক বাড়াবাড়ি নয়?

দ্বিতীয় কথাঃ বাংলাদেশ সাংবিধানিকভাবে একটি ইউনিটারি রাষ্ট্র। রাজনৈতিক ভাবে সারাদেশ একটি অখন্ড ইউনিট। ফেডারেল রাষ্ট্রের মতো এটি বিভিন্ন আঞ্চলিক খন্ডে বিভক্ত নয়। পাঁচদফা দাবীনামা সংশোধন করে জনসংহতি সমিতি এই ফেডারেল ধারণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে ত্যাগও কওেছে। সংবিধান অনুসারে এখন কেবল প্রশাসনিক ইউনিটসমূহেই স্থানীয় শাসন পরিষদ গঠিত হতে পারে। সুতরাং সাংবিধানিক ধারা নং ১, ৯ ও ৫৯ বর্হির্ভূত, আইনী সংস্থানহীন আঞ্চলিক পরিষদের বৈধতা কোথায়? এটি না কোন প্রদেশ, না কোন প্রশাসনিক অঞ্চল। এর টিকে থাকার ভিত্তি কেবল নির্বাহী আদেশ, যা অনির্দিষ্টকাল মান্য নয়। যদি এটি স্থানীয় শাসনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানরূপে গণ্য হয়ে থাকে, তাহলে তা স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়য়ের অধীন নয় কেন? আঞ্চলিক পরিষদ চেয়ারম্যান সন্তু লারমা,

স্বায়ত্তশাসিত প্রাদেশিক সরকার প্রধানের মতো কেন্দ্রীয় সরকারকে অবাধে হেনস্তা করে থাকেন এবং সরকারও তা চুপচাপ সহ্য করেন? কী করে তিনি নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী পোষন করেন এবং তারা প্রকাশ্যে সশস্ত্র থাকে? তাহলে কি আরেকটি গোপন চুক্তি আছে, যা জাতি ও দেশের অজ্ঞাত? মনে হয় 'ডাল মে কুচ কালা হ্যায়' । এর রহস্যটা কি? জাতি এসব জানার অধিকার অবশ্যই রাখে । জবাবদিহিতা কি কেবল কথার কথা ? আশ্চর্যজনক ঘটনাঃ ইউএনডিপি'র মতো একটি প্রতিষ্ঠান যেটি ২০০১ সালে নিজেদের অপহৃত তিন কর্মীর কারণে বাধ্য হয়ে এদেশ ত্যাগ করেছিল । তারা সম্প্রতি কাজের জন্য উদগ্রীব । সংস্থাটি এলজিআরডি মন্ত্রী আবদুল মান্নান ভূইয়ার কাছে দাবী করেছেঃ পার্বত্য চুক্তিকে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে । আর মন্ত্রী সাহেবের উত্তর হলোঃ পার্বত্য চুক্তি পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়িত হচ্ছে ও হবে । প্রশ্ন রাজনৈতিক, আর উত্তর ধামাধরা । এ ক্ষেত্রে বলা উচিত ছিলোঃ চুক্তির কতিপয় ধারা বাংলাদেশ সংবিধানের দ্বারা বাধাগ্রস্ত এবং সংবিধান অনুসরণের অঙ্গীকার চুক্তির মুখবন্ধে স্পষ্ট । সুতরাং সরকার উভয়পাক্ষিক ঐকমত্য আর সংবিধান লঙঘনে অক্ষম । এ কারণেই চুক্তিকারী আওয়ামী সরকার চুক্তিভূক্ত অসাংবিধানিক ধারা সমূহ বাস্তবায়ন থেকে বিরত ছিলেন । বর্তমান জোট সরকারও তা থেকে বিরত । এখন এই সংকটটি সমাধানের উপায় চুক্তি অথবা সংবিধান সংশোধন । সংবিধান সংশোধন জাতীয় সম্মতির সাথে জড়িত । জাতীয় জনমত গঠন অনেক কঠিন ও সময়সাপেক্ষ । জাতি যতক্ষন না উপজাতীয় রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার ব্যাপারে সন্দেহমুক্ত হবে, ততদিন এ প্রশ্নটা ঝুলে থাকতে বাধ্য । এর চেয়ে সহজ হলোঃ চুক্তি মুখবন্ধের অঙ্গীকারের ভিত্তিতেই উপজাতীয় পক্ষ থেকে ছাড় প্রদান । এঁটাই বিরোধ মীমাংসার সহজ উপায় । এই কঠিন রাজনৈতিক বিরোধটি অনাকাঙ্খিত । এঁটা বাংলাদেশ পক্ষের সৃষ্টি নয় । এঁটাকে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত করাও অনুচিত । বিষয়টি আমাদের আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক ব্যাপারও বটে, যা মীমাংসার পক্ষে চেষ্টার ত্রুটি নেই । চুক্তি পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলেও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন নিশ্চয়তাও নেই । এ ব্যাপারে উপজাতীয় কার্যক্রম সন্দেহ জনক ।

মনে হয়, এবারের মিশনে ইউএনডিপি সন্তু লারমাকে নিজেদের আস্থাধীন করতেই আগ্রহী । ২০ মিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন কতটুকু হবে, তা বলা কঠিন হলেও এর বিরাট অংশ দাতাদের নিযুক্ত কর্মকর্তা কর্মচারী পোষন কাজেই ব্যয়িত হবে, তা নিশ্চিত । এটা প্রকারান্তরে দাতাপক্ষের লোকদের কর্মসংস্থান এবং স্থানীয় পাহাড়ীদের পৃষ্ঠপোষনও বটে । বাঙালীরা এ থেকে ছিটেফোটা পাবে মাত্র ।

ইউএনডিপি যে পুনরায় অপহরণ ও সন্ত্রাসের শিকার হবে না তাও অনিশ্চিত । চুক্তি সম্পাদনের পর গত বছরগুলো ধরে উপজাতীয়রা সন্ত্রাস, অপহরণ, খুনোখুনি ইত্যাদি অপকর্ম একটানা চালিয়ে যাচ্ছে । অথচ চুক্তি অনুসারেই তাদের স্বাভাবিক শান্ত জীবনাযাপন শুরু করার কথা । কিন্তু তা হয়নি । সরকার সহজ বাস্তবায়নযোগ্য চুক্তি দফাগুলো তৎক্ষনাৎ পর্যায়ক্রমে ও সাংবিধানিকভাবে বাস্তবায়নে আন্তরিকতার সাথে সচেষ্ট । উপজাতীয় পক্ষে অনুরূপ আন্তরিক সদিচ্ছা প্রদর্শিত হচ্ছে না । সন্ত্রাস আর বিদ্রোহ ত্যাগের সদিচ্ছা জ্ঞাপন

ও কার্যকর প্রমাণ উপস্থাপন ছাড়া, সরকারকে বিভিন্ন দাবীর প্রশ্নে আগাম বাধ্য করার চেষ্টা শান্তি স্থাপনের গ্যারান্টি নয়। অশান্তি জিইয়ে রাখতে উপজাতীয় পক্ষে অজুহাতের অভাব নেই। ইউএনডিপিভূক্ত এক বাঙ্গালী অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেলের প্রতি সন্তু বাবুরা ক্ষেপা। তাদের সন্দেহ, তিনি ইউএনডিপিকে উপজাতীয় স্বার্থবিরোধী গোয়েন্দা তথ্য ও পরামর্শ দিচ্ছেন। ইউএনডিপিতে শত শত উপজাতীয় থাকা সত্ত্বেও এই একজন মাত্র বাঙালীকেও তারা সহ্য করতে পারছে না। তাদের নারাজির আরেক কারণ হলোঃ ঐ কর্ণেল সাহেব নাকি মহালছড়ি ঘটনাভূক্ত ধর্ষণ অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন, ৬০ বছরের বুড়ির ধর্ষিত হওয়া অবিশ্বাস্য। এটি রুচিসিদ্ধ নয় যে ঘটতে পারে।

ইউএনডিপি'র বিরুদ্ধে আরো অভিযোগ উঠছেঃ তারা গ্রামাঞ্চলে রুটি, বিস্কুট, গম, গুঁড়ো দুধ আর চকোলেট বিলাচ্ছেন। ধানাই পানাই করে সময় কাটিয়ে দেয়া হচ্ছে এবং অজুহাত তুলছেন অশান্তিটাই উন্নয়নের পথে বাধা। আরো শোনা যাচ্ছে ঃ উপজাতীয় উন্নয়নই ইউএনডিপি'র মূল লক্ষ্য। সন্তু বাবুকে উপজাতীয় উন্নয়নের নিশ্চয়তা দেয়ার পরেও, তারা তার সহযোগিতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান। তাই তার কাছে বারবার ধরনা দেয়া হচ্ছে। এবার তাকে উল্লেখযোগ্য পরিমান নগদেরও টোপ দেয়া হয়েছে। আশ্বস্ত করা হয়েছেঃ ইউএনডিপি আদিবাসী ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের বিরোধী নয়। জে এসএস অনুকূলে পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলে তার বাস্তবায়নে ইউএনডিপি সহায়কের ভূমিকা পালন করবে, যেমনটি করেছে বসনিয়া ও পূর্ব তিমুরে। জাতিগত উৎপীড়ণ রোধ, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা, ও পূনর্গঠনে দাতাগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে ইউএনডিপি সর্বদা এবং সর্বত্র তৎপর। বিশৃঙ্খল রাজনৈতিক পরিস্থিতি দাতাদের কাছে মনিটার করা ও তাদের দায়িত্ব। সুতরাং ইউএনডিপিকে স্থানীয় উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত থেকেই এখানে টিকে থাকতে হবে। এঁটা উপজাতীয় স্বার্থের অনুকূল।

সরকার বেখবরঃ আরেকটি উপজাতীয় বিদ্রোহ সংগঠিত হওয়ার পথে। এখন জেএসএস গৃহশত্রু বিভীষনদের দমাতে ব্যস্ত। এই বিরোধ ও সংঘাতের মীমাংসা হলেই, পার্বত্য বাঙালীদের ওপর তারা একটি মরণ কামড় দেবে। এর পাল্টা প্রত্যাঘাতই তারা কামনা করে, যাতে বৃহৎ শক্তিগুলোর পক্ষে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। তখন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠা হবে অবশ্যম্ভাবী। পূর্ব তিমুর আর বসনিয়া এর উদাহরণ।

২৯. অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ঃ ভূষণছড়া গণতহ্যা -১

রাজনৈতিক ও সাম্প্রদায়িক বৈরীতার কারণে পৃথিবীতে অনেক নৃশংস ঘটনা ঘটেছে এবং ইতিহাসে তার স্থান ও হয়েছে। অসভ্য বর্বর যুগের মত ঘটনাগুলো আধুনিককালেও বিচার্য হচ্ছে না। প্রাচীন ভারতীয় সম্রাট অশোক, যুদ্ধের নৃশংসতায় গভীর মর্মাহত হয়ে, অহিংস বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে আজীবন যুদ্ধ পরিহার সহ রাজ্য শাসন করেছিলেন। এটা একটা অনন্য মানবতাবাদী নজির। তৎপর মধ্যযুগে ইসলামী সভ্যতার শুরুতে যুদ্ধাভিযানকালে খলিফার পক্ষ থেকে সেনাপতিদের উপদেশ দেয়া হতোঃ নিরস্ত্র সাধারণ লোককে যেন হত্যা করা না হয়। শিশু, বৃদ্ধ, রোগী ও স্ত্রীলোকেরা যেন আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। ফল ফসল ও ধর্মস্থান যেন ধ্বংস না হয়। অযথা গণহত্যা করা যাবে না।

বৌদ্ধ ধর্মের পঞ্চ মূলনীতির প্রথমটি হলোঃ প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি গ্রহণ করা। ইসলাম ধর্মেরও মূলনীতি হলোঃ অযথা প্রাণী হত্যা হারাম বা নিষিদ্ধ। বিকশিত সভ্যযুগের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষে, জেনেভা কনভেনশনের মাধ্যমে, নিরপরাধ নিরস্ত্র লোকজনকে নির্বিচারেও দলবদ্ধভাবে হত্যা করাকে দন্ডনীয় যুদ্ধাপরাধ রূপে ঘোষণা করা হয়েছে। সে থেকে জাতিসংঘের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনেল গঠন করে, যুদ্ধাপরাধের বিচার হচ্ছে। অভিযুক্ত যুদ্ধাপরাধী রাষ্ট্র প্রধান সেনা প্রধান ও সরকার প্রধানদেরও রেহাই দেয়া হচ্ছে না। বসনিয়ায় অনুষ্ঠিত গণত্যার জন্য, সাবেক যুগস্লাভ রাষ্ট্র প্রধান মিঃ স্লাবদান মিলোসেভিচ বর্তমানে বন্দি ও বিচারাধীন আছেন। কম্বডিয়ার সাবেক সরকার প্রধান পলপটের গণহত্যার বিচারটি ও প্রক্রিয়াধীন আছে। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধকালীন অনুষ্ঠিত গণহত্যারও বিচার হোক, এটা একটি চলমান দাবী, এবং সাথে সাথে এ দাবীটিও উত্থিত হচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে দু দশকের অধিক কাল ধরে, বিদ্রোহী পার্বত্য জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী, যে নৃশংস গণহত্যা চালিয়েছে, তারও বিচার অনুষ্ঠিত হোক। এই গণহত্যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো ১৯৮৪ সালের ৩১ মে তারিখে অনুষ্ঠিত ভূষণছড়া গণহত্যা, ও ১৯৯৬ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে সংঘটিত পাক্যুয়াখালি গণহত্যা। ভূষণছড়ায় একই অর্ধ রাত্রি সময় কালে হত্যা করা হয়েছে তিন শতাধিক নারী, পুরুষ, বৃদ্ধ, যুবা ও শিশুকে। তাদের গণ কবরগুলো এখনো ঘোষণা করছে ঃ ঘটনাটি অবশ্যই মর্মান্তিক ও বিচার্য যুদ্ধাপরাধ।

পাক্যুয়া খালিতে আলোচনা বৈঠকের জন্য আহুত ৩৫ জন যুবকের উপর অতর্কিতে শান্তিবাহিনী সদস্যরা আক্রমণ করে। একজন মাত্র আত্মরক্ষা ও পালাতে সক্ষম হয়।

তারই খবর ও পথ প্রদর্শনে পরের দিন ২৮টি লাশ উদ্ধার করে আনা হয়। অবশিষ্ট ৬ জন অদ্যাবধি নিখোঁজ আছে। লংগদু সদরে ঐ লাশগুলো সারি বেঁধে একই গণ কবরে শায়িত। পানছড়ির ৯ জন শহীদের লাশ রাজধানী ঢাকা পর্যন্ত সফর করেছে। বাকি প্রায় ত্রিশ হাজার নিহতের লাশ, বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্তভাবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। অধিকাংশের দাফন কাফন পর্যন্ত কপালে জুটেনি। বেওয়ারিশ ও নিখোঁজ লাশ হিসেবে শিয়াল কুকুরের খোরাক হয়ে, কেবল কংকাল রূপে পাহাড় ও বনে পড়ে আছে। এই নৃশংসতা বিনা বিচারে পার পেয়ে গেলে, এটি অপরাধ ও দন্ডনীয় কুকর্ম বলে, নজির স্থাপিত হবে না। এটা হবে আরেক নিন্দনীয় ইতিহাস। দেশে সামরিক শাসন ও সংবাদ প্রচারের উপর সেনসার ব্যবস্থা আরোপিত থাকায় এবং পাহাড় অভ্যন্তরে যাতায়াত ও অবস্থান সহজ আর নিরাপদ না হওয়ায়, অধিকাংশ গণহত্যা ও নিপীড়ন, খবর হয়ে পত্র পত্রিকায় স্থান পায়নি। তবু অসমর্থিত ছিটেফোটা তথ্যের ভিত্তিতে মানবাধিকার সংগঠনগুলো, যে হিসাব প্রকাশ করেছে, তাতে জানা যায়, উপজাতীয় বিদ্রোহীদের হাতে নিহতের সংখ্যা প্রায় ৩০,০০০। এটা আঁতকে উঠার মত বড় ঘটনা। দুঃখজনক ব্যাপার হলোঃ এতদাঞ্চলে কর্মরত আর্মি, বি,ডি,আর, পুলিশ ও সিভিল প্রশাসন, প্রতিটি নৃশংস ঘটনাকে তদন্ত ও তদারক করেছেন। তবে তথ্য প্রচার ও সংরক্ষণের ব্যাপারে তাদের মুখে কুলুপ আঁটা। প্রতিপক্ষ উপজাতীয়রা তিলকে তাল করে নিজেদের পক্ষে প্রচার চালিয়েছে। তাদের বিপক্ষে নৃশংসতার প্রচার হয়নি। এতে দুনিয়াব্যাপী এক তরফা ধারণা জন্মেছে যে, পার্বত্য উপজাতিরা সত্যই নির্যাতনের শিকার।

কর্তৃপক্ষীয় ধামাচাপা ও দমনকে অবজ্ঞা করে, নির্যাতিত বাঙালীরা, কিছু কিছু ক্ষেত্রে, ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং পাল্টা কিছু ঘটায়। অনুরূপ ঘটনাবলী থেকে তাদেরকে বিরত রাখার পক্ষে দমন পীড়ন যথেষ্ট বিবেচিত না হওয়ায়, কিছু কিছু ক্ষেত্রে তাদের প্রতি খয়রাতি অনুগ্রহ বিতরণও করা হয়েছে। পাক্যুয়াখালির নিহতদের উদ্ধারকৃত ২৮টি লাশ এক শোকাবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ পরায়নতার উদ্ভব ঘটায়। কঠোরতার মাধ্যমে তা দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হলে, বাঙালীরা আরো ক্ষেপে যাবে, এই বিবেচনায়, উপস্থিত কয়েকজন মন্ত্রী, ও উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বাঙালীদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন ও নিহতদের পরিবার প্রতি পঞ্চাশ হাজার করে টাকার ক্ষতিপূরণ দান ঘোষণা করেন এবং উপস্থিত নিহতদের দাফন কাফনের ব্যবস্থা করা হয়। পরে বিএনপির পক্ষ থেকেও টাকা পাঁচ হাজার করে অনুদানের ঘোষণা আসে। আওয়ামী সরকার ও বিএনপি দলের মঞ্জুরকৃত এই সান্ত্বনামূলক ব্যবস্থা, আপাততঃ বাঙালীদের ধৈর্য ধারণে উদ্বুদ্ধ করে। তবে অনুরূপ কোন সান্ত্বনামূলক ব্যবস্থা অন্যান্য নিহতদের বেলায় গৃহীত হয়নি। অথচ ভূষনছড়া গণহত্যা পরিদর্শনে প্রেসিডেন্ট এরশাদ স্বয়ং সরেজমিনে উপস্থিত ছিলেন। ওসি, ডিসি, এস,পি, বিগ্রেডিয়ার, কমিশনার, ডি আই জি, জিওসি ইত্যাদি কর্মকর্তারাও হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। কিন্তু সবাই তৎপর ছিলেন ঘটনাটি চাপা দিতে ও লাশ লুকাতে। কয়েকদিন যাবৎ একটানা গণকবর রচনার প্রক্রিয়া চলেছে। তজ্জন্য জীবিত সেটেলারদের আহার

নিদ্রা ও বিশ্রামের ফুরসত ছিলো না। গর্তে গর্তে গণকবর রচনা করে, একেক সাথে ৩০/৪০টি লাশকে চাপা দেয়া হয়েছে। এভাবে লোকালয়গুলো পঁচা লাশ ও দুর্গন্ধ থেকে মুক্ত হলেও, পাহাড় ও বনে অবস্থিত বিক্ষিপ্ত লাশগুলো দাফন কাফনহীন অবস্থায় পচতে থাকে, ও শিয়াল কুকুরের খাদ্য হয়। দুর্গত পরিবারগুলো পোড়া ভিটায় খাদ্য ও আচ্ছাদনহীন দিনযাপনে বাধ্য হয়। তাদের সবাইকে পরিবার প্রতি বরাদ্দকৃত তিন একর পাহাড়ী জমি থেকে, নিরাপত্তার অজুহাতে তুলে এনে, নদী তীরবর্তী নিরাপত্তা ক্যাম্প এলাকায়, বিশ শতক পরিমাণ আবাসিক ভিটাতে জড়ো করা হয়। এদের অনুদান ও ক্ষতিপূরণ সহ পুনর্বাসন প্রয়োজনীয় ছিলো। কিন্তু অদ্যাবধি এরা অবহেলিত। এই হত্যা ও অবহেলা অমানবিক আচরণ। আজ দীর্ঘ দিনের মাথায়ও দেখা যায়ঃ তাদের অধিকাংশ নিত্য আনে নিত্য খায়, এরূপ কায়িক মজুর। ঘরের আশেপাশে ফল ফসল ও তরিতরকারী উৎপাদন, বাঁশ, গাছ কাঁটা, মাছ ধরা, মজুর খাঁটা, ও ছোট খাটো বেপারই তাদের জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন। অথচ দেশ ও জাতির জন্য এদের ত্যাগ বিরাট। এই নেংটি ব্যালীরা আছে বলেই এই পর্বতাঞ্চল বাংলাদেশ হয়ে আছে। কেবল সৈন্য বলে এতদঞ্চালের বাংলাদেশ হয়ে থাকা অসম্ভব। এতদাঞ্চলের প্রতিরক্ষার অংশ বাঙালী বসতি স্থাপন। যে সরকার এখানে বাঙ্গালী বসতি স্থাপন করেছিল সে সরকারই পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়েছে। সেটেলার বাঙালীরা এই সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থক। তাকে ক্ষমতাসীন করার জন্য তারা ভোট দিয়েছে। তার সাফল্যে ও তাদের দাবীঃ সকল ক্ষেত্রে সমানাধিকার ও পৃষ্ঠপোষণ।

২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রসঙ্গক্রমে ভূষণছড়া গণহত্যার বিষয়টি আলেচিত হয়। তখন কিছু ভুক্তভোগী ভোটার নিজেদের ক্ষোভ দুঃখ নিয়ে সোচ্চার হোন। এই ক্ষোভ দুঃখ স্থানীয় সহ জাতীয় পত্র পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করে। আলোচনার বিষয়টি ছিলো অত্যন্ত মর্মান্তিক। তাতে সাংবাদিক ও মানবতাবাদী মহলে সঙ্গতভাবেই দুঃখবোধ সমবেদনা ও প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। তারা তথ্য প্রচারের অতীত অপারগতার ক্ষতি পূরণে এগিয়ে আসেন। বিষয়টি নিয়ে তথ্যানুসন্ধান পরিচালিত হয়। বেরিয়ে আসে তিন শতাধিক নিহতের নাম, ধাম, পরিচয়, ঘটনার নৃশংসতা, ও বহু গণকবর। এসবই ৩১ মে ১৯৮৪ সালের এক অর্ধরাত্রের নৃশংসতার শিকার, যার হোতা হলো বিদ্রোহী সশস্ত্র সংগঠন শান্তিবাহিনী। ঘটনাস্থল বড়কল থানাধীন ভূষণছড়া নামক ইউনিয়ন ও তার পার্শ্ববর্তী বাঙালী সেটেলার অধ্যুষিত এলাকা। তাদের অপরাধ হলোঃ তারা বহিরাগত সেটেলার বাঙালী। সরকারী প্ররোচনায় তারা এতদাঞ্চলে এসে পার্বত্য জায়গা জমিতে ভাগ বসিয়েছে, যে জায়গা জমির অধিকাংশ খাস হলেও, আগে ছিলো একচেটিয়া উপজাতীয় নিয়ন্ত্রণাধীন। এই সেটেলারদের দ্বিতীয় অপরাধ হলো তারা বাংলাদেশ আর্মির ঢাল, যারা বিদ্রোহী শান্তি বাহিনীর সশস্ত্র প্রতিপক্ষ। বাঙালী হত্যা ও তাড়ানো মানে আর্মিকে দুর্বল করা এবং বেকায়দায় ফেলা যার মানে, বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও অখন্ডতাকে হীনবল করে দেয়া। তখন জুম্যাল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসন, এমন কি স্বাধীনতা লাভও হবে সহজ। এই হলো উপজাতীয় নৃশংসতার মুল লক্ষ্য ও কারণ।

প্রত্যক্ষদর্শী ভুক্তভোগী, এতিম, ও বিধবাদের মৌখিক বর্ণনায় পাওয়া গেলো নিহতদের এক বিরাট তালিকা। তবে আগে পরে নিহত সব শহীদদের তালিকা আরো বিরাট। তা পেতে আরো অনুসন্ধানের দরকার। এখানে শুধু ৩১ মে ১৯৮৪ তারিখের ভূষণছড়াবাসী সেটেলার বাঙালী শহীদদের সংখ্যা হলো তিনশতের অধিক। তালিকা প্রস্তুত করার পর যাত্রা শুরু হলো গণকবর পরিদর্শনে। পাড়া, বন, পাহাড়, ও দূর দূরান্তে তা ছড়ানো ছিটানো। দুদিন পায়ে হেটে অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে তার কিছু কিছু দেখা হলো। লোকালয়ে অবস্থিত প্রধান দুটি গণকবরের অবস্থান হলো ভূষণছড়া ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রাঙ্গন ও প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গন। এখানে প্রথমটিতে এক সাথে ৩৮ জন শহীদ শায়িত আছেন এবং দ্বিতীয়টিতে আছেন ২৩ জন। বর্ণনা মতে বনে পাহাড়ে বহু কংকাল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, তা খুঁজে দেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য।

ভুক্তভোগীদের আহাজারিতে প্রকাশ পেলোঃ এ পর্যন্ত সান্ত্বনা মূলক কোন সরকারী অনুদান বা ক্ষতিপূরণ তাদের ভাগ্যে জুটেনি। অথচ হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত উপজাতীয় পাবলিকরা, প্রতিশোধ ও শাস্তির ভয়ে সীমান্ত পারে গিয়ে আত্মগোপন করায়, তাদের ফিরিয়ে এনে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। বাঙালীদের ধনমান ও প্রাণ গেলেও তাদের প্রতি সরকার সহ উপজাতি নিয়ন্ত্রিত জেলা পরিষদ ও আঞ্চলিক পরিষদ বিরূপ ও বিরাগভাজন।

কোন বড় যুদ্ধে কয়েক ঘন্টার ভিতর কোন একক পরিবেশে অত্যন্ত নৃশংসভাবে এত বিপুল সংখ্যক বেসামরিক সাধারণ লোককে কুপিয়ে পিটিয়ে গুলিতে ও আগুনে পুড়িয়ে মারার নজির ইতিহাসে বিরল। এ কাজটি শাস্তিযোগ্য ও আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত অপরাধ হলেও, এখানে তার কোন তত্ত্ব তালাস ও বিচার অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হচ্ছে না, এটা আশ্চর্যজনক। ঘটনাটি যারা ঘটিয়েছে তারা এবং ভুক্তভোগী মহলও চিহ্নিত। এ নিয়ে সে সময় বড়কল থানায় ডায়রীও করা হয়েছে। দেশের প্রেসিডেন্টসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই, ঘটনাগুলোর ভয়াবহতার প্রত্যক্ষদর্শী। এ ঘটনাগুলোর বিচার নিষিদ্ধ করে কোন ইনডেমনিটি আইনও জারি করা হয়নি। তবে দীর্ঘদিন পরে সম্পাদিত পার্বত্য চুক্তির দ্বারা সাধারণ ক্ষমা ঘোষিত হয়েছে, যা চিহ্নিত অপরাধীদের পক্ষে ছাড়পত্র বিশেষ। ভুক্তভোগী ও ফরিয়াদী নেংটি বাঙালীরা এই চুক্তি ও ক্ষমার তাৎপর্য সম্বন্ধে অজ্ঞ হলেও, গুণী ও জ্ঞানীজন বুঝেনঃ চুক্তি ও ক্ষমার সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার জড়িত নয়। এটা চীফ হুইপ আবুল হাসনাত আবদুল্লা ও পার্বত্য জনসংহিতি সমিতি প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার মধ্যকার সমঝোতা। এটাকে সরকারী চুক্তি ও ক্ষমা বলা নেহাত প্রতারণা।

হাসনাত আব্দুল্লা ছিলেন সরকার নিযুক্ত সংলাপ কমিটির আহবায়ক। তাকে চুক্তি সম্পাদনের আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব দেয়া হয়নি। সুতরাং এ ব্যাপারে সরকার সমূদয় দায় দায়িত্ব থেকে মুক্ত। ঘটনাটির নৃশংসতার অনুসন্ধান, তার দায় দায়িত্ব নিরূপন, তার বিচার অনুষ্ঠানে ট্রাইবুনেল গঠন ইত্যাদি, এবং দোষী বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পাকড়াও করতঃ ট্রাইবুনেলের নিকট সোপর্দ করতে, সরকারের পক্ষে কোন বাধা নেই। তবে এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে

বিরূপ রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া স্থানীয় উপজাতি সমাজে ও আন্তর্জাতিকভাবে ঘটা সম্ভব, এটাই সরকারের বিবেচ্য। এই সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সরকারের উপর অতিমাত্রিক ভাবে ক্রিয়াশীল। অথচ এটি আসলে আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত অপরাধ। দুনিয়াবাসী পক্ষপাত মূলক ভাবে জানেঃ পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতিরা নিরীহ আর নির্যাতিত। বিপরীতে তারাও যে গুরুতর অনেক নৃশংসতা ও অপরাধের হোতা, এ কথা বিচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে অবগত হলে, তারা ধিক্কার জানাতো অবশ্যই। বাংলাদেশ আর বাঙালীদের অনেকে বিপক্ষদের বিরুদ্ধে অনেক বাড়াবাড়ির জন্য দায়ী। তাদের অনেকে উচ্চ পদে ক্ষমতাসীন থাকাকালে, নিজেদের কু কর্মের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ হওয়ার আশংকায়, অনুরূপ বিচার অনুষ্ঠানের বিরোধী। তারা পক্ষে বিপক্ষে বিচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রভাব খাটাচ্ছেন।

আমাদের অভিমতঃ বিচার এক তরফা কাম্য নয়। দেশ ও বাঙালী পক্ষের অপরাধীদেরও রেহাই দেয়া উচিত হবে না। নির্যাতিত উপজাতিদের পক্ষেও রাষ্ট্রকে ব্যবস্থা নিতে হবে। তাদের অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখে, দায়ী ব্যক্তিদের বিচারের জন্য সোপর্দ করা আবশ্যক। সাধারণভাবে অভিযুক্ত পক্ষ হলোঃ জনসংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গ সংগঠন শান্তিবাহিনী। এই সংগঠন দুটির কারা গণহত্যার মত গুরুতর নৃশংসতার জন্য দায়ী, জীবিত ফরিয়াদীদের সাক্ষ্যে ও দলিল পত্রের মাধ্যমে তা নির্ণয় করা সম্ভব। সুশাসন, ন্যায় বিচার, ও শান্তি প্রতিষ্ঠার স্বার্থে, অপ্রিয় হলেও সরকারকে গণহত্যার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পরিশেষে আমাদের শেষ আবেদনঃ এখানকার বিপুল এতিম, বিধবা ও দুস্থদের প্রতি সরকার সদয় হোন।

বিদ্রোহী শান্তিবাহিনীর হাতে নিহতদের লাশের স্তুপ

৩০. অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ঃ ভূষণছাড়া গণহত্যা-২

স্থানীয় ভুক্তভোগী প্রত্যক্ষদর্শী মুরব্বীদের বর্ণনায় মর্মন্তুদ বর্ণনা পাওয়া গেলো। তারা জানালেন ৩০ মে তারিখ দিনের বেলায় খবর রটে যায় সামনের রাত্রেই শান্তিবাহিনী জ্বালাও পোড়াও মার দাঙ্গা শুরু করতে যাচ্ছে। আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু করার কিছু ছিলো না। বাঙ্গালীরা নিরস্ত্র। নিরাপদ আত্মগোপনের বা পালাবার জায়গাও নেই। বাড়ি ঘর ছেড়ে পাহাড় বনে লুকাতে গেলে, সেখানেও শান্তিবাহিনী ও বিদ্বিষ্ট পাহাড়ীরা ওৎ পেতে বসা। সরকারের পক্ষে শান্তিরক্ষী হিসেবে আছে কিছু ভি,ডি,পি সদস্য, আর্মি আর বিডিআর সৈনিক। তাও যথেষ্ট নয়। তাদের ক্যাম্প অনেক দূরে দূরে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সেটেলার বসতিগুলো পাহারা দেয়া ও নিরাপদ রাখা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং নিরূপায় আল্লাহ ভরসা, যা হবার হবে। এরূপ অনিশ্চয়তা ও ভয়ের ভিতরই নিজ নিজ বাড়ি ঘরে থাকতে হলো। সবার জানা মতে নদী তীরবর্তী সেটেলার বসতিগুলোর পিছনে সংলগ্ন পাহাড় ও বনে শান্তি বাহিনী ও তাদের দোসররা অবস্থিত। শালিশ বিচার ও চাঁদা দান উপলক্ষ্যে কোন কোন বাঙালীর সেখানে যাতায়াত ও কমান্ডার মেজর রাজেশের সাথে সাক্ষাত সম্পর্ক ছিলো। বিপদের আশংকায়, স্থানীয় সেটেলার বাঙালীদের পক্ষে, ঐ কমান্ডারের দয়া ভিক্ষা করে দু একজন লোক চেষ্টাও করেন। কিন্তু তা নিষ্ফল হয়।

এই ভয়াল রাতের প্রথম শহীদ হলো শেফালী বেগম নামের ২০ বছরের এক যুবতী, সে থমথমে অবস্থা অবলোকন ও প্রাকৃতিক কাজ সারার জন্য রাত আনুমানিক আটটায় ঘরের বাহির হয়েছিলো। সে জানতো না ইতিমধ্যে শান্তিবাহিনীর যাতায়াত ও সমাবেশ হওয়া শুরু হয়ে গেছে। সামনে পড়ে যাওয়ায় শেফালীকেই গুলিতে প্রথম প্রাণ দিতে হলো। কলা বন্যা, গোরস্থান, ভূষণছড়া, হরিনা হয়ে ঠেকামুখ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এই বিরাট এলাকা জুড়ে সন্ধ্যা থেকে আপতিত ভয়াল নিস্তব্ধতা। কুকুর শিয়ালের ও সাড়া নেই। আর্মি, বিডিআর, ভিডিপি সদস্যরাও ক্যাম্প-বন্দি। অতর্কিতে বাহির দিক থেকে রাত আটটায় ধ্বনিত হয়ে উঠলো, শেফালী হত্যার সাথে জড়িত ঐ গুলির শব্দটি। তৎপরই ঘটনাবলীর শুরু। চতুর্দিকে ঘর বাড়িতে আগুন লেলিহান হয়ে উঠতে লাগলো। উত্থিত হতে লাগলো আহত নিহত লোকের অনেক ভয়াল চিৎকার, এবং তৎসঙ্গে গুলির আওয়াজ, জ্বলন্ত গৃহের বাঁশ ফোটার শব্দ, আর আক্রমণকারীদের উল্লাস মুখর হ্রেসা ধ্বনি। এভাবে হত্যা, অগ্নিসংযোগ আর্তচীৎকার ও উল্লাসের ভিতর এক দীর্ঘ গজবী রাতের আগমন ও যাপনের শুরু। চিৎকার, আহাজারি ও মাতমের ভিতর রাতের পর সূর্যোদয়ে জেগে উঠলো

পর্য্যুদস্ত জনপদ। হতভাগ্য জীবিতরা আর্তনাদে ভরে তুললো গোটা পরিবেশ। অসংখ্য আহত ঘরে ও বাহিরে। লাশে লাশে ভরে আছে পোড়া ভিটা পথঘাট ও পাড়া। সবাই ভীত বিহ্বল। এতো লাশ এতো রক্ত আর এতো ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ, এক অর্ধরাতের ভিতর এলাকাটি বিরান। অদৃষ্ট পূর্ব নৃশংসতা। অভাবিত নিষ্ঠুরতা। ওয়ারলেসের মাধ্যমে এই ধ্বংসাত্মক দুর্ঘটনার কথা, স্থানীয় বিডিআর ও আর্মি কর্তৃপক্ষ উর্ধ্বমহলে অবহিত করেন। শুরু হয় কর্তৃপক্ষীয় দৌড়, ঝাপ, আগমন ও পরিদর্শন। চললো লাশ কবরস্থ করার পালা ও ঘটনা লোকানোর প্রক্রিয়া। ঘটনাটি যে কত ভয়াবহ, মর্মন্তুদ আর অমানবিক এবং শান্তি বাহিনী যে কত হিংস্র পাশবিক চরিত্র সম্পন্ন ও মানবতা বিরোধী সাম্প্রদায়িক সংগঠন, তা প্রচারের সুযোগটাও পরিহার করা হলো। খবর প্রচারের উপর জারি করা হলো নিষেধাজ্ঞা। ভাবা হলোঃ জাতীয় ভাবে ঘটনাটি বিক্ষোভ ও উৎপাতের সূচনা ঘটাবে। দেশ জুড়ে, উপজাতীয়রা হবে বিপন্ন।

ঘটনার ভয়াবহতা আর সরকারী নিষ্ক্রিয়তায়, ভীত সন্ত্রস্থ অনেক সেটেলারই স্থান ত্যাগ করে পালালো। পলাতকদের ঠেকাতে পথে ঘাটে, লঞ্চে গাড়িতে নৌকা সাম্পানে চললো তল্লাসী ও আটকের প্রক্রিয়া। তবু নিহত আর পলাতকরা মিলে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই হলো এই জনপদ থেকে লাপাত্তা। শুরু হলো জীবিতদের মাধ্যমে লাশ টানা ও কবরস্থ করার তুড়জুড়। খাবার নেই, পরার নেই, মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই, চারদিকে কেবল পঁচা লাশের দুর্গন্ধ। পালাবারও পথ নেই। নিরূপায় জীবিতরা। লাশ গোজানো ছাড়া করার কিছু নেই। দয়াপরবশ কর্তৃপক্ষ কিছু আর্থিক সহযোগিতায় এগিয়ে এলেন। এটাকে দয়া বলা ছাড়া উপায় কী? পেটে দিলে পিঠে সয়, এ যেন তাই। মুরব্বীদের মাঝে খুঁজে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী লোকদের খোঁজ পেলাম। ঐ লাশ উদ্ধার ও দাফনের সাথে জড়িত উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিরা হলেনঃ জনাব শামসুর রহমান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বরকল থানা, জয়নাল আবেদীন সাবেক চেয়ারম্যান ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, আব্দুল হামিদ মেম্বার, ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, কাসেম দেওয়ান আনসার / ভিডিপি কর্মকর্তা, আলি আজম প্লাটুন কমান্ডার, ভিডিপি, সাহেব আলী ভিডিপি সদস্য, শামসুল আলম পল্লী ডাক্তার ও ভিডিপি কমান্ডার মীর মোহাম্মদ আবু তাহের মেম্বার ভূষণছড়া ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওমর আলী পল্লী ডাক্তার, আঃ হক সরকার সেটেলার গ্রুপ লীডার, আঃ রাজ্জাক সেটেলার গ্রুপ লীডার ও অন্যান্য অনেক।

উপরোক্ত ব্যক্তিদের মাঝে জনাব শামসুল রহমান ও কাসেম দেওয়ান ছাড়া অন্যান্যরা পরেও সরেজমিনে ঘটনাস্থলে আছেন। তারা সবাই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বক্তা। তাদের বর্ণনাতেই নিহতদের নিম্নোক্ত তালিকা প্রস্তুত করা হলো।

১। নুরুল ইসলাম, পিং রহিম উদ্দিন — ১ জন
২। আবু বকর সিদ্দিক, পিং আঃ রব — ১ জন
৩। শাফিয়া খাতুন, পিং আঃ রব — ১ জন

৪। মধুমিয়া, পিং আঃ রহমান	১ জন
৫। ছাদেক আলী, পিং ইমান আলী	১ জন
৬। শহিদ উদ্দিন গং এক পরিবার	৬ জন
৭। আলতামাস, পিং এজাবুল বিশ্বাস গং এক পরিবার	৭ জন
৮। আঃ হান্নান গং এক পরিবার	৭ জন
৯। আজগর আলী গং এক পরিবার	৫ জন
১০। ফজলুর রহমানস গং এক পরিবার	৩ জন
১১। ওমর আলী গং এক পরিবার	৫ জন
১২। আইনুল হক গং এক পরিবার	৫ জন
১৩। রুস্তম আলী গং এক পরিবার	২ জন
১৪। জাকারিয়া গং এক পরিবার	৫ জন
১৫। ওমর আলী (২) গং এক পরিবার	৭ জন
১৬। আঃ শুক্কুর মুন্সি গং এক পরিবার	৫ জন
১৭। সাইফুদ্দিন গং এক পরিবার	৩ জন
১৮। গুল মোহাম্মদ গং এক পরিবার	৭ জন
১৯। আলী আকবর গং এক পরিবার	৩ জন
২০। মোঃ আলী গং এক পরিবার	৩ জন
২১। তোফানী শেখ গং এক পরিবার	৬ জন
২২। আব্দুস সোবহান গং এক পরিবার	৩ জন
২৩। নাসির উদ্দিন পিং ওমর আলী	১ জন
২৪। নিজাম উদ্দিন গং এক পরিবার	৩ জন
২৫। মোস্তফা গং এক পরিবার	৩ জন
২৬। ওমর আলী	১ জন
২৭। মোফাজ্জল হোসেন গং একপরিবার	২ জন
২৮। আব্দুল মোতালেব গং এক পরিবার	৩ জন
২৯। আসমত আলী মাল পিং আহাম্মদ আলী মাল	১ জন
৩০। খলিলুর রহমান, পিং আতাহার হাওলাদার	১ জন
৩১। নুরুল ইসলাম গং এক পরিবার	৩ জন
৩২। জামাল আহাম্মেদ পিং আব্দুল বারী	১ জন
৩৩। মোঃ ইউসুফ শেখ গং এক পরিবার	৫ জন
৩৪। আকবর আলী গং এক পরিবার	৪ জন
৩৫। শাহজাহান গং এক পরিবার	২ জন

৩৬। মোঃ সিদ্দিক মোল্লা পিং ইব্রাহিম মোল্লা	১ জন
৩৭। আসব আলী পিং নজব আলী	১ জন
৩৮। রজব আলী পিং অসিম উদ্দিন	১ জন
৩৯। রবিউল পিং সুন্দর আলী	১ জন
৪০। লোকমান পিং মোঃ আলী	১ জন
৪১। হোসেন ফরাজী পিং ওয়াজ উদ্দিন	১ জন
৪২। সিরাজউদ্দিন গং এক পরিবার	২ জন
৪৩। ওলি মন্ডল পিং হানিফ মন্ডল	১ জন
৪৪। আকলিমা পিং মালুখাঁ	১ জন
৪৫। আসিয়া খাতুন স্বামী আছর আলী	১ জন
৪৬। শামসুদ্দিন গং এক পরিবার	৬ জন
৪৭। কালু মিয়া গং এক পরিবার	২ জন
৪৮। জুছিনা বেগম স্বামী আব্দুল হামিদ	১ জন
৪৯। সিদ্দিক আহমদ গং এক পরিবার	৩ জন
৫০। মুসলেম গং এক পরিবার	৩ জন
৫১। আঃ রাজ্জাক গং এক পরিবার	২ জন
৫২। আঃ রাজ্জাক (২) গং এক পরিবার	৮ জন
৫৩। আঃ হামিদ গং এক পরিবার	৬ জন
৫৪। আঃ হাই গং এক পরিবার	৬ জন
৫৫। সকিনা বিবি গং এক পরিবার	৪ জন
৫৬। আঃ খালেক গং এক পরিবার	৬ জন
৫৭। বেলাল মুন্সি গং এক পরিবার	৬ জন
৫৮। আঃ রউফ গং এক পরিবার	৬ জন,
৫৯। নিজামউদ্দিন গং এক পরিবার	৪ জন
৬০। আইয়ুব আলী গং এক পরিবার	৪ জন
৬১। সুলেমান গং এক পরিবার	২ জন
৬২। আঃ মান্নান গং এক পরিবার	২ জন
৬৩। সুলতান ফরাজি গং এক পরিবার	২ জন
৬৪। নজরুল ইসলাম ও তার ছেলে	২ জন
৬৫। আঃ খালেক	১ জন
৬৬। মোঃ গুলজার ও তার ছেলে	২ জন
৬৭। দুগ্ধপোষ্য শিশু ও বৃদ্ধ, বৃদ্ধা আনুমানিক	১০০ জন

৬৮। ফতেআলী, সুবহান ও নুরুল ইসলাম	৩ জন
৬৯। জসিম উদ্দিন মেম্বারের পরিবার সদস্য	৩ জন
৭০। ইউপি চেয়ারম্যান জয়নাল আবেদিনের ছেলে	১ জন
সর্বমোট	**৩৭০ জন।**

ওয়ারলেসের খবরে ঘটনা অবগত হয়ে, স্থানীয় বিডিআর জোন কমান্ডার প্রথম পরিদর্শক হিসেবে সকাল ৭টায় ভূষণ ছড়া আসেন। তৎপর রাঙ্গামাটি থেকে আর্মির রিজিওন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার আনোয়ার সাহেব হেলিকপ্টার যোগে সকাল ৮-সাড়ে ৮টায় পৌঁছেন এবং তিনি গুরুতর আহত ৮৫ জনকে চট্টগ্রামের সি এম এইচে চিকিৎসার জন্য পাঠান। ঐ আহতদের নিম্নোক্ত ব্যক্তিরা এখনো জীবিত ও ঘটনার প্রত্যক্ষ সাক্ষী, যথাঃ ১, আঃ রব, পিং হাফেজ উদ্দিন, ২। ফিকি বেগম, স্বামী-মোফাজ্জল আলী, ৩। আঃ হাই, পিং একিন মিয়া, ৪। মোজাম্মেল আলী পিং পেশকার আলী, ৫। আবুল হাসেম, পিং-অজ্ঞাত, ৬। তারা বানু, স্বামী-মোজাম্মেল আলী, ৭। জামাল আহমেদ পিং-আস্রব আলী।

৩১ মে বুধবার ১৯৮৪ এর রাতের এই মর্মান্তিক ঘটনার দুঃসংবাদে তখনকার রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান প্রেসিডেন্ট এরশাদ, তিন দিন পর জুনের ৩ তারিখ শনিবার ভূষণছড়া আসেন। তখনো লাশ দাফন চলছিলো। ভূখা নাঙ্গা, আশ্রয়হীন দর্গতরা, তার আগমনে হাহাকারে ফেটে পড়ে। এই প্রথম তিনি কিছু অনুদান মঞ্জুর করেন এবং লোকদের মৌখিক সান্তনা দেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে এই হুঁশিয়ারী ও উচ্চারণ করেন যে, উপজাতীয়দের বিরুদ্ধে প্রতিশেধমূলক কিছু করা যাবে না। তাতে তারা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে, আমাদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করবে। উপদ্রুত উপজাতিরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আশ্রয় নিলে, আন্তর্জাতিকভাবেও বাংলাদেশের বদনাম হবে। বিষয়টি পার্বত্য সমস্যাকে আরো জটিল করবে। যারা মারা গেছে তাদের তো আর ফিরত পাওয়া যাবে না। তবে সমস্যাটির শান্তি পূর্ণ সমাধানে আমরা চেষ্টা করছি। এরূপ ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় তারও ব্যবস্থা নিচ্ছি। সবাই ধৈর্য্য ধরুন, এবং নতুন করে জীবন শুরু করুন। দুঃস্থদের খাওয়া পরা ও গৃহ নির্মাণের জন্য অনুদান দেয়া হবে। আপাততঃ নদী পারের নিরাপদ ক্যাম্প এলাকাই আপনাদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ করা হলো। পরে বাগান ও কৃষিযোগ্য জমির ব্যবস্থা করা হবে।

এ সবই হলো ক্ষমতাবাদী সান্ত্বনার বুলি। আজ বহু বছর পরও ঐ দুঃস্থ লোকেরা জমি পায়নি। তাদের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল মাদ্রাসা নেই। চিকিৎসা সেবার জন্য কোন হাসপাতাল স্থাপিত হয়নি। জীবন জীবিকা প্রায় শূণ্যের উপর চলে। এরা চরম দুর্দশাগ্রস্ত হতভাগ্য জনগোষ্ঠী।

৩১. মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ ঃ পাকুয়াখালি গণহত্যা

(তাং-রোববার ২১ ভাদ্র ১৪০৬ বাংলা ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ খ্রীঃ/দৈনিক গিরিদর্পণ, রাঙ্গামাটি)

পাকুয়াখালি গণহত্যার শোকাবহ স্মৃতি সম্বলিত দিন ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৯৬ খ্রীঃ। একদল নিরীহ বাঙ্গালী শ্রমজীবি লোককে বিনা কারণে নির্মমভাবে কুপিয়ে আর অঙ্গচ্ছেদ করে, অতি নৃশংসতার সাথে, শান্তিবাহিনী নামীয় উপজাতীয় সন্ত্রাসীরা জনমানবহীন গহিন অরণ্যের ভিতর হত্যা করেছে। এই নিরীহ লোকেরা সংখ্যায় ছিলো মোট ৩৫ জন। শ্রমই ছিলো তাদের জীবিকা নির্বাহের উপায়। রোজি রোজগারের সহজ বিকল্প অন্য কোন উপায় না থাকায় বনের গাছ বাঁশ আহরণেই তারা বাধ্য ছিলো।

বনই হলো সন্ত্রাসী শান্তি বাহিনীর আখড়া। জীবিকার তাগিদে ঐ হিংস্র সন্ত্রাসীদের সাথে শ্রমিকরা গোপন সমঝোতা গড়ে তুলতে বাধ্য হয়। তারা সন্ত্রাসীদের নিয়মিত চাঁদা ও আহরিত গাছ বাঁশের জন্য মোটা অংকের সালামী দিতো। অনেক সময় মজুরীর বিনিময়ে শান্তিবাহিনীর পক্ষেও গাছ বাঁশ কাটতো, এবং তা খরিদ বিক্রির কাজে মধ্যস্ততা করতো। ব্যবসায়ীরা ও তাদের মাধ্যমে শান্তি বাহিনীর সাথে যোগাযোগ ও লেনদেন সমাধা করতো। জীবিকার স্বার্থে তারা ছিলো রাজনীতিমুক্ত অসাম্প্রদায়িক। শান্তিবাহিনীর রেশন ঔষধ পণ্য ও লেনদেন সংক্রান্ত যোগাযোগ ও আদান প্রদান এদের মাধ্যমেই পরিচালিত হতো। ঐ বাহিনীর অনেক গোপন ক্যাম্পে তাদের প্রয়োজনে আনাগোনা এবং ওদের কোন কোন সদস্যের ও শ্রমিক ঠিকানায় যাতায়াত ছিলো। এই যোগাযোগের গোপনীয়তা উভয়পক্ষ থেকেই বিশ্বস্ততার সাথে পালন করা হতো। উভয় পক্ষই প্রয়োজন বশতঃ পরস্পরের প্রতি ছিলো বিশ্বস্ত ও আস্থাশীল। এরূপ আন্তরিক সম্পর্কের কারণে পরস্পরের মাঝে বৈঠক ও যোগাযোগ নিঃসন্দেহে ও স্বাভাবিকভাবে ঘটতো। এ হেতু ৯ সেপ্টেম্বরের আগে মাহাল্যা অঞ্চলের নিকটবর্তী পাকুয়াখালি এলাকায় শান্তিবাহিনীর সাথে বৈঠকের জন্য নিহত ব্যক্তিদের ডাকা হয়। আহুত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহেই তাতে সাড়া দেয় এবং বৈঠক স্থলে গিয়ে পৌঁছে।

ঘটনাস্থল পাকুয়াখালি হলো, মাহাল্যাবন বীটভূক্ত বেশ কিছু ভিতরে পূর্বদিকে গহিন বন ও পাহাড়ের ভিতর জনমানবহীন অঞ্চল। মাহাল্যাসহ এতদাঞ্চল হলো উত্তরের

বাঘাইছড়ি থানা এলাকা। আহুত লোকজন হলো দক্ষিণের ও নিকটবর্তী লংগদু থানা এলাকার বাসিন্দা। তাদের কিছু লোক হলো আদি স্থানীয় বাঙ্গালী আর অবশিষ্টরা হাল আমলের বসতি স্থাপনকারী। এই সময়কালটাও ছিলো শান্ত। স্থানীয়ভাবে কোন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও বিরোধ নিয়ে তখন কোন উত্তাপ উত্তেজনা ছিল না। এমন শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতিতে প্রতিশোধমূলক ও হিংসাত্মক কোন দুর্ঘটনা ঘটার কার্যকারণ ছিলো অনুপস্থিত।

পার্বত্য চট্টগ্রামে দাঙ্গা হাঙ্গামা চাঁদাবাজি ছিনতাই অগ্নিসংযোগ হত্যা উৎপীড়ণ অহরহই ঘটে। তার কার্যকারণ ও থাকে। রাজনৈতিক উত্তাপ উত্তেজনা ছাড়াও স্বার্থগত রেষারেষি সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, দাঙ্গা হাঙ্গামা ইত্যাদি জাতিগত প্রতিশোধ পরায়ণতাকে সহিংসতার কারণ রূপে ভাবা যায়। কিন্তু আলোচ্য সময়টিতে অনুরূপ পরিবেশ ছিলো না। তাই সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে নৃশংস ঘটনাটি ঘটে যায়। খবর পাওয়া গেলোঃ বৈঠকের জন্য উপস্থিত শ্রমিকদের একজন বাদে অপর কেউ জীবিত নেই, নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে। হাহাকারে ছেয়ে গেলো গোটা এলাকা। তাদের খুঁজে সেনা পুলিশ, বিডিআর, আনসার ও পাবলিকদের যৌথ তল্লাসী অভিযানে পাকুয়্যাখালির পাহাড় খাদে পাওয়া গেলো ২৮টি বিকৃত লাশ। বাকিরা চিরকালের জন্য হারিয়ে গেছেন। এখনো তাদের সন্ধান মিলেনি। পালিয়ে প্রাণে বাঁচা একজনই মাত্র যে এই গণহত্যা খবরের সূত্র।

এটি কার্যকারণহীন নির্মম গণহত্যা। এটি মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত অপরাধ।

ন্যায় বিচার ও মানবতা হলো বিশ্ব সভ্যতার স্তম্ভ। জাতিসংঘ এ নীতিগুলো পালন করে। তাই তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে জার্মানদের হাতে গণহত্যার শিকার ইহুদীদের পক্ষে এখনো বিচার অনুষ্ঠিত হয়। এখনো ঘোষিত অপরাধীদের পাকড়াও করা হয়ে থাকে। অধুনা যুগোস্লাভিয়ায় অনুষ্ঠিত গৃহযুদ্ধে গণহত্যার নায়কদের পাকড়াও বিচার অনুষ্ঠান ও শস্তি বিধানের প্রক্রিয়া চলছে। কম্বডিয়ায় অনুষ্ঠিত পলপট বাহিনীর গণহত্যার বিচার প্রক্রিয়াটিও জাতিসঙঘ ও কম্বডিয়া সরকারের বিবেচনাধীন আছে। এই বিচার তালিকায় পাক্যুয়াখালি, ভূষণছড়া ইত্যাদি গণহত্যাগুলো অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্য। সভ্য জগতে উদাহরণ স্থাপিত হওয়া দরকার যে, মানবতার বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত প্রতিটি অপরাধ অবশ্যই বিচার্য। সংশ্লিষ্ট দেশ ও জাতি তা অবহেলা করলেও জাতিসঙঘ তৎপ্রতি অবিচল।

স্বাধীনতা, স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকার দাবী দাওয়ার পক্ষে, পরিচালিত রাজনীতি, আন্দোলন ও সশস্ত্র তৎপরতায়, নির্বিচারে গণহত্যা কোন মতেই অনুমোদন যোগ্য নয়। এখন স্বাভাবিক শান্ত পরিবেশে গণহত্যার অভিযোগগুলো যাচাই করে দেখা দরকার। পার্বত্য চট্টগ্রামে এরূপ বিচারযোগ্য ঘটনা অনেকই আছে ও তার বিচার অবশ্যই হতে হবে। সাধারণ ক্ষমার আওতা থেকে গণহত্যার অপরাধটি অবশ্যই বাদ যাবে।

পার্বত্য ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, আমার নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষণ হলোঃ এই

পর্বতাঞ্চলের প্রতিটি দাঙ্গা, অগ্নিসংযোগ, ছিনতাই, চাঁদাবাজী, হত্যা ও পীড়নের অগ্রপক্ষ হলো জনসংহতি সমিতি ও তার অঙ্গ সংগঠনগুলো। বাঙ্গালীরা তাতে পাল্টাকারী পক্ষ মাত্র। এমতাবস্থায় জনসংহতি সমিতি নেতৃবৃন্দ হলেন আসল অপরাধী। মানবতা বিরোধী অপরাধ সংগঠনে তাদের নির্দেশ ও অনুমোদন না থাকলে, তারা প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে অবশ্যই দমাতেন বা শাস্তি দিতেন। পাকুয়াখালি ঘটনা তাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়নি, অনুরূপ অস্বীকৃতি আমলযোগ্য নয়। কারণ অনুরূপ ঘটনা ঘটাবার দ্বিতীয় কোন প্রতিষ্ঠান এই আমলে অত্রাঞ্চলে উপস্থিত নেই। ভূক্তভোগীপক্ষ একমাত্র তাদেরকেই তজ্জন্য দায়ী করে। তাদের অস্বীকারের অর্থ নিজেদের সংগঠনভূক্ত অপরাধীদের অপরাধ ঢাকা। সুতরাং জনসংহতি নেতৃবৃন্দই অপরাধী।

এখন গণহত্যার অভিযোগটি বিদ্রোহী সংগঠনের প্রধান জ্যোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় লারমার উপরই পতিত হয়। তিনি অপরাধী না নির্দোষ তা বিচার প্রক্রিয়াতেই নির্ধারিত হবে।

আমরা আইন শৃংখলা মান্যকারী সাধারণ মানুষ, সরকারের কাছে এই দাবী করছিঃ পাকুয়াখালি সহ অন্যান্য গণহত্যার বিচার হোক। আন্তর্জাতিক আইন হলোঃ গণহত্যা ক্ষমাযোগ্য নয়। যদি পাকুয়্যাখালি ভুষণছড়া ও অন্যান্য ঘটনাকে গণহত্যা রূপে ধরে নিতে সন্দেহ থাকে, তা হলে আন্তর্জাতিক মানে এর যথার্থতা যাচাই করা হোক। আমরা বিচার চাই, অবিচার নয়।

সন্তু বাবু এখন সরকারের নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রিত। তাই বলে তাকে অভিযুক্ত করা যাবে না, এমন পক্ষপাতিত্ব ন্যায় বিচারের বিরোধী। সন্তু বাবু নিজেকে নিরপরাধ মনে করলে, সরকারের পক্ষপুট ছেড়ে বিচার প্রক্রিয়ার কাছে নিজেকে সোপর্দ করুন। নিরপরাধ স্বজাতি হত্যার অনেক অভিযোগ ও তার বিরুদ্ধে ঝুলে আছে। অধিকার আদায়ের সংগ্রাম মানে তো, মানুষ হত্যার অবাধ লাইসেন্স লাভ নয়। মানবতাবাদী সংগঠনের হিসাব মতে তাদের হাতে অন্ততঃ ত্রিশ হাজার স্থানীয় আধিবাসীর প্রাণনাশ ঘটেছে। এটি গুরুতর অভিযোগ।

৩২. স্থানীয় পরিষদের আইন ও আচরণের সংশোধন প্রয়োজন

উপজাতীয় সংগঠন পার্বত্য চট্টগ্রাম জন সংহতি সমিতি ও তার সশস্ত্র অঙ্গসংগঠন শান্তি বাহিনীর দ্বারা, উত্থাপিত স্বায়ত্ত শাসনের দাবী ও উৎপাতে অতিষ্ঠ সরকার ১৯৮৯ সালে স্থানীয় শাসন ক্ষমতা সম্বলিত তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠন সংক্রান্ত সংসদীয় আইন পাশ করেন এবং তার আওতায় নির্বাচনের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলা স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠিত হয়। তৎপর একটানা এই পরিষদগুলো বহাল আছে। আইনতঃ মিয়াদ শেষেও এগুলোর আয়ু শেষ হচ্ছে না। ইতোমধ্যে অনেক চেয়ারম্যান ও সদস্যের পদ খালি হয়েছে। মনোনয়নের মাধ্যমে সদস্য আর চেয়ারম্যানের পদ পূরণ করা হলেও, আইনতঃ শূন্য পদগুলো শূন্যই আছে। তিন বৎসর মেয়াদের এই পরিষদগুলোর আয়ু আরো বৃদ্ধি পেয়ে চলতি শতাব্দী ফুরায় কিনা কে জানে। কোন তিক্ত রহস্য এর পিছনে সক্রিয় বলা মুশকিল।

ধারণাটি নতুন। এ সম্বন্ধে কারো কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলো না। ওয়াকিবহাল বিশেষ মহলের শুধু এ খবরটি জানা ছিলো যে, ভারতের মিজোরাম অঞ্চলে, এতদাঞ্চলেরই পূর্ব উত্তর সীমান্তের লাগোয়া চাকমা অধ্যুষিত এলাকায় একটি চাকমা স্বায়ত্ত শসিত পরিষদ কার্যকরী আছে। কিন্তু সেটা ফেডারেল ষ্টেটের গঠন কাঠামোতে গঠিত। যেহেতু বাংলাদেশ বিশুদ্ধ এক কেন্দ্রিক রাষ্ট্র, সেহেতু ঐ গঠন কাঠামো এখানে প্রযোজ্য নয়। তবু এ অনুপ্রেরণায় বাংলাদেশ সংবিধানের স্থানীয় শাসন কাঠামোতে, তিন স্থানীয় সরকার পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। লক্ষ্য হয় অসন্তুষ্ট উপজাতীয় পক্ষকে সন্তুষ্ট করা। কিন্তু সময়ের পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে স্বায়ত্ত শাসন কামীরা তাদের দাবীতে এখনো অনড়। আগে তাদের দাবী ছিলো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, এখন তা সংশোধিত হয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের রূপ নিয়েছে। ক্ষমতার পরিসর তাতে স্থানীয় সরকারের চেয়ে অনেক অনেক বেশি। দীর্ঘ দিনেও এর বিপক্ষে জন সংহতি সমিতি ও শান্তি বাহিনীকে নমনীয় করা যায়নি। স্বায়ত্তশাসন দাবীর মীমাংসা কখন হবে, সেই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের জন্য স্থানীয় সরকার পরিষদ গুলোর নির্বাচন ও ভুল ক্রটি গুলোর সংশোধনের ব্যাপারটি প্রলম্বিত হয়ে আছে। এ সবের সংশোধন ও নবায়ন দরকার। বর্তমানে সময়ের প্রয়োজন এটা। ভবিষ্যতে গোটা পরিষদ ব্যবস্থার বিলোপ সাধন বা মৌলিক পরিবর্তন করার প্রয়োজন হলেও, তখন তার প্রয়োজন থাকবে বলা যায় না।

সময়ের যাচাই বাছাই ও চাহিদাই পরিষদ আইনের কিছু দোষ ক্রটিকে চিহ্নিত করেছে। পরিষদ গুলোকে কার্যকর রাখতে এ সব দোষ ক্রটির সংশোধন অবশ্যই দরকার। প্রথমেই ধরা যায়, জেলা প্রশাসকদের মর্যাদার কথা। তারা স্থানীয় প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হওয়া ছাড়াও সরকারের মুখ্য প্রতিনিধি। প্রয়োজন মুহূর্তে সরকারের পক্ষে তারা সর্বোচ্চ প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। এই অর্থে পরিষদগুলো তাদের প্রতিনিধিত্ব মূলক সরকারী ক্ষমতার অধীন। যে পর্যন্ত ভিন্ন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের খবরদারির ব্যবস্থা না হবে, সে পর্যন্ত জেলা প্রশাসকদের খবরদারী কর্তৃত্ব বহাল থাকবে। সুতরাং জেলা প্রশাসকদের স্থানীয় সরকার পরিষদগুলোতে সচিবের পদ দান সঙ্গতি শীল ও যুক্তিযুক্ত নয়। সংশ্লিষ্ট আইনের ৩১(১) ধারাটি তাই সংশোধন করা দরকার ছিলো ও তাই হয়েছে।

দ্বিতীয় আপত্তিকর বিষয় হলো ঃ পরিষদীয় আইনে অবাঙ্গালীদের আখ্যায়িত করা হয়েছে উপজাতি আর বাঙ্গালীদের অউপজাতি সংজ্ঞায়। এ সংজ্ঞাগুলো বিতর্কিত। এর পরিবর্তে বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালীর সংজ্ঞা অধিক পরিষ্কার ও অর্থবহ। জায়গা জমির মালিকানা ও জন্মের ভিত্তিতেই কেবল স্থানীয় অস্থানীয় সনদ জেলা প্রশাসকদের মঞ্জুর করার ক্ষমতা থাকা উচিত। বিতর্কিত নৃতাত্ত্বিক পরিচয়ের সনদ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে না। তুলনামূলকভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম একমাত্র পশ্চাৎপদ অঞ্চল নয়। তথ্য উপাত্ত এই বিশ্লেষণ সমর্থন করে না। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে এটি পশ্চাদপদ। মানব বসতির বিচারে এটি একক উপজাতীয় অঞ্চলও নয়। এটি বাঙ্গালী অবাঙ্গালী মিশ্র অঞ্চল। আইনের ভাষা থেকে এ বিতর্কিত শব্দগুলোর ছাটাই হওয়া আবশ্যক।
সর্বাধিক ঝঞ্ঝাটপূর্ণ ব্যাপার হলো নির্বাচনী ব্যবস্থা। প্রচলিত জন প্রতিনিধিত্ব আইনে ইউনিয়ন কাউন্সিলের সদস্য থেকে দেশের রাষ্ট্রপতির পদ পর্যন্ত, প্রতিটি জন প্রতিনিধিত্ব মুলক পদ অলাভজনক। পূর্বাহ্নে পদত্যাগ ব্যতীত প্রতিনিধিত্বমূলক দ্বিতীয় পদের জন্য তারা অযোগ্য। তবে জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের এই অব্যাহতি সুযোগ স্থানীয় আইনে নেই।
প্রতিটি জেলা পরিষদে একজন চেয়ারম্যান ও তিরিশ জন সদস্যের জন্য কোন ভেদাভেদ ছাড়াই নির্বাচনী এলাকার পরিধি গোটা জেলা ব্যাপ্ত। জেলা প্রতিনিধিত্ব ক্ষমতার অধিকারী একজন চেয়ারম্যানের পক্ষে এটি যুক্তিযুক্ত হলেও সদস্যদের পক্ষে তা নয়। তাদের নির্বাচনী এলাকা, তিরিশটিতে বিভক্ত ও ক্ষুদ্র হওয়া উচিত। চেয়ারম্যান বাঙ্গালী হতে পারবেন না। এবং তাকে অবশ্যই উপজাতীয় হতে হবে। এ কেমনতর তোষামোদী আইন? আইনকে সার্বজনীন ন্যায় বিচার ও সুবিধা সুযোগের ধারক গণতান্ত্রিক হতে হবে। বঞ্চনাপূর্ণ আইনের ক্ষতিপূরণ হিসাবে একটি ভাইস চেয়ারম্যানের পদ, বঞ্চিত বাঙ্গালীদের জন্য রাখা হলেও তা সান্ত্বনাকর হতো। এ ব্যবস্থা সাংবিধানিক অধিকার ও গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ব্যবস্থাটি উপজাতীয়দের সন্তুষ্ট করতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিপরীতে বাঙ্গালীরাও বিক্ষুব্ধ। নির্বাচন হলো একটি গণতান্ত্রিক সুস্থ প্রতিযোগিতা। তাতে জাত বেজাত সম্প্রদায় ও ধর্মের ভেদাভেদ টানা, গ্রহণীয় নয়। তাতে সম্প্রীতি রচনার জাতীয় রাজনীতি উপেক্ষিত হবে।
সাম্প্রদায়িক জনসংখ্যার হার অনুযায়ী, সদস্য কোটা নির্ধারণ করা না হলে, তাও হবে আরেক অবিচার। এমনিতে স্থানীয় নির্বাচনী আইন সাম্প্রদায়িক পৃথক প্রতিনিধিত্বকে সমর্থন করে না। ভবিষ্যতে এটি আইন সঙ্গত করা সাপেক্ষে, নিয়ম প্রবর্তিত হলেও তাতে সর্বজন গ্রাহ্যতা থাকতে হবে। নতুবা হুলস্থুল বাধবে।
প্রধান পদগুলোর নির্বাচনে সর্বাধিক উত্তম ব্যবস্থা হবে বাঙ্গালী অবাঙ্গালীরা প্রতি এক মিয়াদ পরপর এর অধিকারী হবে। অবসর মিয়াদে তারা ভাইস চেয়ারম্যান পদেও সমাসীন হবে। যাতে কোন প্রধান জনগোষ্ঠী একা পদ দুটিকে কুক্ষিগত করে রাখতে না পারে, তজ্জন্য উচিত হবে বাঙ্গালী আর অবাঙ্গালীদের নিজেদের আভ্যন্তরীন মনোনয়নমূলক সমঝোতা।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় গুলোর জনসংখ্যা জনিত স্বল্পতা হেতু যৌগিক প্রতিনিধিত্ব রাখা যাবে। প্রতি মিয়াদে নতুন সম্প্রদায় থেকে সদস্য নির্বাচিত হবে।
সাম্প্রদায়িক সদস্য কোটার পক্ষে যুক্ত নির্বাচন অসুবিধাজনক। তাতে বিপক্ষ সম্প্রদায়ের ভোট, নির্বাচনী ফলাফলে অপ্রীতিকর প্রস্তাবও পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে। সুতরাং কোটা ভিত্তিক নির্বাচনকে সাম্প্রদায়িক করা নিরাপদ নয়। স্থানীয় সরকার নির্বাচনকে অবশ্যই জাতীয় নির্বাচনী আইনের ছত্রছায়া দিতে হবে। তা না হলে তা বৈধতা পাবে না।

বোমাং রাজা মং শোয়ে প্রু চৌধুরী

আতিকুর রহমান

প্রকাশিত বই :

১. পার্বত্য চট্টগ্রাম (গবেষণা কর্ম)

২. প্রেক্ষিত পার্বত্য সংকট

৩. শান্তি সম্ভব

৪. প্রতিবেদন গুচ্ছ

৫. পার্বত্য তথ্য কোষ ১০ খণ্ড

৬. পার্বত্য চট্টগ্রামের ইতিহাস ও রাজনীতি

যোগাযোগ : ৪৮ সাধার পাড়া উপশহর সিলেট। মোবাইল : ০১১৯৬১২৭২৪৮